৩য় বর্ষ বৈশাখ—১৩১৪। ১ম সংখ্যা

সচিত্র

মাসিক পত্র।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি. এল.

সম্পাদিত।

প্রথম ভাগ, ১ম সংখ্যা। তৃতীয় পর্য্যায়। ১৩১৪, বৈশাখ।

শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় বি, এল.,—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সহকারী সম্পাদক

## সূচী।



# নিয়মাবলী।

ঐতিহাসিক চিত্রের জন্য প্রবন্ধাদি, বিনিময়ার্থে পত্রিকা প্রভৃতি ও সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে বহরমপুর খাগড়া পোঃ মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় এবং টাকা কড়ি, চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপনের হারও কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও গ্রাহক করা যায় না। গ্রাহকগণ মূল্যাদি পাঠাইবার সময় বা অপর কোন বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিবার সময় নম্বর দিয়া লিখিবেন। মোড়কের উপর যে নম্বর থাকে তাহাই গ্রাহক নম্বর।

নূতন গ্রাহক হইলে "নূতন" কথাটি এবং নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

প্রতি মাসের পত্রিকা তৎপর মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা না পাইলে ১৫ই তারিখের মধ্যে না জানাইলে আমরা পুনরায় দিতে বাধ্য নহি। নমুনার জন্য ৵০ তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

[ঐতিহাসি]ক চিত্র কার্য্যালয়, কলিকাতা। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

# ঐতিহাসিক চিত্র।

## সম্পাদকের নিবেদন।

কিঞ্চিন্ন্যূন তিন বৎসর পূর্ব্বে ঐতিহাসিক চিত্রের দ্বিতীয় পর্য্যায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। সুবিখ্যাত সাহিত্যসম্পাদক মহাশয় সে সময়ে আশা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ঐতিহাসিক চিত্র ডিঙ্গী হাঁটু জলেও নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। সুজলা সুফলা সোনার বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক চিত্রের ন্যায় একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গীও অনুকূল-স্রোত বা অনুকূল-বাতাস পায় নাই। তাহা ভাসিতে না ভাসিতেই চড়ায় ঠেকিয়া যায়। এক্ষণে আবার তাহাকে চড়া হইতে সরাইয়া জলে নামাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। দেশের চারিদিকেই এখন অনুকূল-স্রোত চলিতেছে ও বাতাস বহিতেছে। আমরা আবার সেই স্রোত ও বাতাস লক্ষ্য করিয়া ঐতিহাসিক চিত্র ডিঙ্গীকে জলে ভাসাইলাম। আশা করি, ভগবান্ আমাদিগকে অনুকূল-স্রোত ও বাতাসের মধ্যে লইয়া যাইবেন।

আজকাল চারিদিকে দেশের গৌরব গীতি উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। কি এক স্বর্গীয় অনুরাগ সকলেরই হৃদয় অধিকার করিয়াছে! ভগবান্ করুন যেন এই অনুরাগ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু সেই অনুরাগকে চিরজাগরূক রাখিবার জন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক। যদি দেশকে ভালবাসিতে হয়, তাহা হইলে দেশকে চিনিতে হয়। দেশকে চিনিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত জানিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জগতের

অভ্যুত্থিত জাতিসমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাহারা স্বদেশ ও স্বজাতির পুরাবৃত্ত আলোচনা করিয়াই জাতিপদবাচ্য হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ত্তমান সময়ে জাপানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেই জন্য জাপানে পিতৃপিতামহদিগের পূজাপ্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।) সুতরাং আমাদের এই স্বদেশপ্রীতির যুগে আমাদেরও পিতৃপিতামহদিগকে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পচন্দনে চর্চ্চিত করা কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের পুণ্যস্মৃতির সহিত দেশের অণুপরমাণু বিজড়িত রহিয়াছে, দেশকে ভালবাসিতে হইলে, তাঁহাদেরই স্মৃতি যে প্রথমে হৃদয়ে জাগাইতে হইবে, তাহাতে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? যদি কেহ আপত্তি করেন যে, পিতৃপিতামহদের ইতিহাস কোথায়? আমরা তদুত্তরে বলিতে প্রস্তুত যে, আজিও বাঙ্গালায় ও ভারতে যে অগণ্য নগর, গ্রাম, ও গিরিগুহা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমাদের পিতৃপিতামহদের জীবন্ত ইতিহাস এখনও জাগ্রত রহিয়াছে। ভট্ট, চারণ ও কুলাচার্য্যদিগের কুটীরে কুটীরে এখনও অনেক কীটদষ্ট পুঁথি তাঁহাদের কীর্ত্তি-কাহিনী বক্ষে ধরিয়া লুক্কায়িত হইয়া আছে। ফলতঃ আমাদের ইতিহাসের অভাব নাই, তবে তাহাকে ঘসিয়া মাজিয়া প্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত। বর্ত্তমান স্বদেশপ্রীতির যুগে সকলেই সে বিষয়ে সচেষ্ট হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ঐতিহাসিক চিত্র সে বিষয়ে সাধারণকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিবে বলিয়া আবার সে নূতন জলে ভাসিল।

সুবিখ্যাত মেটকাফ প্রেসের স্বত্বাধিকারিগণ ঐতিহাসিক চিত্র ডিঙ্গীকে ভাসাইবার জন্য সমস্ত আয়োজনের ভার লইয়াছেন। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহাদের চেষ্টা অব্যর্থ হউক। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিও তাঁহাদের চেষ্টার যথাসাধ্য আনুকূল্য করিবে। কিন্তু দেশের প্রিয় সন্তানগণ তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে আবার সে যে চড়ায় ঠেকিয়া যাইবে না, এ কথাই বা কে বলিতে পারে? সেই জন্য সাধারণের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা যেন ইহার প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ভগবানের ইচ্ছায় আবার ঐতিহাসিক চিত্রের তৃতীয় পর্য্যায় আরব্ধ হইল। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, ইহাই সকলে প্রার্থনা করুন।

---

# বাঙ্গালীর ইতিহাস।

বাঙ্গালা ভাষা যাহাদের মাতৃভাষা, তাহারা সকলেই বাঙ্গালী। কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান,—কেহ বৌদ্ধ, কেহ খৃষ্টীয়ান,—কিন্তু সকলেই বাঙ্গালী। তাহাদের কথাই বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রধান কথা। প্রচলিত ইতিহাসে সে কথা অধিক নাই। তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহের কথা, জয়পরাজয়ের কথা, রাজা এবং রাজপুরুষদিগের কথা। তাহাকে বাঙ্গালীর ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখিত হয় নাই। বাঙ্গালী নিজে চেষ্টা না করিলে সে ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না। চেষ্টার অভাবে অনেক কথা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—এখনও দিন দিন কত কথা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

বিজেতা বিজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া থাকে। যাহারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয় না, তাহাদের কথা বিজেতার নিকট নিতান্ত ছোট কথা। সেই জন্য বিজেতা ইতিহাস লিখিলে, তাহাতে সকল কথা স্থান প্রাপ্ত হয় না। বাঙ্গালা দেশের যে সকল ইতিহাস প্রচলিত আছে, তাহার সকলগুলিই এই শ্রেণীর ইতিহাস,—বিজেতার লেখনীপ্রসূত, অথবা তাহা হইতে অংশতঃ অথবা সম্পূর্ণরূপে ভাষান্তরিত। যথারীতি অনুসন্ধান করিয়া, সত্যাসত্যের সমুচিত সমালোচনা করিয়া, বাঙ্গালী এখনও বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখিবার জন্য যথাযোগ্য আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। ইহার জন্য কাহাকেও ভৎ´সনা করা যায় না। স্বদেশকে জানিবার জন্য আগ্রহ উপস্থিত না হইলে, সে চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। কিছুদিন হইতে আগ্রহের আভাস এবং কিছু কিছু চেষ্টার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু এখনও সমুচিত চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

বাঙ্গালীর ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলে, চারিদিকে যেন অকূল সমুদ্র দর্শন করিতে হয়। কোথায় তাহার আরম্ভকাল, তাহা স্মৃতিপথ হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইয়া গিয়াছে। বহু পুরাতন কাহিনী বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকিবে। সেই জন্য অনেকে ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাসকেই বাঙ্গালীর পুরাতন ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লইতে পরামর্শ দান করেন। কিন্তু তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই।

ভারতবর্ষ বহু প্রদেশে বিভক্ত মহাদেশ। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাঙ্গালা দেশ সেইরূপ। সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত বাঙ্গালাদেশের সংস্রব থাকিলেও, বাঙ্গালাদেশের বিশেষত্বের অভাব নাই; সমগ্র ভারতবাসীর সহিত বাঙ্গালীর সংস্রব থাকিলেও, বাঙ্গালীর বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাঙ্গালীর একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস ছিল। সে ইতিহাস বিলুপ্ত না হইলে, বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্বের কার্য্য-কারণশৃঙ্খলা বুঝিতে পারা যাইত।

বাঙ্গালা দেশের সহিত আর্য্যাবর্ত্তের সংস্রব ছিল; দাক্ষিণাত্যেরও সংস্রবের অভাব ছিল না। কেবল তাহাই নহে,—সমগ্র প্রাচ্যরাজ্যের সহিত বাঙ্গালা-দেশের একটি সাক্ষাৎ সংস্রব বর্ত্তমান ছিল। তাহা ছাড়া, পারস্য, আরব এবং মীশর দেশের সঙ্গেও বাঙ্গালা দেশের কিছু কিছু সাক্ষাৎ সংস্রব বর্ত্তমান থাকারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গালাদেশের সমুদ্রোপকূলে তাহার যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে সংস্রব কতদিনের সংস্রব, কত দূরদেশের সহিত সংস্রব, কোন্ শ্রেণীর কিরূপ সংস্রব, কিরূপে তাহার আরম্ভ, কিরূপেই বা তাহার শেষ,—ইহার সকল কথাই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ললিতবিস্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত গ্রন্থ রচিত হইবার সময়ে "বঙ্গলিপি" নামক পৃথক লিপি প্রচলিত ছিল। তাহা দ্বিসহস্র বৎসরের কথা। তখন "বঙ্গলিপি" স্বতন্ত্র লিপি বলিয়া পরিচিত ছিল; তাহাকে চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করিতে হইত। বিশেষ পার্থক্য না থাকিলে, এরূপ হইত না।

যুগে সেরূপ পার্থক্য সংস্থাপিত হইয়াছিল,—কিরূপ কারণে সেরূপ পার্থক্য সংস্থাপিত হইয়াছিল—এ সকল কথা কতকাল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে "বঙ্গলিপি" কিরূপ ছিল? তাহাই বা কে বলিতে পারে? কেবল লিপি কেন, —বঙ্গভাষাও স্বতন্ত্র ভাষা। তাহার গঠনপ্রণালীতে স্বাতন্ত্র্যের অভাব নাই। বাঙ্গালীর আচারব্যবহারেও এইরূপ কত স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। তাহার শিল্পের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এই সকল কারণে বাঙ্গালীর পুরাতন ইতিহাস পৃথক্ ভাবে আলোচিত না হইলে, অনেক কথাই বুঝিতে পারা যায় না।

বাঙ্গালীর আধুনিক ইতিহাসেও স্বাতন্ত্র্যের অভাব নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ যে পথে গিয়াছে, বাঙ্গালী সকল বিষয়ে, সকল সময়ে সে পথ অবলম্বন করিতে সম্মত হয় নাই। আধুনিক ইতিহাসে বাঙ্গালী ভীরু এবং কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কৃত হইলেও, বাঙ্গালী স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়—স্বাধীনতার উপাসক, —অপরাজিত পৃথক জাতি। বাঙ্গালী কখন বৌদ্ধ হইয়াছে, কখন হিন্দু হইয়াছে, কখন হিন্দুমুসলমান্ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু কদাচ দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিতে সম্মত হয় নাই। পাঠান, মোগল কেহই বাঙ্গালীকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারেন নাই; ইংরেজেরাও বাঙ্গালীকে রণক্ষেত্রে পরাভূত করিয়া, শাসনভার গ্রহণ করেন নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান অস্ত্রবলে পরাভূত,—বাঙ্গালা দেশ অস্ত্রবলে পরাভূত হয় নাই।

বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখিতে হইলে, বিবরণসংকলনে ব্যাপৃত হইতে হইবে। তাহার জন্যই "ঐতিহাসিক চিত্র" জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহা যে মরিয়াও মরিতেছে না, ইহাতেই আশা হয়,—বাঙ্গালী তাহার ইতিহাস-সংকলনের জন্য কিছু কিছু আগ্রহ প্রকাশ করিতে শিখিতেছে। এই আগ্রহ প্রবল হইলে, প্রকৃত অধ্যবসায় আসিয়া বিবরণসংকলনের সহায়তাসাধন করিবে। এই ব্রত একের নহে, অনেকের;—অনেকের নহে, সকলের। বাঙ্গালীমাত্রে ইহার সহায়তাসাধন না করিলে, এই কঠিন ব্রত প্রতিপালিত হইতে পারে না। "ঐতিহাসিক চিত্রের" তৃতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হইতেছে। আবার সকলকে সবিনয়ে ইহার সহায়তাসাধনের জন্য অনুরোধ করি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

# কেদার রায়।

তিন শত বৎসর অতীত হইল, বাঙ্গালার শ্যামল প্রান্তরে একদিন স্বাধীনতা লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার তর্পণের জন্য বাঙ্গালী সেদিন আপনার হৃদয় হইতে শোণিতধারা মোক্ষণ করিয়া দেয়। দেবীর আশীর্ব্বাদ লাভ্ করিয়া তাহার বাহু দুর্জ্জয় শক্তি লাভ করে, তাই সে বাহুর অসিচালনায় মোগল-পাঠান, মগফিরিঙ্গী সন্ত্রাসিত হইয়া দূরে পলাইয়া যায়। যে দিন বাঙ্গালীর গৌরব-সূর্য্য সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিকে আলোকিত করিয়াছিল, সে দিনের কথা স্মরণ করিতে কাহর হৃদয় না পুলকে অধীর হইয়া উঠে? সেদিনের কথা মনে হইলে কঙ্কালসার আমাদেরও দেহে রোমহর্ষ উপস্থিত হয়। যদি কেহ কল্পনার চক্ষেও সে দিনের চিত্র দেখিতে পান, তিনিও, যে জীবনে ধন্য হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর সেই গৌরবময় দিনের পুণ্য-কাহিনী চিরদিন যে বাঙ্গালা জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে, এরূপ আশা অনায়াসে করা যাইতে পারে। যে প্রকৃত বাঙ্গালী হইবে, সে কখনও সে দিনের কথা জীবনে ভুলিতে পারিবে না। বাঙ্গালীর কাব্য, বাঙ্গালীর ইতিহাস চিরদিনই সে কথা জাগাইয়া রাখিবে।

বাস্তবিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের মহাগৌরবময় দিন। পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গভূমি সে সময়ে বাঙ্গালীর গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সেই প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়, সেই রামচন্দ্র রায় ও লক্ষ্মণমাণিক্য, সেই মুকুন্দরায় ও বীর হাম্বীর আপনাদিগের রণক্রীড়া দেখাইয়া যেরূপে মোগলপাঠান, মগফিরিঙ্গীকে চমকিত করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা বাঙ্গালার ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই চারি ভীষণ শক্রর সহিত অবিরাম সংগ্রামে বাঙ্গালী যেরূপ

বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা যে জগতের ইতিহাসে বিরল, একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। সে সময়ে বাঙ্গালী যে জাতীয়তার স্পর্দ্ধা করিতে পারিত, সে কথাই বা কে অস্বীকার করিবে? তাই মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ সে সময়ের বাঙ্গালীর গুণ গাহিয়াছেন, ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণ তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বাঙ্গালীই যে সে সময়ে বাঙ্গালার প্রকৃত অধিপতি ছিল, সে কথাও বলিতে তাঁহারা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে সে সময়ে বঙ্গভূমি বাঙ্গালীরই শাসনাধীন ছিল। তাই তাহাকে চারিশত্রুর সহিত রণক্রীড়ার অভিনয় করিতে হইয়াছিল। যাঁহাদের জন্য বাঙ্গালীর এরূপ গৌরব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের কীর্ত্তি-কাহিনীর আলোচনায় যে হৃদয় পবিত্র হয়, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই সমস্ত মহাপুরুষের অন্যতম কেদার রায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার সম্বন্ধে নানাস্থানে নানাভাবে আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, তথাপি তাঁহাদের বিষয় যতই আলোচিত হইবে, ততই আমাদের জাতীয়চরিত্রগঠনের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে।

যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যের নাম বাঙ্গালীমাত্রেই অবগত আছে, কিন্তু কেদার রায়ের নাম সকলের নিকট পরিচিত কিনা সন্দেহ। মহাকবি ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যকে যেরূপ অমর করিয়া গিয়াছেন, কেদার রায়ের কীর্ত্তি-কাহিনী সেরূপ ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। অথচ কেদার রায় প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তাঁহারা উভয়েই সমকক্ষ ছিলেন বলিয়া ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।* প্রতাপাদিত্যের কথা কোন মুসল্‌মান ঐতি-

* "The king of Patanaw was Lord of the greatest part of Bengala, until the Mogul slew their last king. After which twelve of them joined in a kind of Aristocracy and vanquished the Moguls, and still notwithstanding Mogull's greatness, are great Lords, specially he of Siripur and of Ciandecan." ( Purcha's Pilgrims ) এই শ্রীপুরের অধীশ্বর কেদার রায় ও চ্যাণ্ডিকানের প্রতাপাদিত্য।

হাসিকের গ্রন্থে অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু কেদার রায়ের অদ্ভুত বীরত্বের কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ প্রতাপাদিত্য যেরূপ বাহুবলের পরিচয় দিয়া বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, কেদার রায়ও সে বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনিও পাঠানমোগল, মগফিরিঙ্গীর নিকট আপনার রণকৌশল দেখাইয়াছিলেন ও বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অবশেষে স্বাধীনতারক্ষার জন্য হৃদয়ের শোণিত দত্তা করিয়া আপনাকে বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কিরূপে তিনি রণাভিনয় করিয়াছিলেন, আমরা ক্রমে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

কেদার রায় বিক্রমপুর জনপদের অধীশ্বর ছিলেন। কালীগঙ্গাতীরস্থ শ্রীপুর তাঁহার রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ, দেববংশীয়। কথিত আছে, এই বংশের আদিপুরুষ নিমরায় কর্ণাট হইতে বিক্রমপুরের আড়ফুলবাড়িয়া নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন।* কোন্ সময়ে নিমরায় বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি সেনরাজগণের সময় এদেশে আসিয়া থাকিবেন। কারণ সেনরাজগণও কর্ণাট হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন ও তাঁহারা কর্ণাট ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন। এই নিমরায়ের বংশেই চাঁদরায় ও কেদার রায় দুই ভ্রাতা জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা তদানীন্তন বার ভুঁইয়ার

* "The tradition is, that about a hundred and fifty years before the reign of Akbar, Nim Rai came from Karnat and settled at Ara Phulbaria in Bikrampur. He is believed to have been the first Bhuya, and to have obtained the sanction of the ruling monarch to his retaining the title as an hereditary one in the family." (James Wise—on the Barah Bhuyas, Asiatic Society's Journal 1874).

ওয়াইজ সাহেব প্রবাদ অবলম্বন করিয়া আকবরের রাজত্বের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে নিমরায়ের আগমনের কথা লিখিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাহারও পূর্ব্বে নিমরায় আসিয়াছিলেন। যে সময়ে সেনরাজগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের স্বদেশবাসী নিমরায়ের কর্ণাট হইতে আগমনই সম্ভব।

অন্যতম ছিলেন, এবং ইঁহাদের বংশ বহু প্রাচীন কাল হইতে ভুঁইয়া বংশ বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। নিমরায়ের পর উক্ত বংশের আর কোনও ভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা চাঁদরায় ও কেদার রায়কে উক্ত বংশের ভুঁইয়া বলিয়া জানিতে পারি।

দায়ুদ সার পতন হইতে গৌড়ে পাঠান রাজত্বের অবসান হয়। মোগল সেনাপতিগণ বাঙ্গালা জয় করিবার জন্য পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। জলে স্থলে তাঁহারা সমরানল প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। এদিকে পাঠানেরা আপনাদের প্রভুত্ববিস্তারের জন্যও সকলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মগেরাও সে সুযোগ পরিত্যাগ করিল না। নবাগত ফিরিঙ্গীগণই বা নীরবে কালযাপন করিবে কেন? কাজেই বঙ্গভূমি রুধির-ধারায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। চাঁদরায় কেদার রায় সহজে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তাঁহারা গৌড়ের পাঠান রাজগণের অধীন ভুঁইয়া ছিলেন। কিন্তু বিজয়ী মোগলের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে তাঁহারা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। মোগল অশ্বারোহিগণ বহুনদনদীসঙ্কুল তাঁহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিত লাগিল বটে, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

যে সময়ে মোগলকেশরী আকবরসাহ দায়ুদের নিকট হইতে বাঙ্গালা জয় করিয়া লইলেন, সেই সময়ে বঙ্গভূমি বার ভুঁইয়ার অধীন ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পাঠান। এই পাঠানদিগের মধ্যে ইশা খাঁ মসনদ আলি প্রধান ছিলেন। তাঁহার রাজ্য চাঁদরায় ও কেদার রায়ের রাজ্যের সংলগ্ন ছিল। ইশা খাঁর সহিত প্রথমতঃ তাঁহাদের ঐক্য থাকিলেও ক্রমে যখন উভয় পক্ষের ক্ষমতা বাড়িতে আরম্ভ হয়, তখন তাঁহাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইশা খাঁ যেমন কখনও রায়দিগের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া আপনার পরাক্রম প্রদর্শন করিতেন, রায় ভ্রাতৃদ্বয়ও সেইরূপ সবেগে ইশা খাঁর রাজ্যে পতিত হইয়া তাঁহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেন। এইরূপ অবিরাম সংঘর্ষে উভয়ে উভয়ের পরাক্রমের পরিচয় পাইতেন। তাহার পর ইশা খাঁ

চাঁদরায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীকে হরণ করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করায় ঈশা খাঁর প্রতি তাঁহাদের ক্রোধ দাবানলসম প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। স্বর্ণময়ী-হরণের পর রোষে ক্ষোভে চাঁদরায় ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কেদার রায় তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

এই সময়ে বঙ্গোপসাগরে অনেকগুলি পর্টুগীজ বা ফিরিঙ্গী জলদস্যু বাস করিত। পর্টুগীজগণ প্রথমতঃ বাণিজ্যোপলক্ষে বঙ্গদেশে সমাগত হয়। পরে তাহারা দেশীয় রাজগণের অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। ক্রমে তাহা হইতে তাহারা দস্যুতা অবলম্বন করিয়া বঙ্গোপসাগরকে আন্দোলিত করিয়া তুলে। ফিরিঙ্গীগণের মধ্যে কেহ কেহ দস্যুতা অবলম্বন করিলেও তখনও পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে দুই এক জন প্রকৃত সেনানী দেশীয় রাজগণের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। কেদার রায় স্থল যুদ্ধ ও জল যুদ্ধ উভয়েরই দ্বারা আপনার পরাক্রম প্রদর্শনের ইচ্ছা করেন। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ বহুনদনদীসঙ্কুল ও সমুদ্রপ্রক্ষালিত হওয়ায় জলযুদ্ধেরই বিশেষ রূপ প্রয়োজন হইত। তিনি ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি রণতরী নির্ম্মাণ ও সংগ্রহ করিয়া পর্টুগীজদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদিগকে দমন করার তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ তাহাদের ক্ষমতা সঙ্কোচ করা, দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে তাঁহার পক্ষভুক্ত করা। কারণ তিনি জানিতেন যে, ফিরিঙ্গীরা জলযুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শী এবং কামান ও বন্দুক পরিচালনায় অদ্বিতীয় ছিল। কেদার রায়ের অবিরাম আক্রমণে ব্যাকুল হইয়া অবশেষে তাঁহাকেই তাহারা আপনাদের প্রভু স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কেদার রায় সেই সমস্ত ফিরিঙ্গীদিগকে আপনার রণতরী ও কামান বন্দুক পরিচালনের জন্য নিযুক্ত করিলেন। কার্ভেলিয়াস বা কার্ভালো নামে একজন সুচতুর সাহসী পর্টুগীজ বীরপুরুষ তাঁহার সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিলেন। এই কার্ভালোর অদ্ভুত বীরত্ব বাঙ্গালার ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, এই সময়ে মোগল সেনাপতিগণ পূর্ব্ব বঙ্গ অধিকারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কেদার রায় প্রথমতঃ ঈশা খাঁর

সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পরে মোগলদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। মোগলেরা তাঁহাদের উভয়েরই প্রবল শত্রু, এবং তাহারা তাঁহাদিগকে অধিকার-চ্যুত করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছিল। কাজেই তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ নিবৃত্ত করিয়া সেই সাধারণ শত্রুকে বিতাড়িত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। মোগলেরা তাঁহাদের বিক্রমপুর রাজ্যকে আপনাদের সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল, ও তাহার কোন কোন অংশে আপনাদের শাসনপ্রচলনের ও চেষ্টা করে। তন্মধ্যে সনদ্বীপই প্রধান। বঙ্গোপসাগরের হৃদয় হইতে উত্থিত কৃষি, বাণিজ্য ও স্বাস্থ্যপূর্ণ সনদ্বীপ বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরবিখ্যাত। এই সনদ্বীপের জন্য বঙ্গোপসাগরের নীল সলিল যে কত বার রুধিরধারায় রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর কত মুণ্ড যে গড়াগড়ি গিয়াছে, তাহারই বা সংখ্যা কে করিবে? কত গোলাগুলি যে ইহার কোমল বক্ষকে বিদীর্ণ করিয়াছে তাহাই বা কে বলিতে পারে?

সনদ্বীপ কেদার রায়েরই রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু মোগলেরা তাহা অধিকার করিয়া আপনাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করে। কেদার রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি এই গুরুতর কার্য্যের জন্য কার্ভালোকে নিযুক্ত করিলেন। ১৬০২ খৃঃ অব্দে কার্ভালো অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া মোগলদিগের হস্ত হইতে সনদ্বীপ অধিকার করিয়া লন। তিনি সনদ্বীপেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। মোগলেরা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া সনদ্বীপে কার্ভালোকে অবরোধ করিয়া ফেলে। কার্ভালো অবরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে চট্টগ্রামের পর্টুগীজ সেনাপতি ইমানুয়েল মাটুসের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মাটুস চারি শত সেনা লইয়া সনদ্বীপে উপস্থিত হন। মোগলগণও তাঁহাকে বাধা প্রদানের জন্য ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করে। ফিরিঙ্গী ও মোগলের জলযুদ্ধে বঙ্গোপসাগর আন্দোলিত হইয়া উঠিল। মোগলেরা সাহস-সহকারে যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু ফিরিঙ্গীর গোলার নিকট তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। মোগলেরা অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

জল হইতে মাটুসের ও স্থল হইতে কর্ভালোর আক্রমণে তাহারা সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সনদ্বীপ কার্ভালো ও মাটুসের হস্তে পতিত হইল। কেদার রায় তাঁহাদের হস্তেই সনদ্বীপের শাসনভার অর্পণ করিলেন। এইরূপে সনদ্বীপ আবার কেদার রায়ের রাজ্যভুক্ত হইল। কার্ভালো তাঁহার অধীন শাসনকর্ত্তা রহিলেন।

এই সময়ে মেংরাজগী আরাকানের সম্রাট ছিলেন, তিনি সেলিম সা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। চট্টগাম পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারে ছিল। তাঁহারও অধীনে অনেকগুলি পর্টুগীজ অবস্থিতি করিত। কিন্তু ক্রমে তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করে। উহাদের মধ্যে ফিলিপ ডি ব্রিটো প্রধান। বঙ্গোপসাগরে পর্টুগীজদিগের প্রাধান্য বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া আরাকানরাজ তাহাদের দমনের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাঙ্গালা আক্রমণেরও ইচ্ছা ছিল। তিনি কার্ভালোর হস্তে সনদ্বীপের শাসনভার অর্পিত হইয়াছে শুনিয়া তাহাকে দমন ও সনদ্বীপ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। তিনি দেড়শত খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ও কামান সজ্জিত বৃহৎ রণতরী পর্টুগীজদিগের বিরুদ্ধে সনদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। কার্ভালো সেই সংবাদ কেদার রায়ের নিকট পাঠাইলে তিনি আপনার একশত খানি কামান ও বন্দুক সজ্জিত কোষ নৌকা তাঁহার সাহায্যের জন্য শ্রীপুর হইতে সনদ্বীপে প্রেরণ করেন। বাঙ্গালীর পরিচালিত সেই নৌকাসমূহ পদ্মা ও সাগর কম্পিত করিয়া সনদ্বীপে উপস্থিত হইল। তাহাদের সাহায্য পাইয়া কার্ভালো বিপুল বিক্রমে সেলিম সার রণতরী সমূহ আক্রমণ করিলেন। বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গীর সহিত মগদিগের ভয়াবহ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বন্দুক ও কামানের ধূমে গগনমণ্ডল আবৃত হইয়া উঠিল। তাহাদের গর্জ্জনে নীল সমুদ্র মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গী অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইল। মগেরা অবশেষে পরাজিত হইয়া গেল। তাহাদের ১৪৯ খানি রণতরী কার্ভালোর হস্তে পতিত হইল। সনদ্বীপ কেদার রায়েরই রাজ্যভুক্ত থাকিল।

যে সময়ে কার্ভালোর সহিত সেলিম সার সৈন্যগণের জলযুদ্ধ হইতেছিল,

ব্রিটো সেই সময়ে কৌশলপূর্ব্বক আরাকানরাজের অধিকারস্থ পেগুর সাইরাম বন্দর অধিকার করিয়া বসে। সেলিম সা পর্টুগীজদিগের এরূপ ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া সনদ্বীপ অধিকারের জন্ত পুনর্ব্বার সহস্রখানি রণতরী পাঠাইয়া দিলেন। রণতরীসমূহ তোপধ্বনি করিতে করিতে বঙ্গোপসাগরের হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া সনদ্বীপে উপস্থিত হইল। কার্ভালোও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি আপনার অধীন পর্টুগীজ সৈন্ত ও কেদার রায়ের প্রেরিত বাঙ্গালী সৈন্ত-দিগকে আপন আপন রণতরীতে সজ্জিত করিয়া বিপুল উদ্যমে সেই বিরাট্ নৌ-শ্রেণীর সহিত অগ্নিক্রীড়া করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাদের রণকৌশল ও অমানুষিক সাহসে মগদিগের রণতরীসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। তাহাদের কতকগুলি বঙ্গোপসাগরের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইল। কতকগুলি কামান ও বন্দুকের গোলায় দগ্ধ হইয়া গেল। অবশিষ্টগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই ভীষণ জলযুদ্ধে মগদিগের প্রায় দুই সহস্র সেনা হত ও ১৩০ খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায়, এবং তাহারা ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর অদ্ভুত বীরত্বে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। এই যুদ্ধেও কার্ভালো জয় লাভ করেন, এবং তাঁহার নাম সমস্ত বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া পড়ে। সেলিম সাঁ কাপুরুষতার জন্ত আপন সেনাপতিদিগকে যার পর নাই তিরস্কার করিয়াছিলেন।

কার্ভালো এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাঁহার রণতরীসমূহের কতক ভগ্ন ও কতক নষ্ট হইয়া যায়, তিনি আবার আপনার নৌশ্রেণী গঠনের জন্য সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন, এবং শ্রীপুর, বাকলা ও সাগর-দ্বীপে তাঁহার রণতরীসমূহের সংস্কার ও নূতন রণতরী সমূহের নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। শ্রীপুরে কার্ভালোর নিকট ৩০ খানি রণতরী অবস্থিত ছিল। কার্ভালো সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিলে আরাকানরাজ তাহা অধিকার করিয়া বসেন। কেদার রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্ত মনোনিবেশ করিতে না করিতে আর এক ভীষণ শত্রু বিজয়ভেরী বাজাইয়া তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হয়। যে সময়ে সনদ্বীপ লইয়া ঘোরতর অগ্নিক্রীড়া চলিতেছিল, সেই সময়ে, মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থান অধিকার করিয়া কেদার

রায়ের রাজ্য অধিকারের জন্য এক শত খানি কোষ নৌকা সহ মন্দারায়কে পাঠাইয়া দেন। মোগলের কামানসজ্জিত কোষ নৌকা পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালাকে উপেক্ষা করিয়া কেদার রায়ের রাজ্যে উপস্থিত হইল, ও তোপধ্বনিতে আপনাদের আগমন ঘোষণা করিল। কেদার রায় পূর্ব্ব হইতে সতর্ক না থাকিলেও মোগল সেনাপতির আতিথ্যের ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করিলেন না।

কার্ভালোর প্রতি প্রধানতঃ আতিথ্যের ভার প্রদত্ত হইল। কার্ভালো আপনার সেই ৩০ খানি রণতরী ও আর কয়েক খানি কোষ নৌকা লইয়া আপনার ফিরিঙ্গী ও শিক্ষিত বাঙ্গালী গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া মন্দারায়কে আক্রমণ করিলেন। মোগলের দুর্জ্জয় কামান ঘনধ্বনির ন্যায় গর্জ্জন করিয়া অগ্নিময় গোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু ফিরিঙ্গী বীর কার্ভালোকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিল না। তাহারও কামানরাশি মোগল কামানের অনুহুঙ্কার করিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই অদ্ভুত যুদ্ধে পদ্মার তরঙ্গ শত গুণে বাড়িয়া উঠিল, রণপোতগুলি সেই তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া নাচিতে লাগিল। মোগলেরা যেমন অত্যদ্ভুত বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিতেছিল, ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালী তদনুরূপই রণক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিল। মন্দারায় আপনার অসীম পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কার্ভালোর বিক্রমে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। এই ভীষণ রণযজ্ঞে তাঁহার জীবনকে আহুতি দিতে হইল, এবং ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর কামানের গোলায় তাঁহার রণপোতগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। কতকগুলি বা সলিলগর্ভে আশ্রয় লইল,: কতকগুলি বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। মানসিংহের আর কেদার রায়ের রাজ্য অধিকার করা ঘটিয়া উঠিল না। মোগলসেনাগণ ফেরুপালের ন্যায় বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল। এই যুদ্ধে কার্ভালোর বীরত্ব আরও স্ফুটতর হয়। তিনি শ্রীপুর পরিত্যাগ করিয়া আপনার অন্যান্য রণতরী সংগ্রহ করেন। পরে মোগলদিগের অধীন গলিন বা হুগলী বন্দরস্থ দুর্গ অধিকার করিয়া অসীম বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার নামে লোকে এইরূপ ভীত হইয়া উঠিত যে, একজন মগ

সেনানী স্বপ্নে কার্ভালো কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া আপনার অনুচরদিগকে চকিত করিয়া তুলে, এবং তাহারা নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আরাকানরাজ তৎসংবাদে উক্ত সেনাপতির প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। গলিন বন্দর অধিকার করিয়া কার্ভালো প্রতাপাদিত্যের আশ্রয়ে গমন করেন। প্রতাপাদিত্য কিন্তু আরাকানরাজের মনস্তুষ্টির জন্য কৌশলে সেই বীরপুরুষের হত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন !

পাঠানরাজলক্ষ্মী গৌড় হইতে চিরনির্ব্বাসিতা হইলেও বাঙ্গলার শ্যামল প্রান্তর হইতে পাঠানের দুর্দ্দমনীয় শক্তি একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। দায়ুদের পর কত্‌লু খাঁ, ইশা খাঁ ও তৎপরে ওসমান খাঁ সেই শক্তিকে জাগরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ওসমানের বিজয়-ভেরী প্রথমে উড়িষ্যায় নিনাদিত হইয়া পরে পূর্ব্ববঙ্গে মহান্দোলন উপস্থাপিত করে। সেই ব্যোমবিদারী বিজয়ভেরীর গভীর নিনাদ শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত মোগলসেনাপতি বাজবাহাদুর তাহার নীরবতা সম্পাদনের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ওসমানের ভেরীনিনাদ কিছুতেই নিবৃত্ত না হওয়ায়, মানসিংহ বাজবাহাদুরের সাহায্যের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন। মিলিত মোগলসৈন্যের হুঙ্কারে কিছুকালের জন্য ওসমানের ভেরী নীরবভাবে অবস্থান করে। ইহার পর বাজবাহাদুর ইশা খাঁর ও কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। ওসমান, ইশা ও কেদার রায়ের প্রভুত্বে মোগলসেনাপতিগণ পূর্ব্ববঙ্গে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। বাজবাহাদুরকে সোনার গাঁ ও বিক্রমপুর অধিকার করিবার জন্য উদ্যোগী দেখিয়া পুনর্ব্বার ওসমান স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দেন। মানসিংহ আবার তাঁহার দমনের জন্য অগ্রসর হন। ওসমান পরাস্ত হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিলে মানসিংহ বিক্রমপুর ও শ্রীপুর অধিকারের জন্য মনোনিবেশ করেন। কেদার রায়ও তাঁহাকে বাধাপ্রদানের জন্য উদ্যোগী হন। মোগলরাজপুতে ও বাঙ্গালীফিরিঙ্গীতে আবার রণাভিনয় আরব্ধ হইল। আবার উভয় পক্ষের অগ্নিক্রীড়া চলিতে লাগিল। কেদার রায় অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মান-

সিংহকে চমকিত করিলেন। কিন্তু এবার তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল। কথিত আছে যে, মানসিংহ তাঁহাকে আবার তাঁহার রাজ্য পুনঃপ্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে কেদার রায়ের কুলদেবতা শিলামাতাকে মানসিংহ লইয়া যান। শিলামাতা অদ্যাপি জয়পুররাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অম্বর নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। *

কেদার রায় পরাস্ত হইয়া মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একেবারে স্বাধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই। মানসিংহ তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ক্রমে কেদার রায় আবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে আরাকানরাজ সেলিম সাও আপনার গোলন্দাজ সেনা ও রণতরী লইয়া বাঙ্গলা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি কেদার রায়ের পরাক্রম বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন। কেদার রায়ের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তিনি যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না, সেইজন্য তিনি কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান অধিকারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেদার রায় তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, উভয়ে মিলিত হইয়া অনেক স্থান মোগলদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। ইহার পূর্ব্বে ইশা খাঁর মৃত্যু হওয়ায় সোনারগাঁও মগরাজ ও কেদার রায়ের হস্তে পতিত হয়। কথিত আছে সোনারগাঁ আক্রমণ কালে চাঁদরায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী বা সোনাবিবি কেদার রায় ও মগদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেদার লজ্জায় ও ক্ষোভে সোনারগাঁ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। মোগলসৈন্যেরা তাঁহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ না হওয়ায়, পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান কেদার রায় ও মগরাজের অধীনে আইসে।

আবার পূর্ব্ববঙ্গে অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে মানসিংহ

* অনেকে শিলামাতাকে যশোরেশ্বরী বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। প্রতাপাদিত্য গ্রন্থে ইহার বিস্তৃতরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। জয়পুরের রাজবংশের বিবরণে লিখিত আছে যে, মানসিংহ কেদার রায়ের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাহার নির্ব্বাণের জন্ত বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাকে সেলিম সা ও কেদার রায় উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিতে হয়। কিন্তু সুচতুর মানসিংহ একেবারে উভয়কে আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে না করিয়া প্রথমে সেলিম সার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির করেন। আরাকানীরা জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ উভয় সংগ্রামেই পারদর্শী ছিল। কাজেই মানসিংহকে তাহারই আয়োজন করিতে হয়। তৎপূর্ব্বে আরাকানরাজ ও কেদাররায়ের সন্ধি ভঙ্গ হওয়ায়, মানসিংহের পক্ষে মহাসুযোগ উপস্থিত হইল। মানসিংহ এতদিন যাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই মহাসুযোগ সহসা উপস্থিত হওয়ায়, তিনি বিলম্ব না করিয়া ১৬০৩ খৃঃ অব্দের প্রথমেই আরাকানরাজ সেলিম সার সৈন্তদিগকে আক্রমণ করিলেন। জলে স্থলে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। যদিও আরাকানীরা ও তাহাদের সহিত মিলিত ফিরিঙ্গীরা মোগলদিগকে বাধা দিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মানসিংহের শিক্ষিত সৈন্তগণের নিকট তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। মানসিংহ তাহাদিগকে পূর্ব্ব-বঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন।

মগরাজকে দমন করিয়া মানসিংহ পুনর্ব্বার কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত ইচ্ছুক হন। কিন্তু তাহার অনেক রণতরী ও সৈন্য মগদিগের সহিত যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়ায়, তিনি সে বৎসরে উক্ত সংকল্প ত্যাগ করেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৬০৪ খৃঃ অব্দে মানসিংহ নব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আবার কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হন। কেদার রায়ও পূর্ব্ব হইতে তাহা অবগত হইয়াছিলেন। তিনিও বিপুল মোগলবাহিনী ও রণতরীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্ত প্রাণপণে আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি পাঁচ শত রণতরী সংগ্রহ করেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ সেনা এবং সেনাপতিগণ সেই সমস্ত রণতরীতে দুর্জ্জয় কামান স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত নদনদী ও সমুদ্র আন্দোলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। তদ্ভিন্ন কেদার রায় অনেক পদাতি ও অশ্বারোহী সেনা সমবেত করিয়াছিলেন। মানসিংহ প্রথমতঃ মোগল সেনাপতি কিলমক্‌কে কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর

হইবার জন্ত আদেশ দেন। কিলমক্ সসৈন্তে শ্রীনগর নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, কেদার রায়ের সেনা তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া অবরোধ করিয়া ফেলে। এইরূপ অবরুদ্ধ অবস্থায় কিলমক্‌কে কিছুকাল অবস্থিতি করিতে হয়। মানসিংহ কিলমকের দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া তাহার সাহায্যের জন্ত এক দল মোগল সেনা পাঠাইয়া দেন। আবার বাঙ্গালী সৈন্তের সহিত মোগল সৈন্তের ঘোরতর অগ্নিক্রীড়া উপস্থিত হইল। কামানের গর্জ্জনে ও সৈন্তের হুঙ্কারে ব্যোম ও বসুধা ঘন ঘন বিকম্পিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর অত্যদ্ভুত বীরত্বে মোগল ও রাজপুতগণ চমকিত হইয়া গেল। এই যুদ্ধে কেদার রায় নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহাপরাক্রম প্রদর্শন করিয়া মোগলের বিশ্বধ্বংসকর গোলা উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয় পক্ষের ভয়াবহ অগ্নিযুদ্ধ হইল। অবশেষে কেদার রায় আহত হইয়া পড়িলেন। মোগলেরা জয়লাভ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল ও তাঁহাকে মানসিংহের নিকট লইয়া চলিল। মানসিংহের নিকট নীত হওয়ার কিছু পরে তিনি এ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয়ধামে চলিয়া যান। *

এইরূপে মহাপ্রাণ কেদার রায়ের অবসান হয়। যিনি স্বাধীনতালক্ষ্মীর প্রিয়সেবক হইয়া মগফিরিঙ্গী ও পাঠানমোগলের সহিত অবিরাম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, মানসিংহের সর্ব্বনাশিনী প্রবৃত্তি অবশেষে তাঁহার ধ্বংস সম্পাদন করে। সুচতুর আকবর বাদসাহ পাঠানবাঙ্গালী ও মগফিরিঙ্গীর উচ্ছেদের জন্তই মানসিংহকে বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন। তাই বাঙ্গলার ভাগ্যা-

* "Raja Mansingh after defeating the Magh Raja, turned his attention towards Kaid Rai of Bengal, who had collected nearly 500 vessels of war and had laid seige to Kilmack the imperial commander in Srinagar. Kilmack held out, till a body of troops was sent to his act by the Raja. These finnally overcame the enemy, and after a furiors cannonade took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds soon after he was brought before the Raja." ( Inayatulla's Takmillu-i-Akbarnama. Elliot's History of India Vol. VI.)

কাশে ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হইয়া মানসিংহ বাঙ্গালী জাতিকে একেবারে নির্বীর্য্য করিয়া যান। কেদার রায়ের সহিত তাঁহাকে তিনবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। প্রথমবারে তাঁহার সেনাপতি মন্দারায় কেদার রায়ের সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দেন। দ্বিতীয় বার স্বয়ং মানসিংহ বহু সৈন্য লইয়া কেদার রায়ের রাজ্যে উপস্থিত হন, এবং তাঁহার অদ্ভুত রণক্রীড়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই আবার স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যান। তৃতীয়বার তাঁহার সেনাপতি কিলমক্ অবরুদ্ধ হইলে মানসিংহ তাঁহার উদ্ধারের জন্য বিপুল মোগল বাহিনী পাঠাইলে মোগলের দুর্জ্জয় কামান কেদারকে আহত করিয়া ফেলে। যে মহাপুরুষ তিনবার মোগল বাহিনীর সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া কামানের গোলা ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং মগ, ফিরিঙ্গী ও পাঠানের সহিত অত্যদ্ভুত রণক্রীড়া করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী জাতির নিকট তিনি কি প্রাতঃস্মরণীয় নহেন? দেবতার ন্যায় তিনি কি বাঙ্গালীর নিকট হইতে পূজা পাইতে পারেন না? বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা তিনি কি কোন অংশে ন্যূন ছিলেন? অধিকন্তু তাঁহার চরিত্রে প্রতাপের ন্যায় নিষ্ঠুরতা বা চতুরতা স্পর্শ করে নাই। তিনি কখনও মোগল সম্রাটের কৃপাভিখারী হন নাই। প্রকৃত বীরের ন্যায় তিনি স্বাধীনতারই সেবা করিয়াছেন, ও প্রকৃত বীরের ন্যায়ই অবশেষে আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাই তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী বৈদেশিক পরিব্রাজক-গণ বর্ণনা করিয়াছেন। মুসল্মান ঐতিহাসিকও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। বর্ত্তমান মহাপুরুষপূজার যুগে আমরা কেদার রায়ের পূজা দেখিতে চাই। বাঙ্গালী কবির লেখনীতে তাঁহার গৌরব চিত্রিত হউক, বাঙ্গলার পল্লীবালগণের কণ্ঠে তাঁহার নাম ধ্বনিত হউক। আর বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার নামশ্রবণে মস্তক অবনত করুক। যে জাতির মধ্যে কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে জাতি যে ধন্য, ইহা সকলের মনে জাগরূক থাকুক। আর আমরা যে কাপুরুষের বংশধর নহি, ইহা সর্ব্বদা জপমন্ত্রের ন্যায় আমাদের মনে উদয় হউক।

কেদার রায় যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া রাজনৈতিক জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার অনেক কীর্ত্তি পূর্ব্ব-বঙ্গকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তাঁহারা বিক্রমপুর বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের গোষ্ঠী-পতি ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে ভূমি ও বৃত্তি দান করিয়া তাঁহারা আপনাদের সংপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গজ কায়স্থদিগের তিনটি প্রধান সমাজ পরস্পরের গৌরববর্দ্ধনের জন্য চেষ্টা করিত। শ্রীপুরের রায়-বংশ বিক্রমপুরের, বাকলার রায় বংশ চন্দ্রদ্বীপের ও যশোরের রায়বংশ যশোর সমাজের গোষ্ঠীপতি থাকিয়া স্ব স্ব সমাজের গৌরবরক্ষার জন্য সতত যত্ন করিতেন। এই তিন সমাজে অবস্থিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি অনেক ভূসম্পত্তি ও বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া পুরুষপরম্পরাক্রমে আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণেও কোন কোন স্থানে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত সংকীর্ত্তি ব্যতীত চাঁদরায় ও কেদার রায় অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দীঘিকা খনন করিয়া আপনাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিরও পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শিলামাতা মানসিংহ কর্ত্তৃক নীত হইয়া অদ্যাপি জয়পুর রাজ্যের অম্বর নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি নদীয়া জেলায় কালীগঞ্জ থানার অধীন লাখুরিয়া গ্রামের চৌধুরী মহাশয়দিগের বাটীতে অদ্যাপি বিরাজিত আছেন। তাঁহার পদোপরি কেদার রায়ের নাম খোদিত আছে। কেদারপুর নামক গ্রামেও তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা রাজবাড়ী মঠ তাঁহাদের বিরাট্ কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। পদ্মার তীরস্থ সেই বিরাট্ শিবমন্দির জঙ্গলে আচ্ছাদিত হইয়া ও অশ্বত্থবট ইত্যাদি বৃক্ষ অঙ্গে ধারণ করিয়া, তাঁহাদের সুনাম ঘোষণা করিতেছে। এই চতুশ্চূড় মন্দির নানাপ্রকার খোদিতচিত্র ইষ্টকে ভূষিত হইয়া বাঙ্গলার প্রাচীন স্থাপত্যেরও সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার নিকট ও কেদারবাটীনামক স্থানে দুই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা অদ্যাপি অবস্থিত আছে। এতদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য কীর্ত্তিচিহ্ন পূর্ব্ব বঙ্গের নানাস্থানে বিরাজ করিতেছে। ফলতঃ এই সমস্ত কীর্ত্তি ও তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্ব আলোচনা করিয়া প্রতীতি

হয় যে, কেদার রায়ের ন্যায় মহাপুরুষ এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির মধ্যে জন্মিই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি বাঙ্গালী জাতীয়তার ইচ্ছা করে, তাহা হইলে এই সমস্ত ঐতিহাসিক মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা তাহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা ব্যতীত পতিত জাতির উদ্ধারের আর কোন আশা নাই, ইহা স্বতঃই আমাদের মনে উদয় হইয়া থাকে।

---

# ইবন্ বটুটার বঙ্গদেশপর্য্যটন।

আবদল্লা অল লাওয়াতি তানজি বন্ বটুটা ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে (৭০৩ হিজরী) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ। একবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে (১৩২৫ খৃষ্টাব্দে) দেশপর্য্যটন উদ্দেশ্যে জন্মভূমি তানজির (Tangier) হইতে যাত্রা করিয়া আফ্রিকা ও আসিয়ার অধিকাংশ ভাগ পরিভ্রমণ করেন। তৎপর তীর্থদর্শনের কার্য্য শেষ করিয়া তিনি সিরিয়া, অল ইরাক্, পারস্য, মেসোপোটামিয়া, আসিয়ামাইনর অতিক্রম করেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি দক্ষিণ রুশিয়া, কনষ্টানটিনেপল, .Dypchaq প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তৎপর বোখারা ও আফগানিস্থান অতিক্রম করতঃ বটুটা দিল্লী নগরীতে উপনীত হন, এবং দুই বৎসর কাল তথায় 'কাজি' হইয়া অবস্থান করেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালেই তিনি, সুলতান গিয়াসুদ্দীন তগলক কর্ত্তৃক এক মিশনের সহিত চীন দেশে প্রেরিত হন। কিন্তু মালদিভস্ পর্য্যন্ত গমন করিয়াই বটুটা তথায় পুনরায় কাজি গিরি করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতেই দেড় বৎসর অতিবাহিত হয়। তৎপর সিলোন এবং চীন দেখিয়া ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ সনেই তিনি গ্রানাডা পরিভ্রমণ করেন এবং পর বৎসর সুদন (Soudan) যাত্রায় বহির্গত হইয়া মেলি (Melli) এবং টিম্বাক্টু (Timbuctoo) পরিভ্রমণ করেন। ১৩৭৭ খৃঃ অব্দে (হিজরী ৭৭৯ সালে) ৭৪ বৎসর বয়সে বটুটা পরলোক গমন করেন।

স্যামুয়েল লি নামক এক ইংরেজ লেখক কর্ত্তৃক বটুটার ভ্রমণ কাহিনী ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হইয়া ১৮২৯ সালে "Travels of Ibn Batutah" নামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু অনেকে এই সংস্করণকে ভ্রমপরিপূর্ণ বলিয়া তাদৃশ আদর না করিয়া মূল গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতেই প্রয়াস পান। শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ইবনু বটুটার নিজের লিখিত গ্রন্থ হইতে

বঙ্গদেশের যে বিবরণ ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন, তাহা হইতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ সংকলন করিলাম।

১৩৪০ খৃষ্টাব্দ।

বটুটা লিখিয়াছেন,—মালদিভের মাহাই দ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া আমরা ৪৩ দিন সমুদ্র-বক্ষে অতিবাহিত করতঃ বঙ্গদেশে উপনীত হই। বঙ্গদেশ একটি বিস্তৃত প্রদেশ, তথাকার পণ্যদ্রব্য সুলভ। কিন্তু বায়ুমণ্ডল তমসাচ্ছন্ন, তজ্জন্য খোরাসান্‌বাসিগণ উহাকে—"দুজাখস্‌-পুর্‌-ই-নি-'আমত্‌" (মঙ্গলময় নরক) নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশে এক রৌপ্য দিনারে দিল্লীর রিথলের (১) ওজন অনুসারে ২৫ রিথল তণ্ডুল বিক্রয় হইতে আমি দেখিয়াছি। একটী রৌপ্য দিনার আট দিরামের সমতুল্য; এবং আমাদের দেশের রৌপ্যদিরাম ও বঙ্গদেশের দিরামের মূল্য একবারে সমান। দিল্লীর এক রিথল, মাঘ্‌রিবের কুড়ি রিথলের সমান। আমি বঙ্গবাসীদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে, শস্যের ঐরূপ মূল্য তাহাদের পক্ষে অধিক।

মহম্মদ উল-মস্‌মুদি উল মাঘ্‌রাবি; ইনি একজন মহাজন ব্যক্তি, পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বাস করিতেন, পরে দিল্লী নগরীতে আমার আলয়ে অবস্থান কালে পরলোক গমন করেন। ইনি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে, তাঁহার পত্নী ও একজন ভৃত্য বঙ্গদেশে অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের বাৎসরিক বাসা খরচ মাত্র আট দিরাম লাগিত এবং তিনি আট দিরামে দিল্লীর আশি রিথল ধান্য ক্রয় করিতেন। এই ধান্য পেষণ করিয়া পরিষ্কার ৫০ রিথল চাউল পাওয়া যাইত। আমি নিজে একটী দুগ্ধবতী গাভী তিন রৌপ্য

(১) দিল্লীর এক রিথল (*rithal*)=মাঘ্‌রিবের (Maghrib উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার) ২০ রিথল। শেষোক্ত স্থানের এক রিথাল প্রায় সাত পোয়া হয়। এক দিরাম ইংরেজি দশ ফার্দিং বা বাঙ্গলা দশ পয়সা প্রায় সমতুল্য।

দিনার মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি এবং এতদ্দেশের বৃষ ঠিক মহিষের ন্যায় বলশালী। গৃহপালিত হাঁস, মুরগী প্রভৃতি এক দিরামে আটটী করিয়া এবং পায়রা পনরটা হিসাবে বিক্রীত হইতে দেখা গিয়াছে। একটী স্থূলকায় ভেড়া দুই দিরাম মূল্যে, এক রিথল শর্করা চারি দিরামে, এক রিথল গোলাপজল আট দিরামে, এক রিথল ঘৃত চারি দিরামে এবং এক রিথল সর্ষপতৈল দুই দিরামে বিক্রয় হইতে আমি দেখিয়াছি।

সূক্ষ্ম কার্পাসে প্রস্তুত অতি উত্তম বস্ত্রের ত্রিশ হাত দুই দিনারে আমারই চক্ষের সম্মুখে বিক্রয় হইয়া গেল। সুদৃশ্য দাসীর মূল্য এক স্বর্ণদিনার ( মাঘ-রিবের সাড়ে আট স্বর্ণ দিনারের সমতুল্য )। আমি ঐ মূল্যেই আস্থুরানাম্নী এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী বালিকা ক্রীতদাসী ক্রয় করি এবং আমার এক সহচর, লুলুনামধেয় অল্পবয়স্ক সুরূপ এক ক্রীতদাস দুই স্বর্ণ দিনার দিয়া সংগ্রহ করেন।

বঙ্গদেশের প্রথম নগর যাহা আমরা দর্শন করি, তাহার নাম সাতগাঁ। বৃহৎ বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ইহা একটি প্রসিদ্ধ ও প্রকাণ্ড নগর। ইহার সন্নিকটেই গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থল। বহুতর হিন্দু তথায় তীর্থস্নান মানসে গমন করিয়া থাকে। গঙ্গার উপর অধিবাসিবৃন্দের অসংখ্য রণতরী সজ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারাই তাহারা লক্ষ্ণৌতী-বাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে।

সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম যোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গের একটি প্রধান নগর বলিয়া বিবেচিত হইত। সরস্বতীর উপকূলে অবস্থিত বলিয়াই উহার এত গৌরব ও সমৃদ্ধি ছিল। পূর্ব্বে সরস্বতীই ভাগীরথীর প্রধান শাখারূপে প্রবাহিত হইত। হুগলীর উত্তর ত্রিবেণীতে উহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক শাখা পশ্চিম অভিমুখে সরস্বতী নামে এবং অপর শাখা পূর্ব্ব দিকে যমুনা নামে প্রবাহিত হয়। এক্ষণে এই উভয় শাখার প্রবেশ স্থানই মজিয়া গিয়াছে এবং ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশেই কেবল যমুনার কার্য্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। আইনী আকবরীতে আবুল ফজল লিখিয়াছেন,—'বারবাকাবাদ

সরকারের কাজিহাটা নামক স্থানে গঙ্গা দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার এক ধারা পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চাট্‌গাঁয়ের নিকট সাগরে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে; এই বিচ্ছিন্ন স্রোতোধারকে পদ্মাবতী বলা হয়। অপর অংশ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় তিন অংশে বিভক্ত হইয়া যায়, তাহার একটি সরস্বতী, একটি যন (বা যমুনা) এবং তৃতীয়টি গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই তিনটিকে একত্রে হিন্দীতে 'ত্রিবেণী' বলে এবং হিন্দুর চক্ষে অতি পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। তৃতীয়টি (বর্ত্তমান হুগলী নদী) সাতগাঁর নিকট সহস্র-ধারায় অঙ্গ এলাইয়া দিয়া অবশেষে সাগরের অনন্ত পারাবারে অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়াছে। সরস্বতী এবং যমুনাও সাগরের প্রশান্ত হৃদয়ের অভ্যন্তরে আশ্রয় প্রাপ্তা হইয়াছে।' মুসলমান রাজত্বের প্রথম ভাগে, সাতগাঁ নিম্ন বঙ্গের শাসনকর্ত্তার রাজধানী ছিল; তথায় একটি টাঁকশালও প্রতিষ্ঠিত হয়। এক সময় ব্যবসায়বাণিজ্য ও আমদানীরপ্তানীর আধিক্যে সাতগাঁ ভারতবর্ষের মধ্যে এক অতি সমৃদ্ধিশালী নগর মধ্যে পরিগণিত হয়। (১)

তৎপর পর্য্যাটক বঙ্গের শাসনকর্ত্তাগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সুলতানের বিবরণ। এই সময় বঙ্গের সিংহাসনে সুলতান কথ্‌রুদ্দীন সমাসীন। তিনি অতি উৎকৃষ্ট নরপতি ছিলেন এবং বিদেশীয়-দিগকে,—বিশেষতঃ ফকির ও সুফীদিগকে স্নেহের চক্ষে অবলোকন করিতেন। দেশের শাসনভার সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের পুত্র সুলতান নাছিরুদ্দীনের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই নরপতি স্বীয় পুত্র মুইজামুদ্দীনকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু পরে তাহারই বিরুদ্ধে সমরসজ্জার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পিতা পুত্রে গঙ্গার তীরে সাক্ষাৎলাভ করেন; তাঁহাদের এই মিলন শুভ-সংযোগ বলিয়া বিবেচিত হয়।

৬৬৪ হিজরীতে গিয়াসউদ্দীন বলবন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(১) Hunter's Statistical Account of Bengal vol. I.

তাঁহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই বঙ্গের স্বাধীন শাসনকর্ত্তা মোহাম্মদ তাতার খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তিনি সের খাঁকে লক্ষ্ণৌতীর শাসনকর্ত্তা-রূপে নিযুক্ত করেন। শের খাঁর পরে আমীর খাঁ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু এই সময় বলবন পীড়িত হওয়ায়, আমীরের সহকারী তুগরল সুযোগ বুঝিয়া ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাঘিস্‌উদ্দীন নাম পরিগ্রহ করত আপনাকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রচারিত করেন। আরোগ্যলাভ করিয়া বলবন তুগরলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সোণারগাঁর নিকটে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া স্বীয় পুত্র বাঘরা খাঁকে বঙ্গদেশের সুলতান করেন। এই শাসন-কর্ত্তাই সুলতান নাছিরুদ্দীন উপাধি ধারণ করেন। পিতার মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে নাছিরুদ্দীনও ৬৯১ হিজরীতে পরলোকের যাত্রী হন। ১২৮৭ অব্দে নাছি-রুদ্দীনের পুত্র মুইজুদ্দীন কাইকোবাদ দিল্লীর মসনদে উপবিষ্ট হইয়া নিজের এক পারিষদ কুচক্রী মালিক নিজামুদ্দীনের কুপরামর্শে নিজের সহোদরকে হত্যা করিতে মনস্থ করেন।

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া নাছিরুদ্দীন অত্যন্ত কুপিত হন এবং পুত্রকে সাবধান করিয়া অনেকগুলি পত্র লিখেন কিন্তু তৎসমস্তই ব্যর্থ হয়। অবশেষে ৬৮৭ হিজরীতে নাছিরুদ্দীন এক দল সৈন্য লইয়া অবাধ্য পুত্রকে শাসন ও দিল্লী জয় করিতে বহির্গত হন। কোরার ( Corrah ) নিকট গঙ্গাতীরে পিতা পুত্রে সম্মুখীন হন। "তাহারা উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে কৃতসংকল্প হন ; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় মুসলমান রক্তে ধরণী প্লাবিত হইতে হইতে বাঁচিয়া যায়,—নাছিরুদ্দীনের হৃদয় অপত্যস্নেহে বিগলিত হয়। প্রজাবৃন্দের রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইতে হইতে স্থগিত হওয়ায় মুসলমানেরা তাঁহাদের এই সম্মিলনকে দুইটি মঙ্গলকর গ্রহের একত্র মিলনের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। তৎ-কালীন প্রসিদ্ধ কবি দিল্লীনিবাসী মীর খস্‌রু এই ঘটনা লইয়া এক উপাদেয় গাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইবু বটুটা এই ঘটনাই সংক্ষেপে উপরে উল্লেখ করিয়াছেন। নাছিরুদ্দীনের পর তৎপুত্র রুকমুদ্দীন সিংহাসন অধিকার ( ৬৯১ হিজরী ) করেন, তৎপর ৭০২ হিজরাতে ( ১৩০২ খৃষ্টাব্দে ) তদ্‌ভ্রাতা

শামসুদ্দীন মসনদ প্রাপ্ত হন। শামসুদ্দীনের পর তৎপুত্র ৭১৮ হিজরীতে রাজ্যাধিকার লাভ করিলে তাঁহার খুল্লতাত গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর বোরা রাজ্য অপহরণ করিয়া লন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন তগলকের সাহায্যে শামসুদ্দীন পুনরায় রাজ্য অধিকার করেন এবং বাহাদুর ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন। অবশেষে গিয়াসুদ্দীন তোগলকের জামাতা মোহাম্মদ শাহ তোগলক ৭২৫ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করত কতিপয় সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু মোহাম্মদ শাহের অদৃষ্টে অধিক দিন রাজ্য-সুখভোগ বিধাতার বিধান ছিল না, তজ্জন্য ৭৩১ হিজরীতে (১৩৩০ খ্রীঃ অঃ) সম্রাট তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, মালিক সদর খিল্‌জি নামক এক সম্রান্ত ওমরাওকে 'কাদের খাঁ' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া লক্ষ্ণৌতীর শাসনভার প্রদান করেন। কিন্তু ইঁহারও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল না; সোণারগাঁর সুলতান বারাম খাঁর ঢাল-বরদার ফখ্‌রুদ্দীনের হস্তে ১৩৩৮ অব্দে মালিক নিহত হন। বঙ্গ-দেশের স্বাধীন মোসলমান নরপতিগণের মধ্যে ফখ্‌রুদ্দীনই সর্ব্ব প্রথম। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ফখ্‌রুদ্দীন আবুল মোজাফর মুবারক শাহ। জগতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত শীঘ্রই হোক্ বা বিলম্বেই হোক্ প্রায়ই হইতে দেখা যায়। পাপীকে মর-জগতে দণ্ড ভোগ করিতে হয়। ফখ্‌রুদ্দীনের বেলায় সে সনাতন নীতি কেন অনুসৃত হইবে না? স্বজাতির তপ্তরুধিরে যে ভাবে হস্ত ও তরবারি কলঙ্কিত করিয়া ফখ্‌রুদ্দীন নিজের সুখের ভোগের পথ বিস্তৃত করেন, মালিক আলি মুবারকও (ইবু বটুটার আলিশাহ) সে পন্থা অবলম্বন করত নিজের উন্নতি-পথের কণ্টক উন্মূলিত করিয়া ফেলেন। ফখ্‌রুদ্দীন পাঁচ বৎসর রাজ্য ভোগ করিলে পর, ৭৪১ হিজরীতে মালিক আলি মুবারক তাঁহাকে হত্যা করিয়া স্বজাতিবধের প্রতিফল প্রদান করেন।

তারপর ইবু বটুটা লিখিয়াছেন,—নছিরুদ্দীন ও মুইজুদ্দীন—পিতাপুত্রে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পর, পিতা বঙ্গরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করত পরলোক গমন পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। তৎপর তদীয় পুত্র শামসুদ্দীন পরে তৎপুত্র শাহাবুদ্দীন শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। শাহাবুদ্দীন পিতৃব্য গিয়াসুদ্দীন

বাহাদুর বার কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সুলতান গিয়াসুদ্দীন তোগলকের আশ্রয়প্রার্থী হন। তিনি আসিয়া বারকে ধৃত করত কারাবদ্ধ করেন। পরে তোগলকের পুত্র মহম্মদ কর্তৃক বার এই সর্ত্তে কারামুক্ত হন যে, তিনি তাহাকে বঙ্গরাজ্যের কিছু ভাগ দিবেন। মুক্তি লাভ করিয়াই বাহাদুর বার, মোহাম্মদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করেন। ইহাতে মোহাম্মদ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সংগ্রামক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া নিহত করেন। তৎপর তিনি নিজের এক আত্মীয়কে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি নিজের সৈন্যদলের অসির আঘাতেই ভবলীলা সংবরণ করিতে বাধ্য হন। লক্ষ্ণৌতীতে এই সময় আলিশাহ অবস্থান করিতেছিলেন, সুযোগ বুঝিয়া তিনি আপনাকে বঙ্গেশ্বর বলিয়া প্রচার করেন। ফথ্রুদ্দীন যখন দেখিলেন, বঙ্গের মসনদ সুলতান নছিরুদ্দীনের বংশধরগণের অধিকারচ্যুত হইতে বসিয়াছে, তখন তিনি সাতগাঁ হইতে সমগ্র বঙ্গদেশে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ফথ্রুদ্দীন ও আলিশাহের মধ্যে বিদ্বেষ-বহ্নি উজ্জ্বলীকৃত হইয়া উঠিল,—উভয়েই উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। ফথ্রুদ্দীনের ক্ষমতা জলপথেই দুর্দ্দমনীয় ছিল, কাজেই শীত ঋতুতে তিনি লক্ষ্ণৌতী আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে আলিশাহ ত কম নহেন, স্থলপথে তাঁহার শক্তিও নিতান্ত অল্প ছিলনা, তাই তিনিও তদভিপ্রায়ে বর্ষা ঋতুকে দেশ হইতে বৎসরের মত নির্ব্বাসিত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন।

মোসলমান সাধু ও ফকির।—সুলতান ফথ্রুদ্দীন সাধু ও ফকিরদিগের প্রতি বড়ই ভক্তিমান ছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। তাহারই ফলে 'সইদা' ( প্রেম-পাগ্লা ) নামে এক মোসলমান ফকির সাতগাঁর প্রধান রাজ-প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হন। একবার সুলতান বিদ্রোহিদমনার্থ অভিযানে বহির্গত হইলে, সইদা সুলতান ফথ্রুদ্দীনের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিয়া নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুলতান এই শোচনীয় ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সইদা ও তদনুচরগণ

দুরধিগম্য সোনার গাঁ অভিমুখে পলায়নপর হন। (১) তাহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সুলতান একদল সৈন্য তথায় প্রেরণ করেন। গ্রামবাসিগণ আপনাদের জীবনাশঙ্কা করত নিজেরাই সইদাকে ধৃত করত সুলতানের সৈন্যদলের হস্তে অর্পণ করে এবং তদ্বিষয় সুলতানকে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করে।

সুলতান তাহাদিগকে সইদার মস্তক প্রেরণ করিতে আদেশ করেন, বলা বাহুল্য সে আদেশ প্রতিপালিত হয়। সইদার অপরাধে বহুতর ফকির এই ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমি ( ইবু বটুটা ) সাতগায়ে উপনীত হইয়া তদ্দেশের সুলতানকে দেখিতে পাই নাই এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমি কোনরূপ প্রয়াসও পাই নাই, কারণ তিনি ভারতবর্ষের সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। সুলতানের সহিত আমার সাক্ষাতের ভাবী ফলের বিষয়ে আশঙ্কা হওয়ায় আমি তাড়াতাড়ি সাতগাঁ ত্যাগ করিয়া কামরু ( কামরূপ ) অভিমুখে অগ্রসর হই। সাতগাঁ হইতে কামরূপ একমাসের পথ। এই পর্ব্বত শ্রেণী অতি বিস্তৃত এবং চীন ও মৃগনাভি-সমন্বিত তিব্বত দেশের প্রান্তে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই পর্ব্বত-সমূহে যে সকল লোক বাস করে তাহারা তুর্কী ( Turks ) দিগের সদৃশ। তাহারা অতিশয় কর্ম্মঠ এবং অন্য কোন জাতির মধ্যে ইহাদের তুল্য উপযোগী ও কর্ম্মকুশল ক্রীতদাস পাওয়া যায় না। অধিকন্তু ইহারা যাদু

(১) সোণারগাঁ—বা সুবর্ণগ্রাম (The Golden Village) মোসলমান শাসন সময়ে পুর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহা অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বিবেচিত। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ ফিচ্ ( Ralph Fitch ) তৎস্থান অবলোকন করিয়া লিখিয়াছেন,—"সোণারগাঁ, শ্রীপুর হইতে ছয় লিগ্ দূরবর্ত্তী একটি সহর,—তথায় ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় তথাকার ঘর বাড়ীও ছোট ছোট ও খড় দ্বারা আচ্ছাদিত। অধিকাংশ ব্যক্তিই অর্থশালী। অধিবাসিগণ মাংসাহার এবং কোন পশু হত্যা করে না; চাউল, দুগ্ধ এবং ফল মূল দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড পরিধান করিয়াই তাহারা গৃহের বাহিরে পরিভ্রমণ করে,—শরীরের অপর সকল অংশই উলঙ্গ থাকে।"

বিদ্যার জন্য সুপ্রসিদ্ধ এবং উহাতেই সাফল্য লাভের নিমিত্ত একান্ত যত্ন করিয়া থাকে। সেখ জালাল উদ্দীন তিব্রিজি প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদিগের দর্শন করাই আমার এই পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করার উদ্দেশ্য।

সেখ জালালউদ্দীন একজন ক্ষমতাশালী সাধু ছিলেন, তিনি নানা অদ্ভুত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। (আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এই সাধুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইব।) × × × তাহার সহিত সাক্ষাতের পর বৎসর আমি চীন রাজ্যে গমন করিয়া তথাকার সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করি। × × × পরে জালাল উদ্দীনের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত হাবাঙ্ক (Habank) নগরে গমন করি। এই নগর কামরূপ প্রদেশের মধ্যে একটা বৃহত্তম ও সৌন্দর্য্যশালী স্থান। কামরূপ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা 'সবুজ নদী' (ব্রহ্মপুত্র) কর্ত্তৃক ইহা তৎপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন; এই নদী বাহিয়াই এ অঞ্চলের সকলে বঙ্গদেশে এবং লক্ষ্ণৌতীতে গমনাগমন করে। মিসরের নীল নদের অনুরূপ এই নদীর উভয় তীরেই 'হাইড্রলিক হুইল' (hydraulic wheels), মনোরম উদ্যান, পল্লী নগর প্রভৃতি দৃষ্টি-গোচর হয়। এই সকল গ্রামের অধিবাসী অ-মোসলমান (হিন্দু) এবং তাহারা রাজকর প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক আদায় করিয়া লওয়া হয়। নানা গ্রাম, উদ্যান প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে আমরা এক পক্ষ কাল এই নদীর উভয় তীরে অতিবাহিত করি। এই নদী-বক্ষে অগণ্য অর্ণবপোতও দৃষ্টিগোচর হয়, উহার প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া দামামা (রণবাদ্য বিশেষ) আছে। দুইখানি জাহাজে যে সময় প্রথম একস্থানে উপস্থিত হয়, সেই সময় উভয় জাহাজের নাবিকবৃন্দই উহা নিনাদিত করিয়া পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে। সুলতান ফখ্রুদ্দীন আদেশ করেন যে, এই নদীর ধারের কোন ফকিরের নিকট হইতেই কর গৃহীত হইবে না এবং নিঃস্ব বলিয়া ফকিরদিগকে প্রত্যেক গ্রাম হইতে অর্দ্ধ দিনার করিয়া দান করিবার নিয়ম ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই নদী-বক্ষে পনর দিন অতিবাহিত করিয়া তৎপর আমরা সোনারগাঁয়ে উপনীত হই।

তথায় আমি একখানি 'জঙ্ক' (বৃহৎ চৈনিকপোত) দেখিতে পাই। তাহা যাভা দেশাভিমুখে যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল। সোণার গাঁ হইতে যাভায় যাইতে হইলে সমুদ্রে চল্লিশ দিন কাটাইতে হয়। আমি এই জাহাজে আরোহণ করতঃ পনর দিবস পর বড় নগরে ( Barahnagar ) উপনীত হই।

শ্রীব্রজকুমার সান্ন্যাল।
( M. R. A. S. )

# হাফেজ।

কবি বলিয়াছেন যে কবি, প্রেমিক ও পাগল তিনই তুল্য। কথাটি ঠিক। কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য লইয়া উন্মত্ত, প্রেমিক প্রেমরাজ্যের তত্ত্ব লইয়া উন্মত্ত, এবং পাগল সংসারের খুটিনাটি লইয়া, নিজের উন্মাদ লইয়া উন্মত্ত। উন্মত্ত সকলেই। আবার কবির মুখে যে উন্নত দার্শনিক মীমাংসা শুনি, অন্যত্র তাহা পাই না; প্রেমিকের চিন্তাপ্রণালীর স্তরে স্তরে যে সৌন্দর্য্যানুভূতি, যে কাব্য প্রতিভা ফুটিয়া উঠে, অন্যত্র তাহা সুলভ নহে; এবং পাগলের মুখে যেরূপ দার্শনিক কথা, চাতুরসময় কবিগাথা অনর্গল উচ্ছৃঙ্খল ভাবে শুনা যায়, তাহাও অন্যত্র প্রত্যাশা করিবার উপায় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজে এই ত্রিবিধ ব্যক্তিগণের ভাব, কল্পনায় এবং কার্য্যকলাপে এরূপ সম্মিলন হইয়া গিয়াছে যে, একজনের ব্যক্তিগত গুণাবলী হইতে অন্যের গুণাবলী কোন প্রকারে পৃথক করা যায় না। কবি হইলেই অল্প বিস্তর প্রেমিক ও দার্শনিক হয়, কবি হইলেই তাহার উন্মত্ততা আছে। প্রকৃত কবিকে চিনিয়া লইবার এই দুইটি প্রধান নিদর্শন। কবির কবিত্বমধ্যে যে পরিমাণে প্রীতি ও প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখিব, যে পরিমাণে তাহাকে আপন ভাবে আপনি আত্মহারা দেখিব, তাহাকে সেই পরিমাণে উচ্চস্থান প্রদান করিতে প্রস্তুত হইব। একটি কবির জীবন ও চরিত্রে আমরা এই কয়েকটি কথা মিলাইয়া দেখিতে প্রয়াস পাইব।

কবির কবিত্ব আছে বলিলে বুঝি কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে; অর্থাৎ তুমি আমি প্রকৃতির রাজ্যে যাহা যে ভাবে দেখি, কবি তাহা সে ভাবে দেখেন না। কবির চক্ষে নূতন সৌন্দর্য্য ফুটে, কবির মুখে নূতন ভাষা ফুটে, কবির প্রাণে নূতন ভাবে ভাবলহরী উঠে। কবি নিজের ভাবে সংসারক্ষেত্রের অনেক কঠিন সমস্যার নূতন মীমাংসা করিয়া লন; বাহ্যিক বিলাস-বিভ্রাট ও ঐশ্বর্য্য

সম্ভারের মধ্যে যাহা সার ও সত্য, কবি তাহারই অনুসরণ করিতে ব্যাপৃত হন। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া ভাব ও ভাষার অবতারণা করা উন্মাদের পরিচায়ক। সে উন্মাদে কবিমাত্রেই উন্মত্ত। কবি এক দেশে বসিয়া বহুদেশের কাহিনীর সমাবেশ করেন, বর্ত্তমানের রাজ্যে বসিয়া সুদূর ভূতভবিষ্যতের বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখান। পাত্রভেদে বিচার ভেদ একেবারেই কবির স্বভাবসিদ্ধ নহে। পাখীর কাকলীর মত, শিখাবলের নর্ত্তনের মত, উর্ণনাভের সূত্রনির্গমনের মত, গিরিনির্ঝরের কুলু কুলু ধ্বনির মত, কবির উচ্ছ্বাস আপনার পথে আপনি ছুটে, এবং ভাষার ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া দেশদেশান্তরে বহুজনকে আকুল করিয়া তুলে। পারসীক কবি হাফেজের জীবনে একথার সত্যতা বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইবে।

আনন্দের উদ্ভবই যদি কবিতার ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে পারসীক কবিতা সে বিষয়ে যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন। আর পারসীক কবিতার মধ্যে হাফেজের কবিতার মত প্রাণমন-ভুলানো মধুর গাথা আর কোথায়ও নাই। অযত্নগ্রথিত রত্নরাজির মত হাফেজের উচ্ছ্বাসমালা প্রাচ্যভূমির গৌরব বর্দ্ধন করে। * ভারতবর্ষ হইতে ইয়ুরোপ পর্য্যন্ত, প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী হইতে সভ্যতালোকদীপ্ত দানিয়ুব পর্য্যন্ত বহুদেশে হাফেজের কবিতা বিদ্বৎসমাজে সমাদর প্রাপ্ত হয়, আরবে ও তাতারে, দাক্ষিণাত্যে ও তুর্কিস্থানে সর্ব্বত্র হাফেজের কবি-প্রতিভার পূর্ণ প্রসার। পারস্য সাহিত্যে হাফেজের আসন অতি উচ্চ। ফার্দ্দুসীর গুরু গম্ভীর ভাষা ও সাদীর কঠোর নীতিগাথা তাঁহাদিগকে কবিসমাজে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে বটে, কিন্তু মঞ্জুভাষী প্রেমিক কবি হাফেজের আসন তদপেক্ষাও উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। কারণ কবিত্ববিষয়ে, বিষয়ের অবতারণায়, ও ভাষার চমকে ফার্দ্দুসী ও সাদী মহাকবি হইতে পারেন বটে, কিন্তু সরল

* সার উইলিয়ম জোন্স হাফেজেরই একটি উচ্ছ্বাসের অনুবাদ করিয়া বলেন :—"Whose accents flow, with artless ease like orient pearls at random strung." Works Vol. X. p. 254

প্রাণেও ঈশ্বরপরায়ণতায় হাফেজকে এজগৎ ছাড়া কোন অজানা অচেনা দেশের লোক বলিয়া প্রতীতি হয়।

খাজা সামসুদ্দীন মহম্মদ হাফেজ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্যের অন্তর্গত শিরাজ নগরে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি রীতিমত সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন। কাব্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল। কবির কবিত্ব শিশুকাল হইতে বিকাশ পায়। অতি শৈশবে হাফেজ কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। একদিন তাঁহার পিতৃব্য মুক্তিধর্ম্মমতানুসারে একটি কবিতা রচনা করিতেছিলেন; কবিতার একটি চরণ মাত্র রচনা হইয়াছিল। এমন সময়ে তাঁহার পিতৃব্য কার্য্যগতিকে গৃহান্তরে যাওয়া মাত্র হাফেজ অতি সুন্দর ভাবে উক্ত কবিতার পাদপূরণ করিয়া দেন। তখন তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ কবিতাটি লিখিতে আদেশ করেন এবং তিনিই তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন;—"তোমার কবিতা যে পড়িবে, সেই পাঠকই উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইবে।" এই প্রবাদ বাক্য তদবধি চলিয়া আসিতেছে। তুর্কদেশীয় সিয়াগণ এখনও ইহা বিশ্বাস করেন। স্যাফো, পেট্রার্ক, ও শেলীর মত হাফেজের পদাবলীতে একপ্রকার উন্মাদিনী শক্তি আছে। তাঁহার পিতৃব্যের অভিশাপরূপ প্রবাদের মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, জানি না। তবে প্রেমিক কবির প্রাণের কথা ভাষায় ব্যক্ত হইলে, সে প্রেমের গানে যে মন্ত্রশক্তি থাকে, তাহা বিশ্বাস করি এবং সেই শক্তিবলে যে পরের মনপ্রাণ হরণ করিতে পারে, তাহা নিশ্চিত সত্য। হাফেজের প্রাণোচ্ছ্বাস বহুদেশে বহুজনকে পাগল করিয়াছে। *

* হাফেজের অভিশাপের সত্যতাসম্বন্ধে দুই এক স্থানে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বঙ্গীয় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার পারসীক ভাষায় সুপণ্ডিত ও হাফেজের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি শিশুকাল হইতেই হাফেজের কবিতা অধ্যয়ন করিতেন এবং অনেক কবিতা অনর্গল কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ "সদ্ভাবশতকের" অধিকাংশ কবিতা হাফেজ হইতে অবিকল অনুবাদিত বা তাহার ভাব লইয়া বিরচিত। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী হইতে জানা যায়, যে,

হাফেজ অতি অল্প বয়সেই মহামুদ আত্তর নামক এক ব্যক্তির নিকট শিক্ষা-লাভ করিয়া সুফি মতে দীক্ষিত হন। মুসলমান সম্প্রদায়ের সুফিমতের সহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের বৈদান্তিক বা সোহংবাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। বিশেষ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে এশিয়ার, যাবতীয় ধর্ম্মতরুরই প্রধান মূল এক। উহাই বিভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিরাজ করিতেছে। মুসলমান সুফি ও হিন্দু দণ্ডী একই জাতীয়। সুফি সম্প্রদায় ধর্ম্মসাধনার বাহ্যা-ড়ম্বরের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বরই জীবের চরম লক্ষ্য; তাঁহারই ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্ট; সেই সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যস্বরূপ মানব তাঁহারই অংশমাত্র। মানব যখন সংসারের পাপমলীমস হইতে সম্পূর্ণ বিধৌত হয়, তখন সে উৎপত্তিস্থল ঈশ্বরেই বিলীন হয়। অথবা যেমন ঈশ্বরে আছি, ঈশ্বর তেমনি আমাদিগের মধ্যে আছেন। সর্ব্বদা আমরা তাঁহারই জন্য ব্যাকুল থাকিব। সংসারের মায়ায় আমাদিগের মন ভগবান হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে বটে, তবে আমরা স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের আভাস অনুভব করি। মধুর সঙ্গীত, মন্দ মারুত, সুগন্ধি প্রসূন প্রভৃতি জগতের প্রকৃতি আমাদিগের সেই আভাস জাগাইয়া তুলে, আমাদের প্রাণে প্রীতির তরঙ্গ বহাইয়া দেয়। এই জন্যই কবি প্রকৃতির নাট্যমঞ্চে সংসারের রসরঙ্গে পাগল হয়। এই সকল মত হইতে শত শত রূপক ও কল্পনার সৃষ্টি করে; হিন্দু ও পারশীদের ধর্ম্ম গ্রন্থে ও কাব্য-কহিনীতে সেই রূপক ও সেই কল্পনার অপূর্ব্ব সমাবেশ রহিয়াছে। পারসীক কবিগণ অধিকাংশই সুফি মতাবলম্বী। সুফি সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া দরবেশ বা ফকিরের বেশে বিচরণ করেন। এই জন্যই

তিনি কাব্যকল্পনার রাজ্যে এরূপভাবে বিচরণ করিতেন, যে অনেক সময়ে মানসিক অপ্রকৃতিস্থ থাকিতেন। মধ্যম বয়সে তিনি বাস্তবিকই উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন এবং বহু চিকিৎসাতেও জীবনে সে রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। শেষ জীবনে সংসারের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না; কবি আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া ভগবৎপ্রেমরসে আত্মহারাভাবে জীবন যাপন করিতেন।

তাহাদের নাম সুফি, কারণ আরবীতে সুফ বলিতে এক প্রকার পশমী বস্ত্র বুঝায়; দরবেশগণ সাধারণতঃ এই পরিচ্ছদ পরিধান করেন।

হাফেজ সুফি ছিলেন। তিনি কোরাণের বাহ্যিক ক্রিয়া পদ্ধতি মানিতেন না। কবিত্বের সম্বাদ এতই মধুর এবং তাহাতে কবিকে এতই মোহিত করিয়া রাখে যে, কবিগণ সাধারণতঃ জাগতিক সম্মান বা ঐশ্বর্য্য বিভ্রাটের প্রত্যাশী হন না। হাফেজের কথা তাহাই। দৌলত সাহ্ বলিয়াছেন,—"হাফেজ বিদ্যা ও বুদ্ধিতে নরকুলচূড়ামণি ছিলেন, তাঁহার সময়ে তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ভাষা এতই মধুর যে, তাহা মানবের সমালোচনার আয়ত্তাধীন্ হইত না।" তিনি সাদরে দারিদ্রকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। মহম্মদ স্বয়ং বলিয়াছিলেন "দারিদ্রই আমার গৌরব।" হাফেজও স্বকীয় দরিদ্র জীবন লইয়া এতই গৌরবান্বিত থাকিতেন যে, সর্ব্বদাই বিলাসবিভ্রাটের আবাসস্থল হইতে দূরে থাকিতেন।

জন্মভূমি শিরাজ হাফেজের নিকট অতীব প্রিয় ছিল। তাঁহার কবিতায় সর্ব্বত্র ইহার পরিচয় আছে। শিরাজ ও ইস্পাহান প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তৃগণ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সাহমুজা ও সাহমনসুর ইঁহাদের মধ্যে প্রধান। হাফেজের প্রধান বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হাজি কিয়ামুদ্দীন নামক এক ব্যক্তির যত্নে কোরাণ সরিফের মর্ম্মার্থ শিক্ষা দিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হাফেজ উহাতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সামসুদ্দীন মহম্মদ সম্ভবতঃ এইজন্যই "হাফেজ" উপাধি গ্রহণ করেন; কারণ কোরাণ যাহারা কণ্ঠস্থ করিতে পারেন, তাহাদিগকে হাফেজ বলিত।

"দিবান" বা দেওয়ানই হাফেজের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। ইহা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি কবিতা বা উচ্ছ্বাস-মালার সমষ্টি। এই ক্ষুদ্র কবিতার নাম "গজল", প্রত্যেক গজলে ৫ হইতে ১৬টি বায়েত বা শ্লোক অর্থাৎ ১০ হইতে ৩২ পংক্তি পর্য্যন্ত থাকে, এবং প্রত্যেক শ্লোকের দ্বিতীয়পাদে একই প্রকার মিল্ থাকে। প্রায় সকল কবিতাগুলিরই শেষ দুই চরণের মধ্যে কোন স্থানে কবির "হাফেজ" নামের ভণিতা থাকে। এই গজলসমূহ কবির জীবদ্দশায়ই

বহু দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, এবং সেগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরে "দিবান" নামে প্রচারিত হয়। দিবানের মধ্যে কবিতাগুলি বর্ণানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত; সুতরাং কোন্ সময়ে কোন্‌টি লেখা হইয়াছিল, তাহার সময় নির্দ্দেশ করিবার সুবিধা নাই। এই রত্নমালা প্রায়ই সামান্য চিন্তাসূত্রে অব্যবস্থিত ভাবে সম্বদ্ধ। কিন্তু তবুও মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, সর্ব্বত্রই সুফিধর্ম্মের মর্ম্মসূত্র অন্তর্নিহিত ভাবে এই কবিতাগুলির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আপতদৃষ্টিতে সমালোচকের চক্ষে এই কবিতা-সমূহের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের যাহাই পরিচয় থাকুক না কেন, চিন্তাশীল গুণগ্রাহী পাঠাক চিরদিনই এই কাব্যকুসুমে নন্দন সুরভি অনুভব করিবেন।

হাফেজের গজলের প্রধান বিশেষত্ব তাঁহার স্বভাবানুবর্ত্তিতা। পাখী গাহে, কারণ সে না গাহিয়া পারে না; কবি গায়, কারণ গান করাই কবির ধর্ম্ম। পাখী কখন কি গাহে, বোধ হয় সে নিজেও জানে না; প্রকৃত কবিও নিজের ভাষার অর্থ, ভাবের মর্ম্ম সম্পূর্ণ নিজে অবগত নহে। হাফেজের যাহা স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস হইত, তাহাই মধুর ভাষায় কবিতাকারে প্রচারিত হইত। বিবেচনা করিয়া, দিন কাল বুঝিয়া, প্রতিবেশীর স্পৃহানুযায়ী কবিতা লেখা তাঁহার ধর্ম্ম ছিল না। হাফেজের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে, তিনি যে যুগে প্রাদুর্ভূত হন, সে যুগে গৈরিক নিস্রাবের মত অন্তরের স্বাভিব্যক্তি চলিত না। তখন প্রত্যেক লেখকের প্রত্যেক চিন্তা সাম্প্রদায়িকতার আবরণ লইয়া লোকসমাজে দেখা দিত এবং কবিসুলভ উদ্দামভাব বা সৌন্দর্য্যলিপ্সার পূর্ণ-বিকাশ সাধারণের নিকট অজ্ঞাত ও তীব্রভাবে সমালোচিত হইত। হাফেজের দিবানের পত্রে পত্রে যে ঈশ্বরোন্মুখী আত্মার উদ্ভ্রান্ত প্রেম উদ্গীত হইত, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার গীতি কবিতা গুলি এতই সুন্দর যে সেই জন্য তৎসাময়িক ব্যক্তিগণ তাহাকে "শর্করাভাটী" আখ্যা দিয়াছিলেন।

হাফেজের কবিতার বিষয়সমূহ প্রায়ই পুষ্প, মদ্য, প্রেম, চুম্বন ও সুন্দরী রমণী প্রভৃতি। এই জন্য সমস্ত সভ্যজগতে তাঁহার কবিতার বাস্তবিক প্রকৃতি নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ চলিয়াছে। কেহ বলেন, কবির চরিত্র যেরূপ

উচ্ছৃঙ্খল, কবিতাগুলিও সেইরূপ প্রেমের সঙ্গীত, তাহাতে সংসারিকতা ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার ভাব সর্ব্বত্র অনুলিপ্ত রহিয়াছে। কবি নিজে মদ্যপায়ী ছিলেন বলিয়া প্রচার আছে, তাঁহার ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহার স্বভাব সমর্থন করিত না; কবিও ঐ সকল ব্যক্তির ধর্ম্মহীনতা ও ভণ্ডামি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবিতার ছত্রে ছত্রে তীব্র বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই গেল এক দল পাঠকের কথা। অন্য পাঠকগণ কবিতার মধ্যে সুরা ও সুন্দরী দেখেন না; তাঁহারা দেখেন ঐ কবিতার অন্তরালে যে মধুর ভাব, প্রেমের ভাব, অন্তরঙ্গের ভাব, চিন্তাতরঙ্গের সরল অভিব্যক্তি। তাঁহারা হাফেজের কবিতার শব্দগুলিরও আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করেন; সাধারণ অর্থ উড়াইয়া দেন। সুরার অর্থ ভক্তি-সুধা; নিদ্রার অর্থ সমাধি; সুরভির অর্থ ভগবান্ প্রেমের আশা; চুম্বন ও আলিঙ্গন স্বর্গীয় প্রেমের তরঙ্গ এইরূপ ভাবে হাফেজের শব্দসমূহের জন্য ভিন্ন অভিধানের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য কবির কবিতা হইতে এইরূপ অর্থ করিবার সুস্পষ্ট আভাস বিদ্যমান আছে। অবশ্য এরূপ অর্থ না থাকিলে এই কবিতাগুলির ভাগ্য বহু বিদেশে পরীক্ষিত হইয়াও মূল্য রক্ষা করিতে পারিত না। কনষ্টাণ্টিনোপল প্রভৃতি স্থানের লোকেরা হাফেজের কবিতাগুলিকে ঈশ্বরপ্রণোদিত উচ্ছ্বাস বলিয়া মনে করেন। হাফেজের নাম পারস্যে যেরূপ ঘরে ঘরে পরিচিত, তাঁহার ভাবময়ী কবিতাগুলি বিদেশে বহু সমাজে সেইরূপ বরণীয় ও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

---

* ইংরাজীতে Sir William Jones কয়েকটি কবিতার সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত Nott. Hindlay, Roussean, Richardson, Sir W, Ouseley, Lieut. Col. Wilberforce, Clark প্রভৃতি অনেক লেখককৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

# আহেরিয়া।*

শুক্লপক্ষ, অষ্টমীর চাঁদ আকাশের মাঝখানে সহসা হাসিয়া উঠিল ; তাহার হাসিরাশিতে জগৎ ভরিয়া গেল। দুই একটি তারকাও নীলাকাশে জ্বল জ্বল করিতেছিল। পুষ্করের স্বচ্ছ সলিল জ্যোৎস্নাচুম্বনে, যেন ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তারকারাজিও প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে আরও রমণীয় করিয়া তুলিতেছিল। তীরস্থিত সৌধসমূহের শুভ্রচ্ছবি সলিলবক্ষে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। সোপানাবলি জ্যোৎস্নাবিধৌত হইয়া শ্বেত-মর্ম্মরখচিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। তখন মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা নীরব হইয়াছে। কিন্তু ভেক ও ঝিল্লীর অব্যক্ত কাতরধ্বনি হ্রদবক্ষে কেমন এক মৃদু গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার করিতেছিল। জনকোলাহল শান্ত ও ধূপধুনার গন্ধ নিবৃত্ত হইলেও বসন্তের মন্দমারুত কোন এক সুদূর অজ্ঞাত স্থান হইতে পাপিয়ার ক্ষীণতান ও মল্লিকার মৃদুবাস বহন করিয়া আনিতেছিল। বাসন্তী শুক্লাষ্টমীতে স্বচ্ছ-সলিল পুষ্করের এই মনোহারিণী শোভা সকলের হৃদয়কেই মাতাইয়া তুলিতে-ছিল। যে একবার সেই শোভা দেখিয়াছে, সে কিছুক্ষণের জন্য আপনার চক্ষু ও চিত্ত ফিরাইতে পারে নাই।

এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিবার জন্য পুষ্করহ্রদের একটি বাঁধাঘাটে দুইটি রাজ-পুতবালিকা বসিয়াছিল। বালিকা দুইটি সমবয়স্কা। তাহাদের বয়স দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ হইবে। যৌবনোদ্গমে তাহাদের অঙ্গেও অষ্টমীর জ্যোৎস্নার ন্যায় সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ সলিলশোভা দেখিয়া তাহারা কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হইল। একটি অপরটিকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—

* এই গল্পের মূলভাগ Tod's History of Rajasthan মিবার ও বুন্দী দেশ।

"মীরা, কুমার রত্নসিংহকে কি ভাল ক'রে দেখেছিস্ ?"

"দেখেছি বৈকি ভাই, কেন কৃষ্ণা, তুমি কি দেখ নাই ?"

"দেখেছি বলেই ত তোকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি।"

"আমি বলি তুমি বুঝি সাহস ক'রে দেখতে পারনি।"

"কেন পারব না, আমার ভয় কিসের ?"

"ভয় আর কিছুরই না, ভয় কেবল সেই মদনঠাকুরের,পাছে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

"মরণ আর কি, রাজপুতের মেয়ের কি সহজে ধাঁধা লাগে ?"

"মদনঠাকুরের কাছে কারুরই জারিজুরি খাটে না, তা রাজপুতের মেয়েই হোক, আর মোগলের মেয়েই হোক।"

"আচ্ছা, ভাই, বল্ দেখি, কুমার দেখতে কেমন ?"

"বেশ সুন্দর, কার্ত্তিকের মত চেহারা ; তোমারই বর হবার যুগ্যি।"

"আ মর, সে কথা তোকে কে বলতে বল্‌ছে ?"

"বলবে আর কে ? তোমার মনপ্রাণ।"

"আমার মনপ্রাণের কথা তুই কি ক'রে জানলি ?"

"এতদিন তোমার সঙ্গে থেকে। আর লুকিয়ে কি হবে ? তোমার ভাব বেশ বোঝা গেছে। সত্যি ভাই, আর লুকিও না ; এখন কি করে তোমাদের মিলন হবে, এস, তারই উপায় দেখা যাক্।"

"কি উপায়ে হবে, তাই বুঝতে পাচ্ছিনে।"

"এখন পথে এস, আমার কথায় যদি রাজি হও, তাহলে উপায় সহজেই ঠিক হবে।"

"তোমার কোন্ কথায় ভাই আমি অরাজি ?"

"বা, একেবারে যে মোমের পুতুল, এতক্ষণ তবে পাথরের ছবির মত ঠন্ ঠন্ কচ্ছিলে কেন ?"

"নে ভাই, এখন রহস্য রাখ।"

"আর বুঝি তর সচ্ছে না ? তবে শোন। যদি তুমি সাবিত্রী-মন্দিরে যেতে

রাজি হও, তাহ'লে আমি রত্নসিংহকে সেখানে এনে তোমাদের মিলন করে দিতে পারি, যেখানে প্রথম দেখা সেখানেই প্রাণে বাঁধা।"

"সাবিত্রীর মন্দিরে যাওয়া আর কঠিন কি? দেবদর্শনে কাহারও আপত্তি হবে না, তবে তিনি কেমন ক'রে সেখানে আসবেন?"

"ও বাবা, এর মধ্যেই তিনি হয়ে গেলেন?"

"তোর ভাই, সকল কথায় পরিহাস?"

"পরিহাস না হলে ভাব জমাট বাঁধে না। এই যে বল্লেম, আমি গিয়ে আনবো।"

"তুমি কি করে আনবে? তবে কি কুমারের সহিত তোমার দেখা হয়েছিল?'

মীরা এইবার হাসিয়া ফেলিল। সে বলিতে লাগিল,—"যেদিন হতে তোমাদের দুজনের চারি চক্ষের মিলন হয়, সেদিন হতে আমি বেশ লক্ষ্য ক'রে আসছি; তোমাকে ত সকল সময়ে দেখছি, রত্নসিংহকেও অনেক সময়ে দূর হতে দেখেছি, শেষে তিনি নিজেই আমাকে ধরা দিয়েছেন।"

"তবে ভাই তাঁ'র সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল?"

"হাঁ গো হাঁ, তাইত বলছি তিনি আমাকে দিয়ে তোমার পাণিচুম্বনের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন।"

"এসব কথাত তুই ভাই আমাকে একদিনও বলিস্‌নি।"

"তোমার মুখদিয়ে কথাটা বা'র ক'রে নিয়ে বলবো মনে করেছিলেম। আজ যখন তুমি বলে ফেল্লে, তখন আমিও সমস্ত কথা বল্লেম।"

"তোর পেটে ভাই এত বুদ্ধি।"

"তা তোমাকে জিঁত্তে পারিনি, এখন আমার কথায় রাজি আছ ত?"

"তুমি যা বল আমি তাতেই রাজি।"

"তবে আমার সঙ্গে সাবিত্রীমন্দিরে চল"। এই বলিয়া মীরা কৃষ্ণার হাত ধরিয়া তুলিল, উভয়ে দাঁড়াইয়া ফিরিয়া দেখিল একটি যুবক তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই যুবকই রত্নসিংহ। রত্নসিংহকে দেখিয়া প্রথমে উভয়ে একটু চমকিত হইল। পরে মীরা কহিল,—

"কৃষ্ণা এই দেখ্ আসামী হাজির, বলিস্ ত এই খানেই শাঁখ বাজাইয়া দিই।"

কৃষ্ণা লজ্জায় অধোবদন হইল। মীরা রত্নসিংহকে বলিল, "কুমার কতক্ষণ?"

রত্ন—"আমি কিছু পূর্ব্বে আসিয়া তোমাদের মধুর আলাপ শুনছিলেম।"

"আপনি ত বড় অসামাজিক, পুরুষ হয়ে মেয়েমানুষের কথা কাণ পাতিয়া শুনছিলেন কেন?"

"অপরাধ হয়ে থাকে ত দণ্ড দেও।"

মীরা হাসিয়া বলিল,—"আপনি শীঘ্রই উহার উপযুক্ত দণ্ড পাইবেন। চল্ ত কৃষ্ণা আমরা দণ্ডের বাবস্থা করিগে। আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন।"

রত্ন—"কোথায় যাইতে হইবে?"

"অপরাধীর তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই", এই বলিয়া মীরা কৃষ্ণাকে লইয়া চলিল। রত্নসিংহও স্তম্ভিতের ন্যায় তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। আমরা এইখানে ইঁহাদের একটু পরিচয় দিয়া রাখি। পবিত্র তীর্থস্থল পুষ্কর হ্রদের তীরে রাজপুতানার প্রায় সমস্ত নরপতিবৃন্দের প্রাসাদ অবস্থিত। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পুষ্করে সমাগত হইয়া ব্রহ্মা, সাবিত্রী ও অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিয়া থাকেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে অম্বররাজ, পৃথ্বীরাজের মহিষী কন্যা কৃষ্ণাবাইকে লইয়া পুষ্করে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মীরা কৃষ্ণার শৈশব সহচরী; সুতরাং সেও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। এই সময়ে মিবারেশ্বর রাণা সঙ্গের পুত্র রত্নসিংহ মৃগয়া করিতে করিতে পুষ্করে আসিয়া উপস্থিত হন। একদিন সাবিত্রী দেবীর মন্দিরে রত্নসিংহ ও কৃষ্ণার চারি চক্ষের মিলন হয়। তদবধি উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। মীরা তাহাই লক্ষ্য করিয়া উভয়ের মিলন সংঘটিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। পাঠক তাহার কথা হইতেই উহার কিছু আভাস পাইয়াছেন।

মীরা কৃষ্ণা ও রত্নসিংহকে লইয়া সাবিত্রী-মন্দিরে উপস্থিত হইল। পূজারি ঠাকুর ভোগরাগ দিয়া তখন মন্দির বন্ধের উপক্রম করিতেছিলেন, মীরা

গিয়া তাঁহাকে মন্দির বন্ধ করিতে নিষেধ করিল। পরে তাঁহার কাণে কাণে কি কথা কহিল। পূজারি ঠাকুর রত্নসিংহ ও কৃষ্ণাকে সাবিত্রী দেবীর সম্মুখে লইয়া বসাইলেন। তাহার পর নূতন দুইগাছি ফুলের মালা আনিয়া উভয়ের গলে দিলেন। মীরা মালা দুইগাছি বদল করিয়া কৃষ্ণার হাত লইয়া রত্নসিংহের হাতে স্থাপন করিল। পূজারি ঠাকুর তাহাদিগকে দুইচারিটী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলিলেন। মন্ত্র উচ্চারিত হইলে মীরা মন্দিরের শঙ্খটি লইয়া ফুঁ দিল। সেই নীরব রাত্রিতে নীরব মন্দিরের শঙ্খধ্বনি পুষ্করের নীরব হৃদয়ে যেন একটু তরঙ্গ তুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে রত্ন ও কৃষ্ণার হৃদয়ে তরঙ্গ বহিয়া গেল।

২

পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে। পুষ্করের শুক্লাষ্টমীর ঘটনা ক্ষীণরেখার ন্যায় সকলের মনে জাগিতেছে। কৃষ্ণার হৃদয়েও যে তাহা উজ্জ্বলভাবে আছে, এরূপ বোধ হয় না। বালিকাসুলভ চাপল্যে মীরার কথায় সে রত্নসিংহের হাতে হাত দিয়াছিল; কিন্তু তাহাই যে তাহার প্রকৃত বিবাহবন্ধন, ইহা সে মনে করিতে পারে নাই। অম্বরে ফিরিয়া আসিয়া মীরার সহিত তাহার দুই চারি দিন সে বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ক্রমে অন্যান্য ছেলেখেলার ন্যায় তাহারও স্মৃতি ধীরে ধীরে মুছিয়া যায়। মীরা সে কথা লইয়া মাঝে মাঝে কৃষ্ণার সহিত রহস্য করিত বটে, কিন্তু কৃষ্ণার হৃদয় তাহাতে আর আন্দোলিত হইত না। যদি আবার কখনও রত্নসিংহের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত, অথবা উভয়ে উভয়ের সংবাদ লইত, তাহা হইলে তাহার চিত্ত হইতে সে দাগ কখনও মুছিয়া যাইত না। পুষ্করে সাক্ষাতের পর আর তাহাদের দেখাশুনা ঘটে নাই। কাজেই বালিকার চিত্তে সে ভাব স্থায়ী হয় নাই। বালিকা-জীবনে এরূপ ছেলেখেলা অনেক ঘটিয়া থাকে।

কৃষ্ণার বয়স এক্ষণে সপ্তদশ অষ্টাদশ হইবে, সে বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। রাজপুতকন্যাগণের কিছু অধিক বয়সেই বিবাহ হয়, বিশেষতঃ রাজকন্যাগণের উপযুক্ত পাত্র না মিলিলে তাহাদিগকে কিছু অধিককালই অপেক্ষা করিতে হয়। কৃষ্ণার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণা অম্বরের রাজকন্যা; কাজেই তাহার

উপযুক্ত পাত্র না হইলে কিরূপে বিবাহ হইবে? অম্বরাধিপ পৃথ্বীরাজ অনেক দিন হইতে কন্যার পাত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। মহিষী তজ্জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গঞ্জনাও দিতেন। কিন্তু পাত্র কোথায়? রাণা সঙ্গের অনেকগুলি পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে যাঁহারা জ্যেষ্ঠ তাঁহারা সেরূপ গুণশালী ছিলেন না। তাঁহার তৃতীয় পুত্র রত্নসিংহ রূপেগুণে অদ্বিতীয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্ত্তমানে তিনি মিবারের সিংহাসন পাইবার অধিকারী নহেন। কাজেই পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে লক্ষ্য করেন নাই। এই সময়ে একটী রাজপুত যুবকের অদ্ভুত বীরত্ব, সাহস ও অন্যান্য গুণগ্রামের কথা রাজস্থানে প্রচারিত হইতেছিল, তাঁহার নাম সূর্য্যমল্ল। সূর্য্যমল্ল বুন্দীরাজ নারায়ণদাসের একমাত্র তনয়। বুন্দীর বীরগণ আপনাদের অসীম বীরত্বের জন্য চিরবিখ্যাত। মিবারের রাণার সাহায্য করিয়া তাঁহারা অনেক সময়ে রাজস্থানে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সূর্য্যমল্ল সেই বংশের উপযুক্ত বংশধর, এবং নারায়ণদাসের মৃত্যুর পর তিনিই বুন্দীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া পৃথ্বীরাজ সূর্য্যমল্লের সহিতই কৃষ্ণার পরিণয়সংঘটনের ইচ্ছা করিলেন। মহিষীর সহিত পরামর্শ করিয়া পরে তাহাই কর্ত্তব্য স্থির হইল। বুন্দীরাজের সহিত কথাবার্ত্তার পর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

বিবাহের পূর্ব্বে মীরা আসিয়া কৃষ্ণাকে বলিল,—"কিলো তোকে বিয়ে কত্তে নাকি নতুন বর আসছে।"

"বরত নতুনই হয়।"

"তাত বটে, কিন্তু তোমার নাকি আগে আর একটি বর জুটেছিল,—তাইতে ওকথা বলছি।"

"আর ভাই সে কথা বলে লজ্জা দেও কেন?"

"ভাল ভাল, অমন সুন্দর বরটিকে একেবারেই ভুলে গেলে।"

মীরার কথা শুনিয়া কৃষ্ণার একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহার মনে একটু যেন পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তাহাকে বিচলিত হইতে দেখিয়া মীরা কহিল,—

"কিলো আবার চঞ্চলা হলি কেন?"

"তুমিই ভাই চঞ্চলা করিয়া তুলিলে।"

"এখন কোন্ বরকে চাও বল দেখি?"

"তোমার মত কি?"

"আমার ত বিয়ে নয় যে আমি মত দিব। তোমার মনের কথাটা কি খুলে বলত।"

"কি বলব ভাই বাসন্তী শুক্লাষ্টমীতে পুষ্করের সেই সমস্ত কথা মনে পড়ছে, সেই বাঁধা ঘাট, সেই তুমি, সেই আমি, সেই কুমার, তার পর সেই সাবিত্রী-মন্দিরের কথা।"

"তবে পুরাণ বরটির দিকে মনটা টানছে দেখছি"।

"মন টানলে কি হবে ভাই!"

"সেকি এখনও ত তোমার বিয়ে হয় নি?"

"বিয়ে না হলেও এখন আর কোন উপায় নেই।"

"তুমি রাজি হওত, আমি মহারাজ ও মহিষীকে সমস্ত কথা খুলে বলি।"

"না ভাই তুমি কখনও তা করোনা। তুমি কি শুন নাই, বুন্দীরাজপুত্রের সহিত বিয়ের কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গেছে। রাজপুতের কথার কি নড় চড় হয়। আর হলেও উভয় বংশে চিরদিনের জন্য অশান্তির আগুন জলতে থাকবে।"

"তোমার মনের আগুন কি নিবে যাবে?"

"যাবেনা সত্যি, কিন্তু আমার মনের আগুন বড়, না রাজপুতানার দুটী বড় বংশের মধ্যে অশান্তির আগুন বড়।"

"তা হলে উপায়?"

"উপায় আর নেই। আমি নিজেই আমার সর্ব্বনাশ করেছি। পোড়া লজ্জায় সাবিত্রীমন্দিরের কথা কাহাকেও জানাই নাই। তোমাকেও বলতে নিষেধ করেছিলেম।"

"তাইতে ত এমন ঘটলো।"

"তার পর কি এক মোহে সবই ভুলে গিছিলেম, তাতেই মা কি মহারাজ আমার কোন ভাবান্তর বুঝতে পারেন নি।"

"সত্যি কথা, তুমি যেন সে ব্যাপারটাকে ছেলেখেলার মত ক'রে তুলেছিলে।

"তুলে ভাই, তবুও কিছুদিন বেঁচে ছিলেম, নতুবা তখন হতেই পুড়ে মত্তেম।"

"তখন হতে পুড়তে কেন?"

"তুমি কি মনে করেছ, রাণার তৃতীয় পুত্রের সঙ্গে অম্বররাজকন্যার বিয়ে হ'ত? মহারাজ সাবিত্রীমন্দিরের কথা জানলেও বিয়ে দিতেন না। কাজেই তখন থেকে যে পুড়তে আরম্ভ করিনি, এই টুকুই লাভ মনে কচ্ছি।"

"তবে একদিনের দেখায় মনপ্রাণ দিয়ে বসেছিলে কেন?"

কৃষ্ণা কপালে হাত দিয়া কহিল,—

"সকলই অদৃষ্টের লেখা, পুড়িবার জন্য বোধ হয় আমার জন্ম, কাজেই আমাকে পুড়িতেই হইবে।"

মীরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—

"তবে কি ভাই কোন উপায় নেই।"

"না ভাই, চল, এখন আমার নতুন বিয়ের উদ্যোগ করবে চল।"

এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে কৃষ্ণার বিশাল চক্ষু দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল। বোধ হইল নেত্রকোণেও যেন দুই এক ফোটা অশ্রুও দেখা দিল।

বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে বুন্দীরাজপুত্র সূর্য্যমল্ল অম্বরে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি কৃষ্ণা ও সূর্য্যমল্লের বিবাহ হইয়া গেল। কৃষ্ণা যাইবার সময় মীরার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "মীরা চিরজীবন পুড়িতে চলিলাম আমার একটি প্রার্থনা, একথা আর কাহাকেও বলিও না।" মীরাও তখন কাঁদিতেছিল। তাহার পর বরবধূ বুন্দী অভিমুখে যাত্রা করিল। হায়! কৃষ্ণা কেন তুমি এমন ভ্রম করিয়াছিলে?"

ক্রমশঃ

# আলাউদ্দীনের পদ্মিনীদর্শন।

বিশাল দর্পণ-অঙ্কে পদ্মিনীর ছায়া
সুবিম্বিত, দেখে নাই নীল পেসোয়াজ
আবৃত করিতে গিয়া কুন্দ-কান্তিকায়া
রূপের তরঙ্গ তন্বী শুধু বর্দ্ধিয়াছে।
স্বর্গ ছাড়ি, ভাবে মনে যবন ভূপতি,
ওরূপ সাগরে তৃপ্তি করেছে বসতি!

২

বিমুক্তিয়া বেণীবন্ধ, ভাবে নাই সতী,
কুঞ্চিত অলককুঞ্জে মুখকান্তি তার—
নগ্ন শুভ্র ফুল সম হবে স্ফূর্ত্তিবতী,
সীমন্ত-সিন্দুর, রক্ত কেশর তাহার।
যবনভূপতি ভাবে, অলক-অঞ্চলে
সৌন্দর্য্য শিশুটি বুঝি ঘুমায় বিরলে!

৩

ইন্দীবর আঁখিযুগে দুটি কৃষ্ণ তারা
স্থির অচঞ্চল,—আহা বুঝে নাই সতী
মধুমত্ত ভৃঙ্গ যেন আছে জ্ঞানহারা
তাহারি নয়ন-পদ্মে, হেন লয় মতি।
ভাবে আলা ওই কাল তারা-ভৃঙ্গ দুটি,
জীবনের কুঞ্জে তার গুঞ্জে যদি ছুটি!

৪

নীল পেসোয়াজাবৃত উরস বিস্তৃত,
রোষে ক্ষোভে অভিমানে উঠিছে কাঁপিয়া—
বুঝে নাই, দলে দলে বেলা-প্রতিহত
নীলোর্ম্মি উঠিছে যেন দুলিয়া দুলিয়া।
আলা ভাবে, ওই নীল-তরঙ্গের দলে
জীবনের তরী যদি চিরদিন চলে!

৫

খুলিয়াছে সীমন্তিনী কাঞ্চী ও কিঙ্কিনী
মঞ্জীর, শিঞ্জিতভয়ে, রেখেছে কঙ্কন
আয়তি রক্ষিতে শুধু, বুঝেনি ভামিনী
সেটি কি গভীরতম প্রেম-নিদর্শন!
আলা ভাবে, ওই প্রেম-অমৃতের নদী
জীবন কান্তারে তার বহে যেত যদি।

৬

মন্ত্রমুগ্ধ অহিসম যবন-ঈশ্বর।
আত্মহারা, পার্শ্বদেশে স্বর্ণ পিঞ্জরে
সারিটি গাহিয়ে গেল, শ্রবণবিবর
ধরি সেই গান খানি চিত্তের দুয়ারে।
আঘাতিল, প্রকৃতিস্থ দেখিলা মুকুরে
পদ্মিনীর ছায়াখানি আর না বিহরে!

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---


কলিকাতা, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।

৩য় বর্ষ  জ্যৈষ্ঠ—১৩১৪।  ২য় সংখ্যা।

সচিত্র

মাসিক পত্র।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি. এল.

সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা ]  [ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

প্রথম ভাগ, ২য় সংখ্যা। তৃতীয় পর্য্যায়। ১৩১৪, জ্যৈষ্ঠ

শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় বি, এল,—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সহকারী সম্পাদক।

## সূচী।



# নিয়মাবলী।

ঐতিহাসিক চিত্রের জন্য প্রবন্ধাদি, বিনিময়ার্থে পত্রিকা প্রভৃতি ও সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে বহরমপুর খাগড়া পোঃ মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় এবং টাকা কড়ি, চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপনের হারও কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও গ্রাহক করা যায় না। গ্রাহকগণ মূল্যাদি পাঠাইবার সময় বা অপর কোন বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিবার সময় নম্বর দিয়া লিখিবেন। মোড়কের উপর যে নম্বর থাকে তাহাই গ্রাহক নম্বর।

নূতন গ্রাহক হইলে "নূতন" কথাটি এবং নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

প্রতি মাসের পত্রিকা তৎপর মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা না পাইলে ১৫ই তারিখের মধ্যে না জানাইলে আমরা পুনরায় দিতে বাধ্য নহি। নমুনার জন্য ৶০ তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট—কলিকাতা
মেট্‌কাফ্ প্রেস।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

# ঐতিহাসিক চিত্র।

## হিন্দুমুসল্মান।

( ঐতিহাসিক আলোচনা। )

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাঙ্গলার দুই সন্তানের মধ্যে বিবাদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। কে এই আগুন জ্বালাইল, এবং কেনই বা তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, আমরা এস্থলে তাহার আলোচনা করিব না। কিন্তু হিন্দু মুসল্মানের কিরূপ সম্বন্ধ পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমরা বলিয়াছি যে, হিন্দু মুসল্মান সোনার বাঙ্গলার দুই সন্তান। প্রকৃত পক্ষে তাহারা দুই ভাই বটে। দুঃখের বিষয়, এই দুই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। যে দিন হইতে বঙ্গভূমি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ দুই কল্পিত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়ার সূচনা হয়। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর পূর্ব্ববঙ্গকে মুসল্মানপ্রধান ও পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দুপ্রধান করিয়াই ভাগ করিয়াছেন। তাই একদিকে মুসল্মান ও আর একদিকে হিন্দু আপন আপন প্রাধান্য বাড়াইবার জন্য যে চেষ্টা করিবে ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে উভয়ের পৃথক্ ভাবে অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কাজেই যদি প্রাধান্য বিস্তার করিতে হয়, তাহা হইলে উভয়েরই একযোগে করাই কর্ত্তব্য। হিন্দুমুসল্মানের সম্বন্ধ

যে অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা ইতিহাসের প্রমাণদ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

যেদিন মুসল্মানের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত বিজয়-পতাকা ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছিল, সে দিন অনেক হিন্দুমুণ্ড মুসল্মানের শাণিত তরবারির আঘাতে গড়াগড়ি গিয়াছিল বটে, এবং কোন কোন হিন্দু ইসলাম ধর্ম্ম পরিগ্রহও করিয়াছিল। কিন্তু সমগ্র ভারতে মুসল্মান রাজ্য স্থাপিত ও ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে কয়েক শত বৎসর লাগিয়াছিল। এমন কি, আমাদের বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে অনেক দিন পরে মুসল্মান বিজয়-পতাকা উড্ডীন ও ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ভারতে ও বাঙ্গালায় মুসল্মান রাজা স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু ইসলাম ধর্ম্ম একেবারে হিন্দুদিগের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পারিল না। কতক হিন্দু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, কিন্তু অধিকাংশই মুসল্মানের শাণিত তরবারির ভয় উপেক্ষা করিয়া আপনাদের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে বা বাঙ্গলায় যত মুসল্মান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই মূলে হিন্দু। সমগ্র ভারতে ৬ কোটির কিছু অধিক মুসল্মান আছে। তন্মধ্যে ৫০ লক্ষের কিছু উপর মোগল-পাঠানগণের বংশধর। অবশিষ্ট হিন্দু হইতে মুসল্মানে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গলার জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক মুসল্মান, এবং তাহারা প্রায় সমস্তই মুসল্মান-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু। সুতরাং বঙ্গদেশে তাহারা যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভাই ভাই তাহাতে সন্দেহ নাই। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আপাততঃ তাহারা পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলে তাহাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধ যে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়, এরূপ দেখা যায় না। হইতে পারে, তাহারা ধর্ম্মে ও আচারব্যবহারে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধ যাইবে কোথায়? যাহারা পূর্ব্বে একই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া একই গৃহে প্রতিপালিত হইয়া একই দেশের জল-বায়ুতে শরীর পুষ্ট করিয়াছিল, তাহারা বিভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন করায় কি তাহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে? না, তাহা কদাচ হইতে পারে না, এবং কোন কালেও যে তাহা ঘটে নাই, আমরা ক্রমে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

মহম্মদ কাসিম প্রথমে সিন্ধু জয় করিলেন। সুলতান মামুদ আসিয়া অনেক বার ভারত লুণ্ঠন করিলেন। শেষে সাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী ইন্দ্রপ্রস্থেশ্বর পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন, এবং তাঁহার ক্রীতদাস কুতুবউদ্দীনকে প্রতিনিধিরূপে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি ভারতে মুসল্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। কুতুবের দোহাই দিয়া আবার বক্তিয়ার খিলজী বিহার ও বাঙ্গলার কিয়দংশ অধিকার করিয়া, তিব্বত ও কামরূপ জয় করিতে গিয়া পরাজিত হইয়া আসিলেন। সমস্ত বঙ্গভূমিও বিজিত হইল না, পূর্ব্ববঙ্গ অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বাধীন রহিল। বাদসাহ বুলবনের সময় পূর্ব্ববঙ্গে মুসল্‌মান অধিকার বিস্তৃত হয়। গৌড় বা বাঙ্গলা রাজ্য দিল্লীর বাদসাহের অধীন ছিল, ১৩৪০ খৃঃ অব্দ হইতে তাহা স্বাধীন হইয়া উঠিল। এইরূপে দিল্লী ও গৌড় দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হইল। এই দুই রাজ্যে হিন্দুদিগের সহিত কিছুদিন ধরিয়া সংঘর্ষ চলিল। দিল্লীর বাদসাহগণের সহিত রাজপুতানার নরপতি-বৃন্দের এবং গৌড়ের বাদসাহদিগের সহিত কামরূপ, কুচবিহার, ত্রিপুরার রাজগণ ও মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলার ভুঁইয়াদিগের সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। জনসাধারণের মধ্যেও ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা হইতে লাগিল। প্রয়োজনানুসারে শাণিত তরবারিও উন্মুক্ত হইল। কিন্তু হিন্দু শারীরিক বলে মুসল্‌মানকে দেশ হইতে দূরীভূত করিতে না পারিলেও মানসিক বলে ইসলাম ধর্ম্ম উপেক্ষা করিল। শাণিত তরবারির নিকট মস্তক বলি দিল বটে, কিন্তু ইসলাম ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া আপনাদের অস্তিত্ব নষ্ট করিল না। অবশ্য এরূপ প্রবল স্রোতে বিরাট্ হিন্দুসমাজের যে কোন কোন অংশ স্খলিত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহার মূল ভিত্তি শিথিল হয় নাই। মুসল্‌মানের শাণিত তরবারির ভয়ে কেহ কেহ ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। কিন্তু মুসলমানেরা যখন হিন্দুসমাজের মূলভিত্তি উৎপাটন করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা তরবারি কোষস্থ করিলেন। প্রচারের গতিও মন্দীভূত হইল। সুতরাং সংঘর্ষের পর সম্মিলন আসিল, মুসলমান হিন্দুর সহিত মিলনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতেও বাঙ্গলায় শান্তি দেখা দিল।

দিল্লীর পাঠান বাদসাহগণের সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ ও ইসলাম ধর্ম্ম-প্রচার অনেক দিন চলিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে তাহা শান্তভাব ধারণ করে। যদিও বাদসাহ ও রাজপুরুষগণ হিন্দুদিগকে একটু হেয় ভাবে দেখিতেন, কিন্তু তাহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা হইত না। তাহাদের প্রতি জিজিয়া কর স্থাপিত হইলেও তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোনরূপ ব্যতিক্রম হইত না। সামরিক বিভাগে হিন্দুরা অধিকার না পাইলেও হিন্দু জমীদারেরা সৈন্ত রক্ষা করিতেন, এবং রাজস্ব ও আয়ব্যয় বিভাগে হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি যে সময়ে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন সে সময়ে, রাজস্ব-কর্ম্মচারী, বণিক্ ও শ্রমজীবিগণ হিন্দু ছিল। * সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, পাঠান রাজত্ব হইতেই হিন্দুর সহিত সম্মিলনের ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতিতে হিন্দুকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক হিমু ও মেদিনী রায়ের † নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর নিকট হইতে সমস্ত ক্ষমতা পাইয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, মোবারিক খিলজীর সময় সমস্ত বিচার ও শাসন হিন্দু ভাবেই সম্পন্ন হইত। ‡ ইহা হইতে

* "The officers of revenue, merchants, and work-people were all Hindus." ( Erskin's Baber p. 232. )

† হিমু আদিলসাহের ও মেদিনীরায় মালবের রাজা দ্বিতীয় মামুদের কর্ম্মচারী ছিলেন।

‡ "The Hindus were regarded with some contempt, but with no hostility. They were liable to a capitation tax (Jizya) and some other invidious distinction, but were not molested in the exercise of their religion. The Hindus who are mentioned as military commanders may perhaps have been Zeminders, heading their cantingets, and not officers appointed by the crown; there is no doubt, however, that many were employed in civil office especially of revenue and accounts; and we have seen that Hemu and Medni Rai were entrusted with all the powers of their respective governments, and that under Mobarik Khilji the whole spirit of the court and administration was Hindu." (Elphinstone)

বেশ বুঝা যায় যে, যখন হইতে শাণিত কৃপাণের ভয় নিবৃত্ত হইয়া কেবল যুক্তি-তর্কময় প্রচার আরব্ধ হইয়াছিল, তখন হইতে হিন্দুরা আর ইসলাম ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে চাহে নাই*, এবং অবশেষে তাহাদের সহিত ঐক্যেরই ব্যবস্থা হইয়াছিল। মোগল রাজত্বকালে এই মিলন সুদৃঢ় হয়, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

পাঠানের রাজত্বাবসান হইলে মোগলেরা ভারতের একাধীশ্বর হন। অবশ্য তাঁহারাও মুসল্‌মানধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের আস্বাদন পাইয়াছিলেন। পাণিপথ ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করিয়া বাবরসাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, হিন্দুকর্ম্মচারী প্রভৃতিতে সাম্রাজ্য পরিপূর্ণ। হিন্দুর ক্ষমতা তখনও লোপ পায় নাই। তাই অচিরে রাণা সঙ্গের সহিত তাঁহার অসি-ক্রীড়া আরম্ভ হইল। তিনি হিন্দুর ব্যবহারে, হিন্দুর বীরত্বে মুগ্ধ হইলেন, হিন্দুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হইল। তৎপূর্ব্বেই হিন্দুদিগের সহিত পাঠান সম্রাট্‌গণ মিলন সংঘটন করিয়াছিলেন। বাবর কেবল মিলন করেন নাই, তিনি তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর হুমায়ুন বাদসাহ হইলেন। তিনিও হিন্দুকে শ্রদ্ধা করিতেন। এমন কি তিনি রাণা সঙ্গের মহিষী রাণী কর্ণবতীর অনুরোধে তাঁহার প্রদত্ত রাখী ধারণ করিয়া রাজপুতনীর সহিত ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হইলেন। হিন্দু-মুসল্‌মানে অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হইল। সেই রাখী ধারণ করিয়া তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতও মনে করিয়া-

* "The terror of the arms of the Mahometans, and novelty of their doctrines, led many to change their religion at first ; but when these were succeeded by controversial discussion more moderate intolerance, a spirit opposed to conversion would naturally arise." (Elpinstone).* শাণিত কৃপাণের ভয় ও ইসলাম ধর্ম্মের নূতনত্বের মোহ দূর হইলে, আবার হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করার জন্য হিন্দুসমাজ হইতেও অনেকরূপে চেষ্টা করা হইয়াছিল।

ছিলেন, ও রাণীর আহ্বানানুসারে চিতোরে উপস্থিত হইয়া গুর্জ্জরেশ্বর বাহাদুর সাহের হস্ত হইতে চিতোর উদ্ধার করেন।

তাহার পর যে সময় হইতে আকবর বাদসাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, সেই সময় হইতে হিন্দু-মুসল্‌মানের কোনরূপই পার্থক্য রহিল না। আকবর হিন্দুদিগকে যেরূপ সম্মান করিতেন, হিন্দুরাও সেইরূপ তাঁহাকে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল, এবং তিনি পূর্ব্বজন্মে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন বলিয়া কথিত হইলেন। মুসল্‌মান মৌলবীর পার্শ্বে তাঁহার দরবারে হিন্দু পণ্ডিতগণের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহার মন্ত্রী বীরবল হিন্দু, সেনাপতি বিহারীমল্ল, ভগবানদাস, মানসিংহ, রায়সিংহ, উদয়সিংহ প্রভৃতি হিন্দু, রাজস্ব-কর্ম্মচারী তোড়লমল্ল হিন্দু, মুসল্‌মানের সহিত হিন্দু সাম্রাজ্যের সমস্ত বিভাগেই অধিকার পাইল। তাহার পর তিনি স্বয়ং ও তাঁহার বংশধরগণ রাজপুতগণের সহিত বিবাহবন্ধনেও বদ্ধ হইলেন। কিন্তু এই সমস্ত রাজপুত মহিষীগণের জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায়তা করা হইল। অদ্যাপি আগরা ও ফতেপুর শিক্রির যোধবাই মহাল প্রভৃতিতে তাহার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। হিন্দুরাজত্বকালে ব্রাহ্মণগণ যেমন নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেন, মুসল্‌মান রাজত্বকালে তাহারও বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। আকবরের সুব্যবস্থায় আবার তাহা সুদৃঢ় ব্যবস্থাই হয়। একমাত্র আরঙ্গজেব সেই প্রথার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থাদি পারসীক ও আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়া জগতে প্রচারিত হইতে লাগিল, এসিয়ার ও ইউরোপের জনগণ তাহা পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিতে লাগিল। জিজিয়া রহিত করিয়া হিন্দু মুসল্‌-মানের সমভাব রক্ষিত হইল। হিন্দুমুসল্‌মানেরা ভাই ভাই হইয়া এক গ্রামে, এক পল্লীতে বাস করিতে লাগিল। আকবর বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু মুসল্‌মান উভয়েই তাঁহার প্রজা, এবং উভয়েই তাঁহার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য চেষ্টা না করিলে, কদাচ মোগল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় থাকিতে পারে না। তজ্জন্য তিনি উভয়কেই একই চক্ষে দেখিতেন।

আকবরের পর জাহাঙ্গীর ও সাজাহান তাঁহার উদার নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের শরীরে হিন্দুরক্তও বিরাজিত ছিল, তাঁহারা উভয়েই রাজপুত মহিষীর গর্ভজাত। তাঁহাদের সময়েও হিন্দুগণ মুসল্মানের সহিত সকল বিভাগেই প্রবিষ্ট হইতেন, কোনরূপ পার্থক্য ছিল না, এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য হিন্দুগণ মুসল্মানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমভাবে যত্ন করিয়াছিল। বাবর ও হুমায়ুন, যাহার সূচনা করিয়া যান, এবং আকবর যাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র নীতি তাঁহার বংশধরগণও অনুসরণ করিতে ক্রটি করেন নাই।

কিন্তু আরঙ্গজেবের সময় তাহার কতক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দু মুসল্মানের কিছু কিছু পার্থক্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়, ব্রাহ্মণগণের ভূমির উপর সামান্য কর ধার্য্য হয়, হিন্দুর মন্দিরাদি ভগ্ন হয়। কিন্তু হিন্দুকে তিনি একেবারে রাজকার্য্য হইতে অবসর দিতে পারেন নাই। তাঁহারও রাজত্ব সময়ে জয়সিংহ ও যশোবন্তসিংহ মোগল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। আরঙ্গজেব মুসল্-মানদিগের সহিত হিন্দুর কতক পার্থক্য করিলেও হিন্দু সাধারণের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। যদিও স্থানে স্থানে হিন্দুর দেবমন্দিরাদি ভগ্ন হইয়াছিল, তথাপি হিন্দুদিগকে বলপূর্ব্বক মুসল্মান করিতে বা তাহাদের অস্তিত্ব নাশের চেষ্টা করা হয় নাই। তাঁহার সময়ে হিন্দু মুসল্মান এক সঙ্গে নির্ব্বিবাদে বাস করিয়াছিল। আরঙ্গজেব হিন্দুদিগের প্রতি যে কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ফল কিন্তু ভাল হয় নাই। তাহারই জন্য অবশেষে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটে, আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

আরঙ্গজেবের পর হইতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। হিন্দু-দিগের প্রতি তাঁহার কঠোর নীতি এই পতনের কারণ। তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাটগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহারা হিন্দুদিগের পূর্ব্বা-ধিকার প্রদানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে জিজিয়া কর ত

রহিতই হইয়াছিল, এবং কেহ কেহ গোবধেরও নিষেধপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় হইতে আবার হিন্দুদিগের প্রাধান্য জাগিয়া উঠে। মহারাষ্ট্রীয়, শিখ ও রাজপুত মোগলগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া তাহার মূলোৎপাটনে সচেষ্ট হয়। সুতরাং সে সময়ে হিন্দু মুসল্‌মানের যে কোনরূপ পার্থক্য থাকিতে পারেনা, ইহা বলা বাহুল্য। তাহা হইলেও তখন পর্য্যন্ত মুসল্‌মান দেশের রাজা ছিলেন, এবং জনসাধারণ তাঁহাদিগকে সেই রূপই দেখিত, এবং সে সময়ে হিন্দু ও মুসল্‌মান সাধারণের মধ্যে কোনই পার্থক্য অনুভূত হইত না। উভয়ে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও যেন এক মাতার সন্তানের ন্যায় অবস্থিতি করিত। এইরূপ সময়ে ভারতে ব্রিটিশ অধিকার স্থাপিত হয়। তদবধি হিন্দু মুসল্‌মান একই অবস্থায় অবস্থিত। আমরা ভারত সাম্রাজ্যের বিষয় উল্লেখ করিলাম, এক্ষণে বাঙ্গলার কথা একটু বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেছি, এবং সকলে দেখিবেন যে, বাঙ্গলায় উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ ভাব অনেক দিন হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে গৌড় বা বাঙ্গলা স্বাধীন সাম্রাজ্য হইয়া উঠে। দিল্লীর বাদসাহগণের ন্যায় গৌড়ের বাদসাহগণও প্রথম প্রথম হিন্দুদিগকে তাদৃশ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, কিন্তু অবশেষে তাঁহারাও হিন্দুদিগের সাহায্য ব্যতীত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ক্রমে তাঁহাদিগকেও হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। তদ্ভিন্ন তৎকালে বাঙ্গলায় বারভূঁইয়া প্রথা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বে তাঁহারা সকলেই হিন্দু ছিলেন। যদিও মুসলমান রাজা আরম্ভ হওয়ায় হিন্দু ভূঁইয়ার স্থলে অনেক মুসল্‌মান ভূঁইয়া এক এক বিস্তীর্ণ জনপদের অধীশ্বর হইতেছিলেন, তথাপি অনেক দিন পর্য্যন্ত হিন্দু ভূঁইয়ার সংখ্যাই অধিক ছিল। তাঁহাদের সাহায্যে গৌড়ের পাঠান সাম্রাজ্য রক্ষিত ও পুষ্ট হইয়াছিল। কাজেই অতি অল্প কালের মধ্যেই বঙ্গদেশে হিন্দুমুসল্‌মানের বিরোধ অন্তর্হিত হইয়া মিলন সংঘটিত হয়। ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

বাদসাহ হুসেন সাহার সময় এই মিলন সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। তাঁহার দুই প্রিয় শিষ্য রূপ ও সনাতন হুসেন সাহার প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। হুসেন সাহা নিজেও সুবুদ্ধিরায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে আপনার প্রতিভাবলে গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। রূপসনাতন ব্যতীত পুরন্দর বসু তাঁহার সভাসদ ছিলেন, তিনি বাদসাহার নিকট হইতে খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। হুসেন মালাধরবসুকে গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি উৎসাহ প্রদান করিতেন। সেইজন্য বঙ্গসাহিত্যের অনেক প্রাচীন গ্রন্থে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। পদাবলীতেও হুসেন সাহার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।* তাঁহার সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। তাহাতেও হুসেন সাহার গুণবর্ণনা আছে। পরাগলের ন্যায় তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁও শ্রীকর নন্দীকে অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করিতে আদেশ দেন। এই রূপে হুসেন খাঁ ও তৎকর্ম্মচারিবর্গ হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হুসেন সাহ চৈতন্য মহাপ্রভুকেও শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। এই সময়ে চৈতন্যদেবের প্রচারিত নব বৈষ্ণব ধর্ম্ম মুসলমানদিগকেও আহ্বান করিতে থাকে। তজ্জন্য হিন্দুমুসলমানের অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হয়। তাহাদের পূর্ব্বে যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, এক্ষণে তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। উভয়েই উভয়ের ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে অনেক মুসলমান ফকীরও বৈষ্ণব মত প্রচার করেন, তন্মধ্যে সৈয়দ্‌ মর্ত্তুজা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তখন আর শাণিত কৃপাণের ভয় ছিল না। মুসলমান ধর্ম্মের মহিমা প্রচারের জন্য যেমন মুসলমান প্রচারকগণ চেষ্টা করিতেন, সেইরূপ নব বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারও বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে বিস্তৃত হইতে লাগিল, এবং তাহা মুসলমানদিগকেও আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। গৌড়ের বাদসাহী তক্তে বসিয়া মুসলমান সম্রাট হিন্দুমুসলমানের এই অপূর্ব্ব আকর্ষণ দেখিতে

* "শ্রীযুত হুসন, জগতভূষণ, সোহ এ রস জান"

লাগিলেন, এবং উভয়কেই তজ্জন্য উৎসাহ দিতেও ত্রুটি করিলেন না। হুসেন সাহার পর তাঁহার পুত্র নসারত সাহাও পিতার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আদেশে ভারত-পাঞ্চালী ও মহাভারত প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। হুসেন সাহ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, দিল্লীর মোগল বাদসাহগণের হিন্দু-প্রীতির পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গলার পাঠান বাদসাহগণের নিকট হইতে হিন্দুরা শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছিল। দিল্লী সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার কিছু পরে বাঙ্গলায় পাঠান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুপ্রীতি দিল্লী সাম্রাজ্যে প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলায় অনুসৃত হইয়াছিল। হুসেন সাহ ও নসারত সাহের সময় যাহা অত্যধিক ভাবে দৃষ্ট হয়, তাহার পূর্ব্ব হইতে যে তাহার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছিল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাবর হুমায়ুন যদি পথ প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে আকবর হিন্দুপ্রীতির ঐরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিতেন না। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই যে গৌড়ের বাদসাহগণ হিন্দুপ্রীতি দেখাইয়া আসিতেছেন, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। মধ্যে হিন্দু রাজাও গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। রাজা গণেশের নাম বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার বংশ মুসলমান হওয়ায়, উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটিবার সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল। ফলত: বাঙ্গালায় অনেক দিন হইতে হিন্দুমুসলমানের মিলন ঘটিয়া আসিতেছে।

গৌড়ের শেষ পাঠান রাজা সুলেমান ও দায়ুদের সময়ও হিন্দুদিগের সহিত যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল। সে সময় পর্য্যন্তও হিন্দু ভূঁইয়ারা তাঁহাদের সামন্ত রূপে অবস্থিতি ক'রতেছিলেন। সুলেমানও হিন্দু কর্ম্মচারীদের দ্বারা রাজস্ব ও আয়ব্যয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষেরা সুলেমানের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহার পর দায়ুদের সময় প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি ও পিতৃব্য জানকীবল্লভ দায়ুদের নিকট হইতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরায় উপাধি লাভ করিয়া তাঁহার

দক্ষিণহস্তস্বরূপ সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। দায়ুদের উপর বিক্রমাদিত্যের যে অসীম ক্ষমতা ছিল, তাহা মুসল্মান ঐতিহাসিকগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে ত্রুটি করেন নাই। দায়ুদ অনেক সময়ে বিক্রমাদিত্যের পরামর্শেই চলিতেন। এই সময়ে কেবল গৌড়েশ্বরের সহিতই যে তাঁহাদের সম্বন্ধ ছিল এমন নহে। তাঁহার অমাত্য ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পাঠান-বংশীয়দিগেরও সহিত তাঁহাদের যথেষ্ট সম্পর্ক ছিল। কতলু খাঁ, ইশা খাঁ প্রভৃতি পাঠানগণের সহিত তৎকালে হিন্দু ভুঁইয়া ও জমীদারদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সে সময়ে হিন্দু ও পাঠানে মিলিত হইয়া মোগলের গতিরোধ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে সংঘর্ষ ঘটিলেও অধিকাংশ সময়ে মিলনের ভাবই দেখা যাইত। বাঙ্গলায় মোগল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুমুসল্মানের সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহার পর বঙ্গরাজ্য মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হইলে, আকবর বাদসাহের উদার নীতি বাঙ্গলার শ্যামল প্রান্তরে আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। এমন কি বাঙ্গলার শাসনদণ্ড সময়ে সময়ে হিন্দুর হস্তেও অর্পিত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তোড়লমল্ল ও মানসিংহের নাম অনায়াসে করা যাইতে পারে। তাঁহারা মোগল সুবেদারদিগের সমকক্ষ ছিলেন বলিয়াই বাদসাহ কর্ত্তৃক বাঙ্গলার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপে বাঙ্গলায় হিন্দুমুসল্মানের সৌহার্দ্দ অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। যে আকবরসাহ আপনার সমগ্র সাম্রাজ্যে হিন্দুপ্রীতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, বাঙ্গলায় যে তাহা প্রচারিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বাঙ্গলায় তাহার পূর্ব্ব হইতে হিন্দু মুসল্মানের ভ্রাতৃভাব সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে আকবর বাদসাহের ঔদার্য্যে আবার তাহা বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার বংশধরগণের সময়ও তাহা দিন দিন বাড়িয়া উঠে। যদিও বাদসাহ আরঙ্গজেবের কঠোর নীতি ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বঙ্গরাজ্যেও প্রচারিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার মাতুল সায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি বঙ্গদেশে হিন্দু-দিগের প্রতি কিঞ্চিৎ অপ্রিয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তথাপি বঙ্গ রাজ্যে পূর্ব্ব হইতে হিন্দুমুসল্মানের যে সৌহার্দ্দ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, তাহা আর শিথিল

হয় নাই। বাদসাহ্ আরঙ্গজেবের সময়েও বঙ্গরাজ্যের রাজস্ব বিভাগে হিন্দু কর্ম্মচারীরাই নিযুক্ত হইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্গাধিকারিগণের ও সায়েস্তা খাঁর কর্ম্মচারী রায় মল্লিকচাঁদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ সময় হইতে মুর্শিদাবাদ নিজামতের প্রতিষ্ঠা হয়। এই মুর্শিদাবাদ নিজামত যেরূপ হিন্দুপ্রীতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল, তাহার তুলনা নাই। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ যদিও মুসলমান ধর্ম্মে অত্যধিক অনুরাগী ছিলেন, তথাপি তিনি হিন্দু কর্ম্মচারীদিগকে উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। এই সময় হইতে জগৎশেঠগণের নিজামত দরবারে প্রাধান্য বিস্তৃত হয়, এবং বঙ্গাধিকারিগণেরও ক্ষমতা বাড়িয়া উঠে। তদ্ভিন্ন এই সময় হইতেই বাঙ্গলার হিন্দু জমীদারগণেরও প্রভুত্ব বর্দ্ধিত হয়, এবং নাটোর প্রভৃতি বাঙ্গলার প্রধান প্রধান জমীদারীরও সৃষ্টি হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা নবাব সুজাউদ্দীনের সময় হইতে হিন্দুপ্রীতি বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহার সময়ে রাজস্ব-দেওয়ান রায়রায়ান উপাধি পাইয়া নিজামতের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া উঠেন। তাহার পর নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালে এই হিন্দুপ্রীতি চরম সীমায় উপস্থিত হয়। সে সময়ে রাজস্ব ও অন্যান্য বিভাগে হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়া ব্যতীত সামরিক বিভাগেও বাঙ্গালী হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। রাজা জানকীরাম নবাব আলিবর্দ্দীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার পুত্র রাজা দুর্লভরামও সেনাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা পিতাপুত্রে পাটনা ও কটকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। নন্দকুমার প্রভৃতি ফৌজদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র চায়েন রায় রাজস্ব দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া রায়রায়ান উপাধি লাভ করেন। কেবল হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া নহে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ হিন্দু প্রজাদিগকেও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাকে আমরা বাঙ্গলার আকবর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। নবাব সিরাজউদ্দৌলাও মাতামহের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দুর্লভরাম, নন্দকুমার প্রভৃতি আপন আপন পদে নিযুক্ত ছিলেন, তদ্ভিন্ন মোহন লাল তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এই মোহনলালই মীরমদনের সহিত পলাশী

প্রান্তরে তাঁহার গৌরবরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিরাজ হিন্দুদিগের প্রতি এতদূর সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাহাদের হুলি প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে তিনি দরবার বন্ধ করিতেন। তিনি এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন নবাব হিন্দুদিগের হুলি উৎসবে যোগদান করিতেন, এবং হিন্দুরাও মহরম প্রভৃতি উৎসবে যোগ দিতে ত্রুটি করিত না। নবাব মীরজাফরও হিন্দুপ্রীতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি হিন্দুদিগের সাহায্যে মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি যে তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। জগৎশেঠ ও দুর্লভরাম তাঁহার সহায় থাকিলেও তিনি অবশেষে নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং এই নন্দকুমারের অনুরোধে তিনি অন্তিমকালে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন। সুতরাং মুর্শিদাবাদের নবাবগণ কিরূপ হিন্দু-প্রীতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তাহা উপরি উক্ত ঘটনাসমূহ হইতে প্রতীত হইবে। মীরকাসিম হিন্দুদিগের প্রতি তাদৃশ সন্তুষ্ট না থাকিলেও তাঁহার সময়ে রাজস্ব ও অন্যান্য বিভাগের কার্য্য হিন্দু কর্ম্মচারী দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত। তাহার পর মীরজাফরের বংশধরগণ নিজামত তক্তে বসিয়া, হিন্দু দেওয়ানের পরামর্শেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজা গুরুদাস হইতে রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব পর্য্যন্ত নিজামতের সমস্ত দেওয়ানই হিন্দু ছিলেন। মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরও হিন্দুমুসল্‌মানের ভ্রাতৃভাব রক্ষার জন্য সম্প্রতি এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সুতরাং আমরা ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা বুঝিতে পারি যে, মুসল্মান বাদসাহনবাবগণ বহুকাল হইতেই হিন্দুদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তজ্জন্য হিন্দুমুসল্মান প্রজাবর্গ ভ্রাতৃভাবেই অবস্থিতি করিত। তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ বা বিবাদ ঘটিত না। ভারতে ও বাঙ্গলায় ব্রিটিশ রাজ্য স্থাপিত হইলেও তাহাদের মধ্যে সেই ভ্রাতৃভাব সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে তাহার বিপর্য্যয় হওয়া যে দুঃখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগকে একটি কথা বলিতে হইতেছে। যদি মুসল্‌মানগণ পরস্পরের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া বিরোধ ঘটাইতে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। যদি মুসল্‌মানগণ আপনাদিগকে অধিকতর বলশালী মনে করিয়া হিন্দুদিগকে একেবারে নিষ্পেষিত করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের একটি মহাভ্রম। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে, মুসল্‌মান নির্ব্বিঘ্নে কখনও আপনাদের বলপ্রকাশে সমর্থ হন নাই। এমন কি পরিণামে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য হিন্দুরই পরাক্রমে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাওয়ায়, ইংরেজ সহজে ভারতসাম্রাজ্যের অধিকার-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরেজ মোগলের হস্ত হইতে ভারতসাম্রাজ্য লাভ করেন নাই; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ও শিখের সহিতই ভয়াবহ রণক্রীড়া করিয়া ভারতের একাধীশ্বর হইয়াছিলেন। সেই জন্য সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব বলিয়াছেন,—"The British won India not from the Moghals, but from the Hindus,"* একজন আধুনিক ফরাসী পর্য্যাটকও উহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"কিন্তু ইংরেজেরা যখন হিন্দুদিগকে মুসল্‌মান জুজুর ভয় দেখান, তখন তাঁহারা ঐতিহাসিক ভ্রমে পতিত হন। সত্যই কি মুসল্‌মানেরা এত ভীষণ, এত পরাক্রান্ত? কিন্তু তাহাত বোধ হয় না; কেননা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই হিন্দুরাইত—মারাঠা, রাজপুত ও শিখ্—পাথরের পর পাথর খসাইয়া প্রকাণ্ড মুসলমান ইমারৎটি টুকরা টুকরা

* আমরা হণ্টার সাহেবের কথাটি আরও বিশদ ভাবে উল্লেখ করিতেছি;—

"Before we appeared as conquerors, the Mughal Empire had broken up. Our final and most perilous wars were neither with the Delhi King, nor with his revolted governors, but with the two Hindu confederacies, the Marhattas and Sikhs. Muhammadan princes fought with us in Bengal, in the Karnatic, and in Mysore; but the longest opposition to the British Conquest of India came from the Hindus. Our last Marhatta war dates as late as 1818, and the Sikh confederation was overcome only in 1848." ইংরেজদিগের বাঙ্গলায় যুদ্ধও রহস্যময়।

করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল ; তাহাতে ইংরাজেরই যার পর নাই সুবিধা হয়।" *
বাঙ্গলায় যদিও হিন্দুরা মুসল্‌মান-শক্তি পরাক্রমে নষ্ট করে নাই, তথাপি তাহাদের অর্থ ও ইংরেজের অসি বঙ্গদেশেও মুসল্‌মান রাজত্বের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল। † যে কারণে হউক, মুসল্‌মানেরা ভারত জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সহজে হিন্দুদিগকে বিধ্বস্ত করিতে পারেন নাই। রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখজাতির সহিত তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। অবশেষে মহারাষ্ট্রীয় ও শিখদিগের হস্তে মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়। বাঙ্গলায়ও মুসল্‌মানগণের প্রভুত্বের সঙ্গে হিন্দুরাও আপনাদের পরাক্রম প্রদর্শনে ক্রটি করে নাই। গৌড়ের পাঠান সিংহাসনে রাজা গণেশও উপবিষ্ট হইয়াছিলেন. এবং বাঙ্গলার ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্য, কেদাররায় প্রভৃতি মোগল পাঠানের সহিত রণক্রীড়া করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা উদয়নারায়ণ ও সীতারামও স্ব স্ব পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দু, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু যে মুসল্‌মানগণের অত্যাচার সহ্য করিবে ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। সেই জন্য আমরা বলিতেছি যে, এরূপ বিবাদে পরিণামে উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। আমরা পরস্পরের মনোবিকারের জন্য উপরি উক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করি নাই, ইতিহাসও যে হিন্দুর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য তাহাদের অবতারণা করিয়াছি মাত্র। আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা উভয়ের মধ্যে যে সদ্ভাব বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই বদ্ধমূল থাকে। আপাত স্বার্থের জন্য তাহা উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করা কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। হিন্দুমুসল্‌মানের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। তাহার বিচ্ছেদে অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল ঘটিবে না।

---

* ভারতী পৌষ ১৩১৩ সমসাময়িক ভারত।

† "The Rupees of the Hindu Banker, equally with the sword of the English colonel contributed to the overthrow of the Mahomadan power in Bengal."

# রাজা যশোবন্তসিংহ

যশোবন্ত সিংহ মেদিনীপুরের রাজা ছিলেন। ইহাঁরা জাতিতে সদ্‌গোপ।* যশোবন্তের পিতার নাম রাজা রামসিংহ, পিতামহের নাম রাজা রঘুবীর সিংহ। প্রপিতামহের নাম রাজা লক্ষ্মণসিংহ। লক্ষ্মণসিংহের রাজ্যপ্রাপ্তিসম্বন্ধে কতকগুলি অদ্ভুত জনশ্রুতি এ প্রদেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। পিতৃমাতৃবিহীন বালক লক্ষ্মণ সিংহ মেদিনীপুরস্থিত কোন ব্রাহ্মণগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ এই বালককে গোরক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বালক প্রতিদিন প্রভাতকালে গোগণসহ গভীর অরণ্যে প্রবিষ্ট হইত, বেলা ৩টার পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগত হইত। একদিন দিবাবসানকালেও বালক গৃহে আসিল না। ব্রাহ্মণ বড়ই চিন্তিত হইলেন, চারিদিকে হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য। ব্রাহ্মণ বালকের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যাকুল হইলেন। তিনি রাখাল বালকের অনুসন্ধানজন্য বনপ্রবিষ্ট হইলেন এবং দূর হইতে প্রত্যক্ষ করিলেন, বালক এক বৃক্ষতলে গভীর নিদ্রায় অচেতন। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের প্রখর রশ্মি উহার মুখমণ্ডলে পতিত হইয়াছে। একটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া প্রখর রৌদ্রোত্তাপ হইতে উহার মস্তক রক্ষা করিতেছে। ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই সর্প বনে প্রবিষ্ট হইল। সেই ব্রাহ্মণ বালকের শুভ চিহ্ন রাজলক্ষণ সন্দর্শন করিয়া অতি সাবধানে উহার নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন। সেই দিন ব্রাহ্মণ বালককে গো-রক্ষণ কার্য্য হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন। বয়োবৃদ্ধিসহকারে সেই বালকের বল বুদ্ধি পরাক্রম প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই বালক কাল-সহকারে মেদিনীপুরের তদানীন্তন আরণ্য ভূপতি মাজি রাজার সেনাপতি হইলেন। ইনি কোন যুদ্ধোপলক্ষে সসৈন্যে উৎকলে গমন করেন। তৎকালে

* প্রিভিকাউন্সিলের কোন মোকদ্দমায় এই রাজাদিগকে "সদ্‌গোপ ব্রাহ্মণ," বলা হইয়াছে। বোধ হয় আচার ব্যবহারের উৎকর্ষতা নিবন্ধন এইরূপ বলাই সম্ভব।

কেশরিবংশীয় কোন রাজা লক্ষ্মণসিংহের বলবীর্য্যে ও যুদ্ধনৈপুণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে মেদিনীপুর রাজ্যের রাজ-সনন্দ প্রদান করেন। লক্ষ্মণসিংহ মাজি রাজা সুরতসিংহের হস্ত হইতে রাজত্ব গ্রহণ করেন।

সেই ভঞ্জ বা ভূমিজ আখ্যাত রাজার উপাধি অনুসারে মেদিনীপুর পরগণা "ভঞ্জভূম" অথবা "ভঞ্জভূমি" নামে অদ্যাপি বিখ্যাত আছে।

বর্ত্তমান মেদিনীপুর সহরের ৩ ক্রোশ উত্তর অংশে "কর্ণগড়" নামক যে বিখ্যাত স্থান আছে, রাজা লক্ষ্মণসিংহ এই স্থানে আপনার রাজধানী মনোনীত করেন। অদ্যাপি কর্ণগড়ে এই রাজবংশের কুলদেবী ভগবতী মহামায়া ও দণ্ডেশ্বর নামক মহাদেব মূর্ত্তি ও মন্দির বিদ্যমান আছে। তদ্ভিন্ন রাজবংশের অট্টালিকার ভগ্নাবশেষাদি যথেষ্টই আছে। শিবায়ন গ্রন্থ প্রণেতা কবিবর ৺ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী কর্ণগড় রাজবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিবায়নে লিখিত আছে—

"পূর্ব্বে বাস যদুপুরে, হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীতি।

পূর্ব্বে হুগলি এইক্ষণ মেদিনীপুর জেলার বরদা পরগণার যদুপুর গ্রামে কবিবরের বাসস্থান ছিল। রাজা শোভা সিংহের ভ্রাতা হেমৎ সিংহ সেই বাটী ভগ্ন করেন।

শিবায়নে অপর স্থানে লিখিত আছে—

"রঘু বীর মহারাজা, রঘুবীর সমতেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণধীর,
যাহার পুণ্যের ফলে, অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর।
তস্য সুত যশোবন্ত সিংহ সর্ব্ব গুণযুত,
শ্রীযুত অজিতসিংহের তাত,
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ।

রাজা রণে ভৃগুরাম, দানে কর্ণ রূপে কাম,
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি,
শক্রের সমান সভা, জ্বলন্ত পাবকপ্রভা
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎকবি।

দেবীপুত্র নৃপবরে, স্মরণে পাতক হরে
দরশনে আনন্দবৰ্দ্ধন,
তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর
বিরচিল শিবসঙ্কীর্ত্তন।

যশোবন্ত সিংহ, সিংহবাহিনীর দাস
যে রাজসভায় হইল সংগীত প্রকাশ।
যশোবন্ত সিংহে দয়া কর হরবধূ
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥

"মধুক্ষরে, মনোহর মহেশের গীত,
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত।

রাজা যশোবন্ত সিংহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। কবিবর ৺রামেশ্বর তাঁহাকে "দেবীপুত্র," এই আখ্যায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত ৺ রাম গতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার বিরচিত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"নবাব সুজা উদ্দিনের সময়ে ১৬৫৬ শকে ( ১৭৩২ খৃঃ অব্দে ) এই যশোবন্ত সিংহ ঢাকার নায়েব দেওয়ান সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি ঘানিব আলির সহিত দেওয়ান হইয়া ঢাকা নগরীতে গিয়াছিলেন। ইহাঁরই প্রযত্নে পুনর্ব্বার টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় হওয়ায় নবাব সায়েস্তা খাঁর সময় হইতে আবদ্ধ ঢাকা নগরের পশ্চিম দ্বারের কবাট উন্মুক্ত হইয়াছিল। যাহা হউক ইনি ১৬৫৬ শকে দেওয়ান হইয়াছিলেন। * * * ইতিহাসে দেখা যাইতেছে

দেওয়ানি লাভের পূর্ব্বে যশোবন্ত সিংহ প্রসিদ্ধ মুরশীদকুলি খাঁর অধীনে বহুদিন থাকিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।" *

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ১৩৮ পৃষ্ঠা।

শিবায়ন গ্রন্থের ৪র্থ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

"অজিত সিংহের তাত, যশোবন্ত নরনাথ
রাজা রামসিংহের নন্দন,
তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর,
বিরচিল গণেশবন্দন।

শিবায়ন গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে—তাঁহার (রামেশ্বরের) এক যোগাসন কর্ণগড় মহামায়া দেবীর মন্দিরমধ্যে স্থাপিত। ইহা পঞ্চমুণ্ডী যোগাসন। তদ্ভিন্ন এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে যুগীখোপা নামক একটি ক্ষুদ্র ত্রিতল বাটী দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, রামেশ্বর প্রথমতঃ ঐ যুগীখোপায় যোগাভ্যাস করেন। পরে মহামায়ার সম্মুখে পঞ্চমুণ্ডী আসনে সিদ্ধ হন। সিদ্ধপুরুষ রামেশ্বর দেহত্যাগ করিলে সেই মন্দিরের নিকটে তাঁহার সমাধি হয়। তাঁহার সমাধি-মন্দিরের নিকটে যশোবন্তসিংহেরও সমাধি আছে। ইহাতে বোধ হয়, তিনি যে যশোবন্ত সিংহকে "দেবীপুত্র" ইত্যাদি বলিয়াছেন তাহা কেবল প্রশংসাপর বাক্য নহে। তিনিও একজন সাধুপুরুষ ছিলেন।

## কর্ণগড় রাজবংশ।

১। রাজা লক্ষ্মণ সিংহ
|
২। রাজা রঘুবর সিংহ
|
৩। রাজা রাম সিংহ
|
৪। রাজা যশোবন্ত সিংহ
|
৫। রাজা অজিত সিংহ

রাণী ভবানী, রাণী শিরোমণি।

* যিনি টাকায় টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় করাইয়াছিলেন তাঁহার নাম যশোবন্ত রায়। তিনি সরফরাজ খাঁর ওস্তাদ বা শিক্ষক ছিলেন। যশোবন্ত রায় ও যশোবন্ত সিংহ পৃথক ব্যক্তি। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রথম খণ্ড দেখ। (সম্পাদক)

রাজা লক্ষ্মণসিংহের পুত্রের নাম রাজা রঘুবর সিংহ তৎপুত্র রাজা রাম সিংহ, তাঁহার পুত্রের নাম রাজা যশোবন্ত সিংহ, ইহাঁর তনয় রাজা অজিত সিংহ। এই শেষোক্ত রাজা নিঃসন্তানাবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, অজিতের প্রথমা পত্নী রাণী ভবানী মেদিনীপুরের অধীশ্বরী হন। তাঁহার জীবনান্তে রাণী শিরোমণি এই রাজত্ব প্রাপ্ত হন। এই শেষোক্ত মহিলা বহুকাল এদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজত্বকালে ইংরেজরাজ এ প্রদেশ অধিকার করেন। এই সময়ে মুসলমান রাজশক্তি এ প্রদেশে একেবারেই বিলুপ্ত হয়, অথচ ইংরেজ রাজ এ প্রদেশ সুশাসনের বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। এই সুযোগে বহুতর দস্যু তস্কর এপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়। এই সময়ে, বিখ্যাত গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি নামে একজন দস্যুসর্দ্দার এদেশে উপস্থিত হয়। রাণী শিরোমণি এই দস্যুর অত্যাচারে নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া কর্ণগড়-রাজভবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাণী মেদিনীপুর সহরের উত্তরাংশে (আবাস গড়) নামক যে দুর্গ বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে, তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই গড়ের মধ্যে অদ্যাপি রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দিরাদি বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়, অনেকগুলি কামান বিদ্যমান থাকিয়াই রাজবংশের অতীত সুখসৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

রাণী শিরোমণির জীবনাবসানসহ কর্ণগড় রাজবংশের পার্থিব সুখ সৌভাগ্য ও গৌরবগরিমা বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই সময়ে মেদিনীপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের হস্তে মেদিনীপুর রাজত্বের শাসনভার পতিত হইল। এই বংশের বর্ত্তমান অধিপতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা নরেন্দ্র লাল খাঁ বাহাদুরের প্রযত্নে কর্ণগড় রাজবাটী ভগবতী মহামায়া দেবীর ভগবান্ দণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দির অত্যুৎকৃষ্টরূপে জীর্ণ সংস্কার করা হইতেছে। মহামায়া দেবীর কৃপায় এই মেদিনীপুর রাজত্ব অনেক বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান রাজবংশের অধিকারে রহিয়াছে। এই মহাদেবীই মেদিনীপুর রাজত্বের শীর্ষস্থানীয় ও রাজবংশের চির কল্যাণের আকর স্বরূপিণী। রাজা নরেন্দ্র লাল এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া দেবীর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

যে কর্ণগড় একদিন ধনরত্নে প্রভুত্বপরাক্রমে মেদিনীপুরের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু কালপ্রভাবে সেই কর্ণগড় গভীর জঙ্গলে পরিণত। যে ভগবতী মহামায়া ও দণ্ডেশ্বর মহাদেব মেদিনীপুরের প্রধানতম রাজবংশের কুলদেবতা ছিলেন, কালপ্রভাবে তাঁহারাও গভীর অরণ্যে কিছু দিবস অবস্থিতি করেন।

রাজা নরেন্দ্র লাল খান বাহাদুর সেই পুণ্যময় পবিত্র কর্ণগড়ে মহাদেবী ভগবতী মহামায়া দেবীর মন্দিরসন্নিধানে ১৩০৯ সালের ৪ঠা শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথিতে স্থানীয় প্রায় ১০ দশ সহস্র লোককে পরিতৃপ্ত রূপে আহার করাইয়াছিলেন।

৩রা শ্রাবণ সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজবাটীর কর্ম্মচারিবর্গ অন্যান্য অনেক লোক কর্ণগড়ে উপনীত হইয়া, আহার্য্য প্রস্তুতের বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইলেন। রবিবার ৪ঠা শ্রাবণ প্রাতঃসূর্য্যোদয়সহকারে কর্ণগড় যেন বহুকালের গভীর নিদ্রা হইতে চৈতন্যলাভ করিল। চতুর্দ্দিক হইতে নদী স্রোতের ন্যায় জনস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এক এক দিক হইতে সহস্র সহস্র লোক কর্ণগড়ে সমবেত হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে সঙ্কীর্ত্তনের দল খোল করতালের ধ্বনিসহ ঘোররবে হরিনাম ধ্বনি করিয়া মহামায়া দেবীর মন্দির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইতে লাগিল। বেলা প্রায় ১০টার কিছু পূর্ব্বে মেদিনীপুরাধিপতি রাজা বাহাদুর সমুপস্থিত হইলেন। রাজার আগমনে যেন আনন্দস্রোত উদ্বেলিত হইল। অদ্য রাজা যশোবন্তের জন্মভূমি, ভগবতী মহামায়ার অবস্থাপিত পুণ্যপবিত্র ভূমি কর্ণগড় যেন নব বলে বলীয়ান হইল। সেই দিন রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত প্রায় ১০ সহস্র লোক অপর্য্যাপ্তরূপে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য দ্বারা পরিতোষরূপে আহার করান হইল। প্রায় রাত্রি দুই প্রহর কালে আহারাদি সমাপন করাইয়া রাজা মেদিনীপুরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৬৫৬ শকে রাজা যশোবন্ত দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে ইনি মেদিনীপুর রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি রাজ্যপ্রাপ্তির পরেই কবিবর

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সহিত নিয়মিতরূপে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। কর্ণগড় বাস ভবনে "যোগমণ্ডব" নামক যে ক্ষুদ্র গৃহ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, উক্ত গৃহে রাজা যোগসাধনাভ্যাস করিতেন। তৎপরে ভগবতী মহামায়ার সন্নিধানে "পঞ্চমুণ্ডি" নামক যে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল, উক্ত আসনে রাজা সিদ্ধিলাভ করেন। এখানে এরূপ কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে, রাজা যশোবন্ত যে সময়ে সিদ্ধিলাভ করেন, তৎকালে ভগবতী মহাদেবী প্রত্যক্ষরূপে রাজাকে দর্শন দেন।

মহাদেবী মহামায়া রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে সময়ে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন দেন, তৎকালে রাজার মস্তকে দক্ষিণ হস্ত প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এজন্য রাজা যশোবন্তের মস্তকে দেবীর পঞ্চাঙ্গুলি চিহ্ন ছিল, এই চিহ্ন রাজার সিদ্ধির লক্ষণ। কবিবর রামেশ্বরের যোগসিদ্ধির চিহ্নস্বরূপ দেবী রুদ্রাক্ষের মালা প্রদান করেন। এই রুদ্রাক্ষসমূহ কোন কালেই শুষ্ক হয় নাই। এই মালা কবিবরের মৃত্যুর পরেও কর্ণগড় রাজভবনে ছিল। যে সময়ে ইংরেজ সেনাপতি মিঃ আবট সাহেব আবাসগড়ের দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক রাজসম্পত্তি লুণ্ঠন করেন, তৎকালে উক্ত অমূল্য মালা অপহৃত হইয়াছিল। কোন্ ব্যক্তি উক্ত মালা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

শ্রীচন্দ্রনাথ সরকার।

# হাফেজ।

( ২ )

মহাকবি কালিদাস যেরূপ বাগ্দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, হাফেজের কবিত্বলাভ সম্বন্ধেও সেইরূপ একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। যৌবনকালে হাফেজ একটি সুন্দরী যুবতীর প্রতি প্রেমাসক্ত হন। এ বিষয়ে সিরাজের রাজপুত্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ঐ যুবতীর নাম সাকী নেবাত। সিরাজ হইতে কয়েক মাইল দূরে পিরিসেজ নামক একটি স্থান ছিল। একটা প্রবাদ ছিল যে, যদি কোন যুবক ঐ স্থানে ক্রমান্বয়ে ৪০ রাত্রি অতিবাহিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি উৎকৃষ্ট কবি হইতে পারিবেন। যুবক হাফেজ এইরূপ ভাবে কবিত্বলাভের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন। তিনি প্রতিদিন কিছু খাদ্য লইয়া উক্ত প্রেমের পাত্রী লজ্জাবতী যুবতীর গৃহের সম্মুখে দিয়া পিরিসেজে যাইতেন, এবং তথায় অতিনিদ্রিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করিয়া আসিতেন। এইরূপ ৩৯ দিন অতিবাহিত হইল। পরদিনও তিনি ঐরূপ ভাবে যাইবার সময় উক্ত যুবতী তাঁহাকে সঙ্কেতে ডাকিয়া পরমানন্দে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন যে, রাজার পুত্র অপেক্ষা তিনি প্রতিভাসম্পন্ন দরিদ্র যুবকের অধিকতর পক্ষপাতিনী। হাফেজ কিছুকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলেন, সেই স্থানে রাত্রি যাপনের সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু সহসা তাঁহার স্মৃতি জাগিল; কবি-কীর্ত্তিলিপ্সা প্রেমলালসাকে পরাজিত করিল। হাফেজ প্রেমিকা ত্যাগ করিয়া বাগ্দেবীর সেবায় গমন করিলেন। তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপিত হইল। গল্প আছে যে, পরদিন প্রাতে স্বয়ং ভগবান তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে এক পাত্র স্বর্গীয় সুধা পান করাইলেন। সেই পাত্রের সুধা অবশেষে তাঁহার ভাষায় সুধায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্ মহাজনের জন্য পন্থা প্রস্তুত করেন।

একটা কথা আছে, জীবদ্দশায় কবির সমাদর হয় না। হাফেজের বেলায় সে কথা খাটে নাই। তাঁহার জীবদ্দশায়ই তাঁহার নাম ও তাঁহার কবিত্ব-সৌরভ দেশবিদেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। বহু স্থান হইতে তাঁহাকে লইবার জন্ম রাজন্যবর্গ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু হাফেজ নিজের শান্তি-রসাস্পদ নির্জ্জন কুটীরে নিরুদ্বেগে বাস করিতেই ভাল বাসিতেন। জনকল্লোল-মুখরিত সমৃদ্ধ সহর বা বিলাসবৈচিত্র্যময় রাজদরবার কখনও তাঁহার চিত্তা-কর্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। এক সময়ে তিনি বোগ্দাদের সুলতানের রাজসভায় আহূত হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তিনি যান নাই। বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত ও হাফেজের সম্পর্ক আছে। বঙ্গাধিপ সুলতান গিয়াসুদ্দীন সুশাসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বাধীনচেতা কাজির নিরপেক্ষ বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াসুদ্দীন যে প্রকৃত মহত্ত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয় পাঠকের অবিদিত নাই। গিয়াসুদ্দীন অত্যন্ত আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। কোন সময়ে দারুণ রোগগ্রস্ত হইয়া তিনি একখানি অদ্ভুত উইল লিখিয়া যান। উহাতে উল্লিখিত ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তিনজন নির্দ্দিষ্ট উপপত্নী তাঁহার মৃতদেহ ধৌত করিবেন। ভাগ্যক্রমে সুলতান অচিরে রোগমুক্ত হন। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীগণ উক্ত তিনজনকে "নোসালী" বা ধৌতকারিণী এই অসম্মানসূচক আখ্যা প্রদান করিয়া সর্ব্বদা উপহাস করিতে লাগিল। এই কথা গিয়াসুদ্দীনের কর্ণে পৌঁছিলে তিনি তৎক্ষণাৎ একটি কবিতার একটি মাত্র চরণ রচনা করেন, এবং অনেক চেষ্টা করিয়াও স্বয়ং তাহার আর পাদপূরণ করিতে পারিলেন না। গিয়াসুদ্দীন সাহিত্যের সমাদর করিতেন; তাঁহার রাজসভা পণ্ডিত ও কবিসমাগমে অলঙ্কৃত ছিল। সভাকবিগণও তদীয় ইচ্ছানুরূপ পাদপূরণ করিতে সক্ষম হইলেন না। হাফেজের নাম এই সময় দেশদেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। গিয়াসুদ্দীন বহুমূল্য উপহার-দ্রব্যসহ পাদপূরণের জন্ম উক্ত কবিতাপঙ্‌ক্তি সিরাজ নগরে কবিবর হাফেজের নিকট প্রেরণ করিলেন। পত্রবাহকের উপর এরূপও আদেশ ছিল যে, তিনি যে কোন প্রকারে কবিকে সন্তুষ্ট করিয়া যাহাতে তাঁহাকে

বঙ্গদেশে আনয়ন করিতে পারেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন। কথিত আছে, পত্রবাহক সিরাজে পৌঁছিলে, হাফেজ উপরোক্ত কবিতা রচনার আনুষঙ্গিক কোন ঘটনার বিন্দু বিসর্গও অবগত না হইয়াই কি যেন এক প্রকার দৈবশক্তি বলে উহার পাদপূরণ করিয়া দেন। বলা বাহুল্য উহা সম্পূর্ণরূপে গিয়াসুদ্দীনের অভিমত হইয়াছিল। তদনন্তর কবি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একটি কবিতা রচনা করেন। দিবানে এখনও ঐ কবিতা দৃষ্ট হয় এবং উহার শেষ-ভাগে সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে দেখিবার জন্ত কবির যে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল ও বঙ্গদেশ অতীব দূরবর্ত্তী বলিয়াই যে তিনি আসিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় আছে।

একবার হাফেজ দাক্ষিণাত্যের বাহমনী শাসনকর্ত্তা মহমুদ সাহ কর্ত্তৃক তাঁহার রাজদরবারে আহূত হন। এবার কিন্তু তিনি ঐকান্তিক অভ্যর্থনা প্রত্যাখ্যান করেন নাই। উক্ত রাজসভায় কিছুকাল বাস করিবার কল্পনায় তিনি সিরাজ ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করেন। সিন্ধুনদ পার হইয়া লাহোর অতিক্রম করিয়া তিনি হরমজ নামক স্থানে আসেন। মহমুদসাহ কবিকে আনিবার জন্ত যে সুসজ্জিত জাহাজ প্রেরণ করেন, তিনি এই স্থানে উহাতে আরোহণ করেন। কিন্তু সমুদ্র গমনে তিনি অত্যন্ত অনভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং শীঘ্রই সুযোগমত তীরে অবতরণ করিয়া সত্বর সিরাজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

হাফেজ সম্বন্ধে আর একটি গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একদিন তৈমুরলঙ্গ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। হাফেজের একটি কবিতার একস্থানে আছে যে, যদি কেহ তাঁহার প্রেমিকার গণ্ডস্থলের একটি কৃষ্ণতিল উঠাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে কবি তাঁহাকে বোখারা ও সমরকন্দ নামক সমৃদ্ধ সহর দুইটি প্রদান করিবেন। কবির সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তৈমুর রোষ-কষায়িত নেত্রে জিজ্ঞাসা করেন "যে ব্যক্তি প্রেমিকার কপোলস্থ তিলরেখা অপনয়নের জন্ত দুইটি মহানগরী প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, তুমি কি সেই হাফেজ।" মুহূর্ত্তমধ্যে কবি উত্তর করিলেন, "জাহাপনা!

আজ্ঞা হাঁ, আমি সেই ব্যক্তি এবং এইরূপ ভাবে দান করিতে করিতে এইরূপ অত্যন্ত দারিদ্র্যদশায় পতিত হইয়া আজ আপনার দয়ার ভিখারী হইয়াছি।” দুর্দ্ধর্ষ তৈমুরলঙ্গ এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ও ত্বরিত উত্তরে এতই প্রীত হইলেন যে, কবিকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়া সাদরে বিদায় দিলেন। ঐতিহাসিকতার হিসাবে এ গল্পের কোন মূল্য আছে কিনা বলা যায় না। যে বৎসর তৈমুর সিরাজ নগর আক্রমণ করেন, তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে হাফেজের মৃত্যু তারিখ নির্দ্ধারিত হয়। তবে সিরাজ আক্রমণকালে বা অন্য কোন স্থান অবরোধের সময় হাফেজের সহিত তৈমুরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিনা তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায় না।

১৩৯১ খৃষ্টাব্দে বা তাহার প্রাক্‌কালে হাফেজ দেহত্যাগ করেন। সিরাজের পশ্চিমোত্তর কোণে দুই মাইল দূরে হাফেজের সমাধিস্থান বহু রাজন্যের অযাচিত অর্থে সুসজ্জিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। পারস্যের সর্ব্ব স্থান হইতে যাত্রিকগণ তীর্থক্ষেত্রের মত ঐ পবিত্র স্থান দর্শন করিতেন। মহাজনের জন্মে, মরণে ও জীবনসংস্পর্শে ধরার নিমুক্তি ও অপার্থিব পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। মহাকবি হাফেজের জন্মে পারস্য ধন্য হইয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

---

# আহেরিয়া।

( ৩ )

কৃষ্ণা রাজস্থানের দুইটি বংশের অশান্তির আগুন নিভাইয়া আপনার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়া দিল। যদিও তাহাদের একটি রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু অপরটি আর একটির সহিত দগ্ধ হইয়া যায়। অম্বররাজবংশ রক্ষা পাইলেও বুন্দী ও মিবার কৃষ্ণার হৃদয়ের আগুনে পুড়িয়া ছারখার হইয়াছিল। পুষ্করের শুক্লাষ্টমীর ঘটনা বালিকা কৃষ্ণার হৃদয়ে অধিক দিন জাগিয়া না থাকিলেও রত্নসিংহের মন হইতে তাহা কদাচ মুছিয়া যায় নাই। রত্নসিংহ কৃষ্ণার সেই কমনীয় প্রতিমা হৃদয়ে স্থাপন করিয়াই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু রাণা সঙ্গের মত পিতার নিকট তিনি ইহা ব্যক্ত করিতে সাহসী হন নাই। তদ্ভিন্ন রত্ন মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণাই তাহার পিতামাতার নিকট পুষ্করের ব্যাপার বলিয়া ফেলিবে, এবং তাঁহারাই উদ্যোগ করিয়া কৃষ্ণার সহিত রত্নের বিবাহ প্রদান করিবেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণারও দশা ঘটিয়াছিল। সেও গুপ্ত পরিণয়ের কথা আপনার পিতামাতাকে বলিতে সাহসী হয় নাই। যখন তিনি শুনিলেন যে, সূর্য্যমল্লের সহিত কৃষ্ণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি ক্ষোভে ও রোষে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণার প্রতি তাঁহার ঘৃণার সঞ্চার হইল ও সূর্য্যমল্লের প্রতি তাঁহার প্রতিহিংসার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

সে সময়ে রাণা সঙ্গ জীবিত। রত্নসিংহ মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিলেন। রাণা সঙ্গ রত্নের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যমল্লের ভগিনী সুজাবাইএর সহিত রত্নের বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহসময়ে আবার কৃষ্ণার সহিত রত্নের সাক্ষাৎ হয়। আবার চারিচক্ষের মিলন হইল, রত্নের প্রতি কৃষ্ণার দীনদৃষ্টিতে রত্নের হৃদয়ে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

কৃষ্ণার প্রতি তাঁহার যে ঘৃণার ভাব জন্মিয়াছিল ; তিনি তাহা দূর করিলেন। বুঝিলেন কৃষ্ণার কোনও দোষ নাই। ভাগ্যচক্রে সে সূর্য্যমল্লের সহিত পরিণীতা হইয়াছে। ক্রমে রত্নের ক্রোধাগ্নি সূর্য্যমল্লের দিকে ধাবিত হইল। বিবাহের পর হইতে কৃষ্ণা দিন দিন শুখাইয়া যাইতেছিল, তাহার হৃদয়ের বেদনা সে ও মীরা ব্যতীত আর কেহই জানিত না। কেহ বুঝিতে পারে নাই কেন সে দিন দিন শুখাইতেছে। সূর্য্যমল্লের সহিত সে কথাও কহিত না, আলাপও করিত না, তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত যাইত না। সূর্য্যমল্ল প্রথম প্রথম কৃষ্ণাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও তাহার চিত্তে সন্তোষ দিতে পারেন নাই। ক্রমে তিনিও তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। কৃষ্ণা একাকিনী থাকিয়া আরও শুখাইয়া যাইতেছিল। সূর্য্যমল্লের মাতা কৃষ্ণাকে চিররুগ্না মনে করিয়া আবার পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিলেন। রত্নসিংহের ভগিনীর সহিত সূর্য্যমল্লের আবার বিবাহ হইল।

রাণা সঙ্গ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। রত্নসিংহ এক্ষণে মিবারের সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সঙ্গের জীবিতকালেই স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন, কাজেই সঙ্গের দেহত্যাগের পরই রত্নের মস্তকে মিবারের রাজছত্র ধৃত হইল। হায়! কৃষ্ণা যদি জানিত যে, রত্ন মিবারের সিংহাসনে বসিবেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া পিতামাতার নিকট পুষ্করের ঘটনা বলিয়া ফেলিত, বা মীরাকে দিয়া বলাইত। কে জানিত সঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিবেন ও রত্ন সিংহাসনে বসিবেন। যখন হইতে কৃষ্ণা জানিতে পারিল যে, রত্ন মিবারের রাণা হইবেন, তখন হইতে তাহার হৃদয়ের বেদনা আরও বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু সমস্তই অদৃষ্টের লেখা মনে করিয়া সে আপনাকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিত। রত্নসিংহ কিন্তু আগুন চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। রাণা হইয়া তিনি যখন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, তখন তাঁহার প্রতিহিংসার আগুন আরও প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু যাহাকে তিনি দগ্ধ করিতে চাহেন, তাহার সহিত নানাপ্রকার বন্ধনে তিনি বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখনই তাঁহার প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিত,

তখনই সুজাবাইএর ও তাঁহার আপন ভগিনীর কথা মনে পড়িত। কিন্তু কৃষ্ণার কথা মনে করিয়া তিনি আগুন একেবারে চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না।

এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। রত্নসিংহ মধ্যে মধ্যে বুন্দী গিয়া কৃষ্ণাকে দেখিয়া আসিতেন, ও তাঁহার মনের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। একবার বুন্দী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সুজাবাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তোমার দাদার প্রথম স্ত্রী ওরূপ শুখায়ে যাচ্ছেন কেন?"

"জানি না কেন? বিয়ের পর হইতেই তিনি ঐরূপ শুখায়ে যাচ্ছেন, তাইতে মা আবার দাদার বিয়ে দিলেন।"

"কেন শুখাচ্ছেন তোমরা কিছুই জাননা?"

"না আমরা কিছুই জানিনে।"

"ও সম্বন্ধে কোন কথাই শুন নাই?"

"লোকে বলে ওঁয়ার নাকি আর কাকে বিয়ে কত্তে ইচ্ছে ছিল।"

"কাকে, তা শুনেছ?"

"না তা শুনিনি।"

"তাই যদি ছিল তবে তোমার দাদা বিয়ে কল্লেন কেন?"

"দাদা কি জান্‌তেন?"

"তাঁর জানা উচিত ছিল?"

"সে কি কথা, তিনি কেমন ক'রে জানবেন। যাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁকেই জানাতে হত।"

"মেয়েমানুষ কি মনের কথা জানাতে পারে?"

"তবে দাদার দোষ কি?"

"তাঁরই সম্পূর্ণ দোষ, তাঁর খোজ খবর নিয়ে বিয়ে করা উচিত ছিল।"

সুজা বাই আর স্বামীর সহিত তর্ক করিতে ইচ্ছা করিলেন না, কারণ, তিনি জানিতেন, রত্নের ক্রোধাগ্নি সহজেই জ্বলিয়া উঠে। সুজার নিকট হইতে কৃষ্ণার কথা জানিতে পারিয়া রত্নসিংহের মনে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল। তিনি এতদিন ধরিয়া যাহা সহ্য করিয়াছিলেন, এখন তাহা আর পারিলেন

না। সূর্য্যমল্ল তাঁহার জীবনের শান্তি নষ্ট করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। সেই জন্য তিনি সূর্য্যমল্লকে এ জগৎ হইতে অপসারিত করিবার ইচ্ছা করিলেন। তজ্জন্য সুজাবাই বা আপনার ভগিনীর কথা বিবেচনা করিলেন না। তিনি সূর্য্যমল্লকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনার রাজধানীতে আনাইলেন। পরে তাঁহার সহিত আহেরিয়ায় যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। রাজপুতগণ বসন্তকালে যে মৃগয়া করিয়া থাকেন, তাহাকে আহেরিয়া কহে। এই আহেরিয়া বা বাসন্তী মৃগয়া রাজপুতদিগের একটি পর্ব্ববিশেষ। এই মৃগয়ামোদ উপভোগ করিবার জন্য রাজপুতনায় অনেক প্রকার আয়োজন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রত্নসিংহ সূর্য্যমল্লকে সেই আহেরিয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার মনে রহিল যে, সূর্য্যমল্লকেই আহেরিয়ায় মৃগস্থানীয় করিবেন। তাঁহার রাজধানীতে ঐরূপ ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে পাছে লোকে তাঁহার নামে কলঙ্ক প্রদান করে, সেই জন্য রত্নসিংহ আহেরিয়া উৎসবে সূর্য্যমল্লকে লইয়া চলিলেন। সূর্য্যমল্লের রাজ্য বুন্দীর সীমাতেই আহেরিয়া অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। তখন তাহার আয়োজনের জন্য মিবারে মহাধুমধাম পড়িয়া গেল।

( ৪ )

বসন্তকাল, বুন্দীর প্রান্তস্থিত শৈলমালা শ্যামলতায় আপনাদের নীল কলেবর ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বৃক্ষগুলি নবীন পত্রে সাজিয়া আবার যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। সমতলক্ষেত্রসমূহ নবীন তৃণে ভূষিত হইয়া শ্যামশালিচাবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। নানাপ্রকার বনফুলের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত, তাহাদের সৌন্দর্য্যও চক্ষুর তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে। নানাবিধ পক্ষিকুজনে অরণ্যানী মুখরা। অদূরে স্বচ্ছসলিলা চর্ম্মন্বতী তরতর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। এই সুন্দর পার্ব্বত্য অরণ্য রাজপুত দিগের মৃগয়ার একটি উপযুক্ত স্থান। এখানে পশুরাজ সিংহ হইতে ক্ষুদ্রকলেবর শশক পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, ভল্লুক, মহিষ, শৃগাল ও বহুবিধ হরিণ আপন মনে তথায় বিচরণ করে। রাজপুতগণ মৃগয়ার জন্য সমবেত হইয়া যখন ঢকাধ্বনিতে সমস্ত

বনস্থলী কম্পিত করিয়া তুলে, সেই সময়ে ঐ সমস্ত পশু ভীত ও চকিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। সেই সুন্দর বনমধ্যে পশুদিগের ইতস্ততঃ যাতায়াত দেখিয়া রাজপুতগণ পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে, আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাহারা আপনাদের অহিফেনসেবন পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। এমন কি এই মৃগয়ামোদ ভোগ করিতে করিতে তাহারা আপনাদের ঘরসংসারও বিস্মৃত হয়। আহেরিয়া উৎসবে মত্ত হইয়া তাহারা কখনও কখনও যুদ্ধের কথাও ভুলিয়া যাইত। এই বাসন্তী মৃগয়া রাজপুত-জীবনের একটি প্রধান আনন্দের সামগ্রী।

রাণা রত্ন ও সূর্য্যমল্ল আহেরিয়া উৎসবে মত্ত হইয়া চর্ম্মন্বতীর পশ্চিম তীরের নিকট নন্দতা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই স্থানই মৃগয়ার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইল। রাণা ও বুন্দীরাজ মৃগয়ার জন্য এক একটি স্থান বাছিয়া লইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুই এক জনমাত্র বিশ্বস্ত অনুচর রহিল। তাঁহাদের সৈন্য ও অন্যান্য লোকজন এদিকে ওদিকে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ঢক্কাধ্বনিতে প্রথমে মৃগকুল বনমধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল, তাহার পর রাজানুচরেরা তাহাদিগকে তাড়িত করিতে লাগিল। তাহাদের তাড়নায় ও কোলাহলে পশুগুলি প্রমাদ গণিয়া এদিক ওদিক পলায়ন করিবার আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটি বাণবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িতেছিল। ঐ সিংহ যাইতেছে, ঐ ভল্লুক দৌড়াইল ও হরিণ আসিতেছে এইরূপ শব্দে বনমধ্যে একরূপ কলরবের সৃষ্টি হইল। রাণা বুন্দীরাজ ও তাঁহাদের অনুচরগণ মৃগয়া করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিলেন। সকলেই মৃগয়ামোদে মত্ত, কিন্তু রাণা রত্নসিংহ কেবল সূর্য্যমল্লকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুন দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে, সেই জন্য তিনি আহেরিয়া উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন নাই। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, মৃগয়া শেষ হওয়ার উপক্রম হইল, রত্নসিংহ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, বুঝি তাঁহার সমস্ত সংকল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।

এই সময়ে সূর্য্যমল্ল মৃগ অন্বেষণে একাকী রাণা ও তাঁহার অনুচরগণের সম্মুখীন হইলেন। রত্নসিংহ তাঁহার একজন অনুচরকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "পুরবিয়া, বরাহ শিকারের এই উপযুক্ত সময়।" এই পুরবীয় সর্দ্দারের পিতাকে সূর্য্যমল্ল কোন কারণে হত্যা করিয়াছিলেন। পুরবীয় রাণার ইঙ্গিত পাইবামাত্র একটি শর সূর্য্য মল্লের প্রতি নিক্ষেপ করিল। সূর্য্যমল্ল তাহা দেখিতে পাইয়া আপনার ধনুকের দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, শরটি বুঝি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার দিকে আসিয়াছে। কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ রাণার আর একটি অনুচরের নিক্ষিপ্ত শর তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। এ অনুচরটি রাণার ধাত্রীপুত্র। সে শরটিও সূর্য্যমল্ল ক্ষিপ্রহস্তে নিবারণ করিলেন, এবার তাঁহার হৃদয় সন্দেহে দোলায়মান হইয়া উঠিল। ধাত্রীপুত্রের শর নিবারণ করিতে না করিতে রত্নসিংহ স্বীয় অশ্বকে সূর্য্যমল্লের দিকে ধাবিত করিলেন ও মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সূর্য্যমল্লের প্রতি শাণিত তরবারি চালিত করিয়া কহিলেন, "এই আহেরিয়ার শেষ।" তরবারির আঘাতে বুন্দীরাজ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, রুধিরধারায় তাঁহার অঙ্গ ও ভূমিতল প্লাবিত হইয়া গেল। অশ্বটি ভীত হইয়া কোন্ দিকে চলিয়া গেল। রাণা রত্ন সেখানে উপস্থিত থাকা যুক্তিযুক্ত নহে মনে করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন, অশ্ব দ্রুতবেগে তাহাকে লইয়া ছুটিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরদ্বয়ও ধাবিত হইল। সূর্য্যমল্ল তথায় অজ্ঞান হইয়া একাকী পড়িয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি আপন গাত্রের শাল দ্বারা ক্ষতস্থান বাঁধিয়া ফেলিলেন, ও দেখিলেন রাণা দূরে পলায়ন করিতেছেন। সূর্য্যমল্ল রাণাকে পলাইতে দেখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন "হা কাপুরুষ, এখন তুমি পলাইয়া যাইতেছ? তোমা হইতেই মিবারের গৌরব চিরদিনের জন্ত ডুবিল।"

রাণার অনুচর পুরবীয়ের কর্ণে বুন্দীরাজের কথা কয়টি গেল, সে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, সূর্য্যমল্ল ক্ষতস্থান বাঁধিতেছেন। তখন সে রাণাকে ডাকিয়া

কহিল, "মহারাজ, কাজটা আধাআধি হইল, এখন উহা শেষ করা উচিত," রাণা দেখিলেন, সূর্য্যমল্ল উঠিয়া বসিয়াছেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার আপনার অশ্বকে তাঁহার প্রতি ধাবিত করিলেন; অশ্ব বুন্দীরাজের নিকটে পঁহুছিল। রাণা তাঁহার প্রতি আপনার বর্শা উদ্যত করিলেন। কিন্তু সূর্য্যমল্ল তখনও বলহীন হন নাই, তাঁহার শরীরে তখনও পর্য্যন্ত হার-রক্ত বহিতেছিল। তিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া রাণার গাত্রবস্ত্র ধরিয়া ফেলিলেন ও তাঁহাকে অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পাতিত করিলেন। পরে রাণার বক্ষের উপর জানু স্থাপন করিয়া এক হাতে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিলেন, ও অপর হাতে কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া রাণার বক্ষে বসাইয়া কহিলেন, "তখন আহেরিয়ার শেষ হয় নাই, এখন, হইল!" রাণা বিকট চীৎকার করিয়া সূর্য্যমল্লের চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ুও বাহির হইয়া গেল। এই উদ্যমের জন্য সূর্য্যমল্লের ক্ষতস্থান হইতে আবার রক্ত ছুটিল, এবং তিনিও প্রতিযোগীর শবদেহের উপর পতিত হইয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

এইরূপে আহেরিয়া উৎসব সমাপ্ত হইল। রাণা রত্ন ও সূর্য্যমল্ল আপন আপন জীবন দান করিয়া আহেরিয়া শেষ করিলেন। যে আগুন রত্ন এতদিন হৃদয় মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-দীপের সঙ্গে আজ তাহাও নির্ব্বাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যমল্লও তাহাতে পুড়িয়া মরিলেন। হায় কৃষ্ণা, তোমারই ভ্রমের জন্য আজ বুন্দী ও মিবার ছারখার হইয়া গেল। তুমি রাজপুতনার দুইটি বংশের অশান্তির আগুন নিভাইয়া আপনার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়াছিলে, কিন্তু তাহাতেই যে বুন্দী ও মিবার পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তোমার সামান্য ভ্রমে আজ এই মহানর্থ সংঘটিত হইল। রাণা ও বুন্দীরাজের শবদেহ সেই খানেই পড়িয়া রহিল। রাণার অনুচরগণ তথা হইতে পলাইয়া গেল। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। তাহাদের অন্যান্য লোকজন ও সেনাগণ তাঁহাদের অন্বেষণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাদিগের শব-দেহ দেখিতে পাইল। উভয়ের তথাবিধ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া তাহারা

হাহাকার করিতে লাগিল। আজ আহেরিয়ায় আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল, তাহারা সকলে কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কেন এমন হইল, কেহই বুঝিতে পারিল না। পরে অনুসন্ধানে বুঝিল যে, তাঁহারা উভয়েই পরস্পরের জীবন শেষ করিয়াছেন। প্রথমে তাহারা মনে করিয়াছিল, বুঝি আহেরিয়ায় মৃগ লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকিবে। কিন্তু মদনের মৃগ যে এরূপ ঘটাইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, একটী সোণার মৃগের জন্যই এই আহেরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বুন্দী ও মিবারে এই শোচনীয় আহেরিয়ার সংবাদ পৌছিল। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বুন্দীরাজমাতা শোকে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি সুজো মরিয়াছে, সে কি একাকাই মরিয়াছে, সেত কখনও এ পৃথিবী হইতে একাকা যায় নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, ও দর দর বেগে ক্ষীরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। পরে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সূর্য্যমল্ল প্রতিশোধ লইয়াই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তখন তিনি কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। সূর্য্যমল্ল তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলেন, তিনি বৈধব্যদশায় পতিত হইয়া তাঁহাকে অন্ধের যষ্টি করিয়াছিলেন। পুত্রও রূপেগুণে রাজস্থানে বিখ্যাত ছিলেন, হারবংশ সূর্য্যমল্লের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার যে অপরিমিত বল ও অদ্ভুত সাহস ছিল, তাহা তিনি মৃত্যুকালেও দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। এরূপ পুত্রের অকালমৃত্যুতে বুন্দীরাজমাতা যে বিহ্বল হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি। তিনি যে কেবল পুত্রশোকে বিহ্বল হইলেন এমন নহে। কিন্তু রত্নসিংহের মৃত্যুতে তাঁহাকে যে আপনার কন্যাটিও বিসর্জ্জন দিতে হইবে তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন যে, বুন্দী ও মিবার দুই বংশের সোণার সংসার কাল আহেরিয়ার জন্য ছারখার হইয়া যাইবে।

কিছুদিন হইতে কৃষ্ণার অসুখ বাড়িয়াছিল, তাহাকে দেখিবার জন্য মীরা আসিয়াছে। মীরার এখন দুই তিনটি সন্তান। ছোট ছেলেটিকে লইয়া মীরা বুন্দীতে আসিয়াছিল। কৃষ্ণা রুগ্নশয্যায় শুইয়া তাহাকে লইয়া আদর

করিত, মধ্যে মধ্যে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। মীরা আসিয়া দেখিল, কৃষ্ণার জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অধিক দিন যে সে এ জগতে থাকিবে, তাহার আশা নাই। যেদিন কাল মৃগয়ার কথা বুন্দীতে পৌছিল, সেদিন মীরা কৃষ্ণার পাশে বসিয়া তাহার সহিত দুটি একটি কথা কহিতেছিল। কৃষ্ণা বলিতেছিল,—

"ভাই এখন শীঘ্র ছুটি হইলে বাঁচি।"

মীরা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিল,—

"ছুটি ত হয়েছে, বাঁকী কি আর আছে? সেই রত্নসিংহ ত রাণা হইলেন, তবে তুমি এমন সর্ব্বনাশ করিলে কেন?"

কৃষ্ণা কপালে হাত দিয়া কহিল, "সবই বিধাতার লিখন।"

তাহাদের এইরূপ কথোপকথনের সময় বুন্দীরাজবাটীতে সংবাদ পৌছিল যে, সূর্য্যমল্ল ও রত্নসিংহ আহেরিয়ায় পরস্পরের জীবন শেষ করিয়াছেন। যেখানে কৃষ্ণা ও মীরা ছিল, সেখানেও সংবাদ গেল। সংবাদ শুনিয়া কৃষ্ণা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তাহার সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। মীরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, সে ধূলাতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া সকলে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কৃষ্ণার জীবনদীপ নিবিয়া গিয়াছে। মীরা কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—

"কৃষ্ণা, তুই যদি ভুল না কত্তিস, তাহলে তোরও এদশা ঘটত না; আর মিবার ও বুন্দী ছারখার হত না।"

সকলে মীরার কথা শুনিয়া অবাক্ হইল ও ক্রমে বুঝিতে পারিল যে, কৃষ্ণার জন্যই কাল আহেরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

রত্নের ভগিনী স্বামীর সহগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি শ্বশ্রূর চরণে প্রণাম করিয়া "তাঁহার আদেশ চাহিলেন। রাজমাতা কহিলেন, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক", পরে তিনিও তাঁহার সহিত মৃগয়াস্থানে যাইবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। বুন্দীর সকলে তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সমস্ত উদ্যোগ শেষ হইলে, তাঁহারা নন্দতায় গমন করিলেন। যেখানে সূর্য্যমল্ল ও

রত্নসিংহের দেহ পড়িয়াছিল, তাঁহারা সকলে তথায় উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যমল্লকে দেখিয়া রাজমাতা একবার তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন, কহিলেন, "বাপ সুজো! তুমি এত শীঘ্র আমাকে ফেলিয়া চলিলে? মা শাকম্ভরি, তোমার মনে এই ছিল?" তাহার পর তাঁহার হস্ত হইতে সকলে সূর্য্যমল্লের দেহ কাড়িয়া লইল। রাজমাতা ভূতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সূর্য্যমল্লের মহিষীও কাঁদিয়া সকলকে ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। ক্রমে শবদেহের সংকারের ও সহগমনের আয়োজন হইতে লাগিল, এমন সময়ে মিবার হইতে সংবাদ আসিল যে, মহিষী সুজাবাইও সহগমনে আসিতেছেন। তখন সুজাকে দেখিবার জন্য রাজমাতা একটু আশ্বস্ত হইলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সমাগত না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সংকার হইবে না স্থির হইল, কিন্তু তাহার আয়োজন চলিতে লাগিল।

মিবারে এই সংবাদ পৌঁছিলে সুজাবাই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই আহেরিয়ায় ফল ভাল হইবে না। রাণা রত্নের ক্রোধ যে সূর্য্যমল্লের প্রতি ফুটিয়া উঠিতেছিল, সুজাবাই তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ক্রমে যখন তিনি শুনিলেন যে, কৃষ্ণার জন্য এই রক্তপাত ঘটিয়াছে, তখন তিনি আরও ব্যস্ত হইলেন। মীরার ঐ কথা প্রকাশের পর বুন্দী ও মিবারে আহেরিয়ার রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সুজাবাইও তাহা শুনিতে পান। তখন তাঁহার মনে হইল যে, রত্নসিংহ কেন তাঁহাকে কৃষ্ণার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেনই বা সূর্য্যমল্লের প্রতি তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হইতেছিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "ইহাই যদি ঘটিয়াছিল, তবে কৃষ্ণা কেন মিবারের মহিষী হইল না? আমি চিরদিন তাহার সেবা করিয়া রাণার মনস্তুষ্টি করিতাম। কেন সে বুন্দীতে গিয়া দুইটি সংসার পোড়াইয়া ছারখার করিল?" তাহার পর তিনি রাণার সহগমনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, গুরুজন দিগের নিকট হইতে আদেশ লইয়া আহেরিয়াক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, এবং পূর্ব্বে তথায় সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। সুজাবাই শুনিলেন যে, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃবধূ তথায় আসিয়াছেন, এবং ভ্রাতৃবধূও সহগমনে

যাইবেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পাঠাইলেন, ক্রমে ক্রমে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া রত্ন সিংহের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন।

চিতা সজ্জিত হইল। একটিতে রত্নসিংহের অপরটিতে সূর্য্যমল্লের দেহ উঠিল। সুজাবাই ও রত্নের ভগিনী আপন আপন স্বামীর চিতায় উঠিয়া বসিলেন। ক্রমে তাহাতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহার শিখা আকাশে উত্থিত হইল। দূর হইতে লোকে অনুমান করিল, দাবানলের সঞ্চার হইয়াছে। বুন্দীরাজমাতাকে লইয়া সকলে তথা হইতে অপসৃত হইল। যেখানে দুই সতী সহগমন করিয়াছিলেন, তথায় এক একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। সুজাবাইয়ের স্মৃতিস্তম্ভ উপত্যকার শিরোদেশ শোভা করিয়া আজিও সেই কাল আহেরিয়ার কথা সকলের মনে জাগাইয়া দিতেছে।

# লিখন-প্রণালী।*

## সূচনা।

প্রত্যেক শ্রেণীর সাহিত্যই বহুদিন এক অদ্ভুত অভাবের মধ্য দিয়া গঠিত হইয়াছে। বহুদিন পর্য্যন্ত লিখন-প্রণালী অনাবিষ্কৃত থাকায় লিখন-যন্ত্রের অভাব ভোগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়গণ ইহাতে অভাব বোধ করিতেন না। লিখন-যন্ত্র আবিষ্কৃত বা তাহার উপকরণ সহজপ্রাপ্য হইলেও তাঁহারা তাহা ব্যবহার করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। জগতের ইতিহাসে তাঁহাদের এই অবস্থা একরূপ অদ্বিতীয়, কাজেই তৎসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা বিরক্তির কারণ হইবে না।

লিখনের প্রাচীনতম উল্লেখ—'শিলা' নামক এক পদার্থের উপর; সুতান্তার Suttantar প্রথম সর্গের প্রথম অধ্যায়ে মহাত্মা বুদ্ধদেবের তেরটি বাক্যাবলী লিখিত আছে। বুদ্ধের মহানির্ব্বাণের পর এক শতাব্দী মধ্যে বুদ্ধ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক শিলায় লিখিত অংশ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে গ্রথিত হইবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই

* রিজ ডেভিড মহোদয়ের 'Budhist India' নামক গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত এবং 'রাজসাহী সাহিত্য সভায়' পঠিত।

ডেভিড মহোদয় পাশ্চাত্য সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার গ্রন্থে ভারতীয় ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিকৃত ভাবে আলোচিত এবং প্রকাশিত হইলে, তদ্দ্বারা এতদ্দেশের সুনামের ও সুযশের বিনাশের যথেষ্ট আশঙ্কা করা যায়। তজ্জন্য রাজসাহী সাহিত্য সভার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত শশধর রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের অনুরোধে, ভারতীয় লিপি প্রণালী আবিষ্কারের যথার্থ কাল নির্ণয় করিয়া, ডেভিড মহোদয়ের মতকে খণ্ডন করিতে দেশীয় সাহিত্যসেবিগণকে আহ্বান করা হয়। বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

সভায় এই প্রবন্ধ পাঠের পর স্থানীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্তভূষণ মহাশয় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বহুতর প্রমাণ উদ্ধৃত করতঃ এক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়া উক্ত সভায় পরবর্ত্তী অধিবেসনে পাঠ করেন। পণ্ডিত মহাশয়ের এ প্রবন্ধও আমরা 'ঐতিহাসিক চিত্রে' প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিব। লেখক।

শিলার লিপি বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ পুস্তকাকারে সুতস্তা গ্রথিত হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধের উপদেশাবলী শিলার উপর লিখিত হয়। অনুমান ৪৫০ খৃঃ অব্দে শিলার উপর ঐরূপ লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের যে সকল কার্য্য করা নিষিদ্ধ, তাহা ঐ শিলাতে লিখিত আছে। ইহাতে অনেকগুলি ক্রীড়ারও নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটির নাম—'অক্ষরিকা'। রিজ ডেভিড্ মহোদয় তাঁহার Dialogues of the Budha নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উক্ত ক্রীড়ার অর্থ লিখিয়াছেন,—"শূন্য আকাশে বা ক্রীড়া-সঙ্গীর পৃষ্ঠে অক্ষরের অবয়ব কল্পনা করা" * বালকদিগের এইরূপ ক্রীড়া এবং ক্রীড়ার নাম অক্ষরিকা রাখা—এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে তৎকালে দেশের লোকের বর্ণ-জ্ঞান পরিচয় খুব বেশী ছিল না।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সংগৃহীত ধর্ম্ম বিধির ( Common law ) সাধারণ নাম—বিনয়, দুই তিন পুরুষের পরিবর্ত্তন ফলে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই 'বিনয়' গ্রন্থে লিখন-প্রণালীর কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ( বিনয় ৪,৭ )।

বৌদ্ধ-সাহিত্যে 'লেখা' উৎকৃষ্ট শিল্প বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। বৌদ্ধ মতানুসারে জগতের যাবতীয় শিল্প-কর্ম্ম হইতে বিরত হইবার উপদেশ থাকিলেও তাহাতে 'বর্জ্জিত বিধির' অসদ্ভাব নাই। এই বর্জ্জিত বিধির একটি বিধান—'লেখা' শিল্প শিক্ষা করা যাইতে পারে। বালকের কি কার্য্য করা উচিত, তদালোচনা প্রসঙ্গে বালকের জনক বলেন যে, সে যদি লেখকের ব্যবসায় আরম্ভ করে, তবে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে ; কিন্তু পক্ষান্তরে তাহার অঙ্গুলীগুলি ব্যথিত হইবে। ভিক্ষুশ্রেণীর কেহ যদি কোন ব্যক্তিকে আত্ম-হত্যার সুযোগ ও সুবিধাবিষয়ক লেখ্হাম ( ছন্দতি ) লিপি পাঠায়, তাহা হইলে ঐ লিপিতে যতটি অক্ষর থাকিবে, লেখক ততটি অপরাধে অপরাধী। †

* Akkharika ( Lettering ). Guessing at letters traced in the air, or on a play fellow's back."

† "The expression used for writing.' is here *lekham chindati* „

এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত কথা যখন রচিত হয়, তখন লিখন-প্রণালী পরিজ্ঞাত ছিল; রাজকীয় সংবাদাদি লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইত ও অপরাপর ব্যক্তিগণের মধ্যে চিঠি পত্রাদি লেখালিখি চলিত। সুদক্ষ লেখক হইতে পারিলে তৎকালে জীবিকার্জ্জনের সুবিধা ছিল এবং কোনও জাতি বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে লিখন ব্যবসায় সীমাবদ্ধ থাকিত না। জনসাধারণ এমন কি রমণীগণের মধ্যেও তাহা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এইরূপ বিস্তার হেতু লিখনব্যাপারের উপর বালকগণের ক্রীড়া-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে লিখন-প্রণালীর এই অবস্থা এবং যখন উহা প্রথম সূচিত হয়, তৎকালের অবস্থা,—এই দুই অবস্থার মধ্যে বিস্তর সময় ব্যবধান। আর রাজকীয় শাসন ঘোষণাদি লিখিত ভাবে প্রচারিত হইবার পর বহুদিন গত হইলে, সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে পুস্তকাদি রচিত কিংবা কোন বিস্তৃত সাহিত্য গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত উদাহরণ হইতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে লিখন-প্রণালী অজ্ঞাত না থাকিলেও, অনেকে লিখিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, সে সময়ে কোন পুস্তকাদি লিখিত হইত না। যদি তৎকালে তদ্রূপ লিখার সূত্রপাত হইত বা কেহ লিখিয়া থাকিত তবে তাহা হইতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক জীবনের অনেক মূল্যবান নিদর্শন পরিজ্ঞাত হওয়া যাইত। বৌদ্ধ মণ্ডলীর যে শাসননীতি বর্ত্তমান কালে দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্দ্বারা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়, কোন্ কোন্ বস্তু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি এবং কোন্ কোন্ জিনিষই বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিশেষের ( personal property )। প্রত্যেক অস্থাবর পদার্থ এমন কি গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য ক্ষুদ্র বাসন পত্র পর্য্যন্তের উল্লেখ এবং তাহার ব্যবহার বিধি উক্ত শাসন নীতিতে পরিদৃষ্ট হয়। অন্যান্য লোকে যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করে এবং যাহা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ স্পর্শ করিতে পারে না, নিষিদ্ধ দ্রব্য স্বরূপে তাহারও উল্লেখ আছে। কিন্তু কুত্রাপি একখানি পুস্তক বা পাণ্ডুলিপির নাম মাত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

—'Scratches a wriiing.' From this Buhler concludes that the material implied is wood. But the reference is to scratching with a style on a leaf."
—Budhist India.

সুতরাং ব্যাবর্ত্তক প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, তৎকালে পুস্তক লিখিবার প্রণালী অনুসৃত হয় নাই ; কিন্তু প্রবর্ত্তক প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় বিধানাবলী কিংবা অনুশাসন বিদ্যমান থাকার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু সে সকল পুস্তকাকারে না থাকায় লোকের মুখে মুখেই থাকিত। নিম্নে তাহার কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

অঙ্গুত্তরায় (৩,১০৭) বিধান আছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সুন্দর ক্ষুদ্র লালিত্যপূর্ণ পদ্যে সুতান্তা শুনিলেই তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক মুখস্থ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু গভীর তত্ত্বকথা পূর্ণ বা দার্শনিক গ্রন্থাদির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিত। তজ্জন্য উক্ত গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির চারিটি কারণের মধ্যে একটির এইরূপ উল্লেখ আছে যে,—যে সব ভিক্ষুরা বহুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা পরম্পরাগত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্ব এবং বৌদ্ধ বিধান সমূহ ও তাহার সূচী আপন স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিয়াছেন, তাঁহারা অপর ভিক্ষুকে ঐ সকল শিক্ষা দিতে যত্নবান না হইতে পারেন। সেরূপ স্থলে তাঁহাদের অভাবে সুতান্তার মূলই কর্ত্তিত হইবে অর্থাৎ চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।

উক্ত অঙ্গুত্তরা গ্রন্থেই (৫,১৩৬) যে সকল উপায়ে মনোবৃত্তির উন্নতি ও বর্দ্ধন হইতে পারে তাহার একটি তালিকা আছে। তন্মধ্যে একটী উপায়—শিক্ষা, পাণ্ডিত্য, এস্থলে ইহা স্বভাবতঃই মনে হইবে, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ঐ উপায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই, তৎপরিবর্ত্তে লিখিত আছে যে, ধর্ম্মবিধান সকল পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে হইবে। এই রকম উক্তি এক্ষেত্রে অতি মূল্যবান। কারণ ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, স্মরণশক্তিই শিক্ষার মূলরূপে বিবেচিত হইত এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিই বিস্মৃত না হইবার উপায় রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সে সময় পুস্তক-লিখন-প্রণালী বিদ্যমান থাকিলে, এইরূপ বিধান নির্দ্দেশিত হইত না।

বৌদ্ধধর্ম্ম-বিধিতে আমরা এইরূপ দুইটি অনুশাসন দেখিতে পাই। বিনয়-পিটকের (১,২৬৭) লিখিত আছে যে, প্রত্যেক ভিক্ষু-আশ্রমে প্রতিমাসে

অন্ততঃ একবার প্রাতিমোক্ষের ২২৭টি নীতি আবৃত্তি করিতে হইবে। যদি কোন আশ্রমের কাহারও মনে 'প্রাতিমোক্ষের' সূত্র না থাকে, তবে তাহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠকে নিকটবর্ত্তী আশ্রমে যাইয়া তাহা মুখস্থ করিয়া আসিতে হইবে। *

ইহার পরেই আর একটি অনুশাসন পাওয়া যায়, তাহাতে বৌদ্ধগণ বর্ষাকালে পর্য্যটনে বাহির হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু বর্জ্জিত বিধির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি সম্প্রদায়ের কাহাকেও বলিয়া পাঠান যে, "অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া এই সুত্তান্তাটি শিখিয়া যান, নতুবা তাহা একবারে বিলুপ্ত হইবে," তবে এইরূপ গুরুতর কার্য্যব্যপদেশে বর্ষাকালেও ভিক্ষু স্থানান্তরে যাইতে পারিবে। *

এই সকল উক্তি এবং এবম্প্রকার আরও বহুতর অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, তৎকালে সুত্তান্তা ও লিখিয়া রাখিবার কথা কাহার মনে উদিত হয় নাই। সম্পূর্ণ সুত্তান্তা লিখিয়া রাখিলে ৬।৭ শত সূত্রের অধিক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইত। কিন্তু তাহা লিপিবদ্ধ করিবার বিষয় কেহই চিন্তা করেন নাই। যে সুত্তান্তা বিলুপ্তির আশঙ্কায় তাঁহারা বর্ষাকালেও স্থানান্তরে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহা লিখিয়া রাখিলে যে ধ্বংসমুখে পতিত হইতে পারে না, তাহাও তাঁহাদের মনে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে আমরা জানিতে পারি, বৌদ্ধ জগতের এই অবস্থার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয়গণের নিকট বর্ণ (অক্ষর) এবং লিখন-প্রণালী পরিচিত ছিল, এবং অন্য লিখার আবশ্যক হইলে প্রায়শই তাঁহারা উহার ব্যবহার করিতেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বৌদ্ধগণ পূর্ব্বোল্লিখিত অতি প্রয়োজনীয় স্থানেও লিখন-প্রণালী ব্যবহার করিতেন না। এসম্বন্ধে দ্বিবিধ কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতীয়গণের মানসিক উন্নতি সাধিত হইবার পর বহুবিলম্বে লিখন-প্রণালী দেশে প্রবর্ত্তিত হয়। উহার প্রথম কারণ এই যে, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই অন্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। লিখন-প্রণালীর আবশ্যকতা পরবর্ত্তী বংশীয়গণের জন্য। এই আবশ্যকতা ভারতীয়েরা অন্ত উপায়ে এত সুন্দর ভাবে সুসিদ্ধ

* Vinaya Texts, I. 305.

করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত করেন যে, সেই সুপরিচিত পূর্ব্ব প্রণালীর ( আবৃত্তি ও স্মৃতি ) পরিবর্ত্তে সহজে নবাগত অপরিচিত প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক হন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছা করিলেও তাহা করিতে পারিতেন না। কারণ যৎকালে তাঁহারা এই বিষয় অবগত হন, তৎকালে বিস্তৃত বিষয় লিখিবার প্রয়োজনীয় উপকরণ তাঁহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল।

তাঁহাদের লিখন-প্রণালীর সূচনা সময়ের এই কয়েকটি বিস্ময়কর বিষয় আমরা অল্পদিন হইল জানিতে পারিয়াছি। ভারতবর্ষে লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার কাল-নির্ণয়ের ত্রিবিধ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এই ত্রিবিধ প্রমাণমূলেই একই সময় সূচিত হইতেছে। এই সময়টা জানিতে পারিলে এ বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা হইতে পারে।

প্রথম প্রমাণ—পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি সমূহ। এতদ্দ্বারা ভারতীয় সাহিত্যে লিখন-প্রণালীর প্রাচীতম উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রমাণের আবিষ্কর্ত্তাস্বরূপ সর্ব্ব প্রথম অধ্যাপক ওয়েবর এবং পরে Hofrath Dr. Buhler প্রশংসার পাত্র। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, ভারতের প্রাচীন অক্ষরমালার কতক অংশ আসিরিয় কোন কোন মানের ( বাটখারা ) উপরের লিখিত লিপির সহিত এবং সপ্তম ও নবম শতাব্দীর তথাকথিত 'মেশা-লিপির' সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য। ঐ সময়ের উত্তর সেমিটিক্ বর্ণমালার ২২টি অক্ষরের সাতটি অক্ষর তৎকালীন ভারতের প্রাচীন বর্ণমালার সহিত একরূপ; এবং আর সাতটি অক্ষর উভয় প্রদেশেরই প্রায় একরূপ। অবশিষ্ট সাতটি লিপিও অতি কষ্টে ঐক্য করা যাইতে পারে। অপরাপর পণ্ডিতগণ দক্ষিণ সেমিটিক্ বর্ণমালার সহিত ভারতীয় অক্ষরমালার সাদৃশ্য প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা পূর্ব্বোক্তের ন্যায় সন্তোষজনক নহে। এই উভয় লিপি আলোচনা করিয়া ওয়েবর এবং বুল্হার স্থির করিয়াছেন যে, উত্তর সেমিটিক্ অক্ষরমালা হইতে ভারতীয় অক্ষরমালা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পক্ষান্তরে Dr. Deecke Isac টেলার এবং অপরাপর পাশ্চাত্য সুধীগণ স্থির করিয়াছেন

যে, দক্ষিণ আরেবিয়ার দক্ষিণ সেমিটিক্ অক্ষরমালা হইতে ভারতীয় অক্ষরমালা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ আরবে উপকূল-পথে প্রত্যক্ষ সংস্রব থাকা একান্ত অসম্ভব নহে, কিন্তু উক্ত দুই স্থানের অক্ষরমালার সহিত সাদৃশ্য অতি অল্প। অথচ ভারতবর্ষের সহিত প্যালেস্টাইনের প্রান্তবর্ত্তী মেশা লিপিকারগণের প্রত্যক্ষ সংস্রব থাকার কথা কেহই বলেন না এবং অপেক্ষাকৃত অসম্ভবও বটে; তথাপি মেশা-লিপির সহিত ভারতীয় লিপির বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য আমার মনে হয় যে, উত্তর দক্ষিণ কোনও সেমিটিক্ অক্ষরমালা হইতেই ভারতীয় বর্ণ উদ্ভূত হয় নাই; ইউফ্রেটিস্ উপত্যকার সেমিটিকের পূর্ব্ববর্ত্তী লিপি-প্রণালী হইতে ভারতীয় ও সেমিটিক্ উভয় বর্ণমালাই সমুদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ভারতের অক্ষরমালা প্রবর্ত্তনের কাল-নির্ণয়-প্রসঙ্গে ডেভিড্ মহোদয় বলিয়াছেন,—যে সময়ের বিদেশপ্রবর্ত্তিত বর্ণমালার সহিত ভারতীয় বর্ণমালার একতা অত্যন্ত অধিক, সেই সময়ে উহা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইউ-ফ্রেটিস্ ভ্যালির উপরোক্ত বর্ণমালা খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে যে আকারে লিখিত হইত, সেই আকারের সহিত ভারতীয় প্রাচীন বর্ণমালার সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক, সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন বর্ণমালা সপ্তম শতাব্দীর উক্ত বর্ণমালা হইতেই গৃহীত। পরবর্ত্তী ব্যাবিলোনীয় অথবা সেমিটিক্ বর্ণের সহিত ভারতীয় বর্ণমালার বিশেষ ঐক্য দেখা যায় না, এবং মনে রাখিতে হইবে যে, মূল-লিপি যখন দক্ষিণ (ডা'ন) হইতে বামদিকে লিখা হইত, তাহারও পূর্ব্বে ভারতীয় লিপি উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; কারণ ভারতীয়গণ বাম হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিয়া থাকে। কেবল একটি মুদ্রাতে* এবং সিলোনের অমুদ্রিত কএকটি প্রস্তর লিপিতে† দক্ষিণ হইতে বাম দিকে লেখনী চালনা করার প্রমাণ

* ব্রিটিশ মিউজিয়মে মুদ্রাদি রক্ষিত আছে। কানিংহামের Coins of Ancient India পুস্তকে ইহার বিবরণ ও চিত্র প্রকত হইয়াছে।

† Journal of the Royal Asiatic Society, 1895.

দেখা যায়। তৃতীয় শতাব্দীর কএকটি অক্ষর শ্রেণীও সম্ভবতঃ পশ্চাৎ দিক্ (দক্ষিণ) হইতে পঠিত হইবার অভিপ্রায়ে লিখিত হইয়াছে। * উক্ত লিপি-সমূহ লিখিত হইবার সময়, লেখার গতি কখন বাম হইতে দক্ষিণে, কখন বা দক্ষিণ হইতে বামে ছিল, তখন পর্য্যন্ত উহার গতি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ মিঃ কেনেডি কর্ত্তৃক ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে,—(১) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ব্যাবিলন এবং ভারতের পশ্চিমোপকূলের বন্দরের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ও বহুবিস্তৃত হইয়াছিল। (২) ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বাণিজ্য সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতররূপে থাকা একবারে অসম্ভব। (৩) যে সকল ভারতীয় বণিক বাণিজ্যব্যপদেশে ব্যাবিলনে যাইতেন, তাঁহাদের ব্যাবিলন হইতে আরও পশ্চিমে যাওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহারা ইমেন (Yemen) পর্য্যন্তও অগ্রসর হইতেন না। আফগানিস্থান অতিক্রম করিয়া স্থলপথে তাঁহাদের ব্যাবিলন আসাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এই তিন শ্রেণীর প্রমাণ পরিস্ফুট এবং দৃঢ় করিতে এখনও বহু বাকী আছে। কিন্তু ইহার কোন একটিও চূড়ান্ত নহে। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর প্রমাণ একত্রে প্রত্যেকটিকেই সমর্থন করে। সুতরাং আমরা মোটামোটি এই কএকটি কথা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি।

(১) সমুদ্রগামী ব্যবসায়িগণ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে (এবং সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগেও) অনুকূল বায়ু প্রভাবে ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল (প্রথম সোবীর [Sovira] তৎপর সুপারক [Supparka] এবং ভরুকচ্ছ [Bharukaccha]) হইতে তৎকালীন প্রধান বাণিজ্যস্থল ব্যাবিলন পর্য্যন্ত বাণিজ্য ব্যপদেশে গমন করিত।

(২) এই বণিকগণের অধিকাংশই ড্রোভিডিয়ান্,—আর্য্য বংশ (Aryans) সম্ভূত নহে। পশ্চিম উপকূলের আনীত পণ্য দ্রব্য সমূহের যে সকল নাম তাহারা

* Ibid. 1901.

গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সংস্কৃত বা পালি সাহিত্য হইতে উদ্ভূত নহে, পরন্তু তামিল শব্দের পরিবর্ত্তিত রূপ। (যথা—বানর, ময়ূর এবং চাউল—এই সকল দ্রব্যের নাম। Soloman's ivory, apes and peacocks, for instance, and the word "rice.")

(৩) বণিক সম্প্রদায়, সিমিটিক জাতির পূর্ব্ববর্ত্তিগণের আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত অক্ষর মালার সহিত পরিচিত হন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ জাতি Akkadians নামে পরিচিত।

(৪) উক্ত বর্ণমালা প্রথমতঃ ভ্রমণশীল সেমিটিক জাতি কর্ত্তৃক ব্যাবিলন হইতে উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিম উভয় প্রদেশেই বিস্তৃত হয়। প্রাগুক্ত ভারতীয় বণিকগণের কোন কোন অক্ষর সেমিটিক জাতির খোদিত লিপির এবং ব্যাবিলনের মানের (বাট্‌খারার) উপরের লিখিত অক্ষরের সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। ভারতীয় বণিকগণের ব্যবসায়ারম্ভের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এই উভয় লিপিই লিখিত হয়।

(৫) ভারতীয় বণিকগণ ঐ অক্ষরমালা স্বদেশে আনয়ন করিলে, তাহা বিদ্বজ্জন সমাজ ও সাধারণ জন সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত ও পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার প্রায় সহস্র বৎসর পর এই রূপান্তরিত অক্ষর—'ব্রাহ্মি লিপি নামে অভিহিত হয়। ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়ে, যথা অশোকের রাজত্বকালে ইহার কি নাম ছিল, তাহা জানা যায় না। এই লিপিমালা হইতে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিলোন প্রভৃতি দেশে বর্ত্তমান কালে যে সকল বর্ণমালা প্রচলিত আছে তাহা জন্ম লাভ করে।

(৬) সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে যখন এই অক্ষরমালা ভারতে প্রথম আনীত হয়, তাহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয়গণের বৈদিক সাহিত্য বিদ্যমান ছিল; এই সাহিত্য কেবল ব্রাহ্মণাদি পুরোহিত সম্প্রদায়ের মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণগণ শীঘ্রই এই আনীত লিপির সহিত পরিচিত হন; কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থাদি সেই পূর্ব্বতন প্রথা মতেই (আবৃত্তি ও স্মৃতির সাহায্যে) চলিতে লাগিল। সম্ভবতঃ তাঁহারা এই সময় হইতে স্মৃতি শক্তির সাহায্যকল্পে

কখন কখনও কিছু কিছু লিখিয়া রাখিতে ( নোট করিতে ) আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রধানতঃ স্মৃতিশক্তির উপরই নির্ভর করিতেন।

(৭) ব্যাবিলনে প্রথম কাদার দ্বারা অক্ষর অঙ্কিত হয়। ভারতবর্ষে লৌহ লেখনী দ্বারা বৃক্ষত্বক অথবা বৃক্ষপত্র প্রধানতঃ ভূর্জ্জপত্রের উপর বর্ণমালা অঙ্কিত হইত। কোন প্রকার কালী ব্যবহৃত হয় নাই। এই সকল ভঙ্গুর পদার্থের উপরের এই রেখা সমূহ কেবল যে পাঠোদ্ধার পক্ষে দুরূহ তাহা নহে। অধিকন্তু উহা সহজেই ভঙ্গ ও নষ্ট হইয়া যায়।

(৮) লেখার উপকরণস্বরূপ এই সকল বৃক্ষপত্রের ক্ষণভঙ্গুরতা নিবারণ কল্পে ইহার অল্প দিন পরেই লিখিবার নিমিত্ত লম্বা লম্বা বল্কল বা তালীপত্র বৃক্ষের ( Corypha talipat palm tree ) পত্র ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। তদনন্তর এক রকম কালী আবিষ্কৃত হয়। বৃক্ষপত্র বা বল্কলের উপর আঁচড় দিয়া তাহার উপর এই কালী ঘসিলে লেখা স্থায়ী হইত এবং স্পষ্টভাবে পড়া যাইত। এই সময় পর্য্যন্ত পুস্তকের উপযোগী কোন পদার্থই আবিষ্কৃত হয় নাই। শেষোক্ত আবিষ্কারের বিলম্ব হইবার প্রধান কারণ এই যে, তৎকালে লোকের নিকট পুস্তকের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইত না।

(৯) কিন্তু একথা বেদের সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বলা যায় না। যাহা হউক, পুরোহিতগণ এই সাহিত্যের জ্ঞান আপনাদের মধ্যে রাখিতেন,—অপরকে তাহা বিতরণ করিতে বড় অগ্রসর হইতেন না। বেদে কতকগুলি পদ্যময় মন্ত্র ও নীতি আছে। পরবর্ত্তী ধর্ম্ম সংহিতাদিতে বেদের অনুকরণ করা হইয়াছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য অন্তরের সহিত এই সকল বেদমন্ত্র অনুমোদন ও গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

গৌতম বলিয়াছেন,—"যে শূদ্র ইচ্ছা পূর্ব্বক এই বেদমন্ত্র শ্রবণ করিবে, তাহার কর্ণরন্ধ্র তরল শিশার দ্বারা ভরিয়া দেওয়া হইবে। শূদ্র যদি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে ; তবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলা হইবে। সে যদি তাহা মনে করিয়া রাখে, তবে তাহার দেহ দ্বিধা খণ্ডিত করা হইবে।" † ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের কথা এই যে, ঈশ্বর কেবল তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের বংশধরগণকেই বেদপঠন পাঠনের অধিকার দিয়াছেন। এই হেতু তাঁহারাই দেবত্বের দাবী করিতেন। ‡

* On the Vedanta Sutras, 1. 3. 38.

† দ্বাদশ অধ্যায় ৪—৬ শ্লোক।

‡ মনুসংহিতা ১৮ অধ্যায় ৮৮ শ্লোক।

ব্রাহ্মণগণ যে সাধারণতঃ লিখন প্রণালীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের একচেটিয়া প্রভুত্ব রক্ষার মানসে লিখন প্রণালী বিস্তারের সুবিধা করিতেন না। সুতরাং বল্কল বা তালপত্রের উপর লিখিত প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। প্রস্তর বা অন্য ধাতুর উপরের প্রাচীনতম লিপি বৌদ্ধগণ দ্বারাই লিখিত এবং তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের বিধান সমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে লিখন প্রণালীর প্রাচীন উল্লেখ প্রথম বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রে (১) দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে লিখন প্রণালীর বিস্তর উদাহরণ আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

অসম্ভব নহে যে, ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বাবধি চিত্রলিপি হইতে তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য্য কোনরূপ বর্ণলিপি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বৈদেশিক অক্ষরসমূহকে ঐ বর্ণগুলির সহিত যোজনা করিয়াছিলেন, এ কথা সিদ্ধান্ত করিবার কারণ আছে। কিন্তু কানিংহাম কিছু বেশি অনুমান করেন। তিনি মনে করেন যে, ভারতীয়গণ আপনা হইতেই স্বদেশী বর্ণমালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানকালে উহার স্বপক্ষে প্রমাণের একান্ত অভাব, পরন্তু অপর পক্ষে বিস্তর প্রমাণ-প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রমাণ পরম্পরা আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ভারতীয় লিপিমালা কোনক্রমেই আর্য্যগণের উদ্ভাবিত নহে,—উহা দ্রেভিড়িয়ান বণিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ভারতে প্রচলিত হয়। ভারতীয় পুরোহিতগণ অন্য প্রকারে ভারতীয় সাহিত্যের অতুলনীয় উপকার সাধন করিয়া থাকিলেও, লিপি প্রচলন কার্য্যে তাঁহাদের স্বার্থের বিঘ্ন উপস্থিত হইত। সুতরাং লিখিবার উপকরণের উন্নতিবিধান সম্বন্ধে ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের নিকট ঋণী নহে। উপরোক্ত দ্রেভিড়িয়ান বণিকগণেরও অপেক্ষাকৃত কম স্বার্থপরবশ সাহিত্যিকগণের নিকটই বিশিষ্টরূপে ঋণী। তাঁহাদের দ্বারা লিখন প্রণালী প্রবর্ত্তিত ও তাহার উপকরণের উন্নতিসাধন না হইলে, পূর্ব্ব পরিজ্ঞাত বর্ণলিপিও পুস্তকাকারে রচিত এবং রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

---

# মুর্শিদাবাদ-কাহিনী।

( দ্বিতীয় সংস্করণ। )

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে বঙ্গবাসী বলিতেছেন,—"এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বড় আনন্দের বিষয়। * * * এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ এখন সহজে বুঝাইয়া দিতেছে,—বিষয় ভাল হইলে, আর উপযুক্ত লেখক সরস ভাষায় বিশদ বর্ণনে ঐতিহাসিক তথ্য লিখিতে পারিলে, ঐতিহাসিক পুস্তকের আদর সহজে ও শীঘ্র হইয়া থাকে। * * * নিখিল বাবু সুশিক্ষিত সুলেখক, তাঁহার গবেষণা প্রশংসনীয় তাই তাঁহার কৃত ইতিহাসগ্রন্থ প্রশংসিত। দ্বিতীয় সংস্করণ অচিরেই নিঃশেষিত হইবে, এইরূপই আশা হয়। * * * নিখিল বাবুর মুর্শিদাবাদ কাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ নিশ্চয়ই সমাদৃত হইবে। এই সংস্করণে ১৫ খানি হাফটোন চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রগুলি উপাদেয়।" সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০ টাকা।

---

# মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

ইতিহাস সম্বন্ধে বান্ধব বলিতেছেন,—"নিখিল বাবু ইতঃপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ-কাহিনী নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার এই মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সেই পথে বৃহত্তর দ্বিতীয় পদ। তিনি এই উভয় পুস্তকেই বহুদর্শনলব্ধ পাণ্ডিত্য, বৃত্তান্ত-পরীক্ষণ-পটুতা ও পরিশ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পরিশ্রমে স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছে।" অপর্য্যাপ্ত হাফটোন চিত্রে পরিপূর্ণ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি সুবৃহৎ মানচিত্রে অলঙ্কৃত ইহা কেবল মুর্শিদাবাদের নহে, কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালারই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস। প্রথম খণ্ড, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০ টাকা।

এই পুস্তকদ্বয় কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে ও ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

---

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত সজ্জন প্রশংসিত আর্য্যধর্ম্ম গ্রন্থাবলী কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রেসে প্রাপ্তব্য।—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর টীকার পদানুসরণে—মূল, অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য ও বিবিধ পাঠান্তর সহ অতি সুন্দররূপে ও বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হইল। এরূপ সংগ্রহ কোন গীতায় আর দেখিতে পাইবেন না। ক্রেতৃগণ ক্রয়কালে অন্যান্য গীতার সহিত মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আনা।

বৃহৎ স্তব-কবচ-মালা—(সমুদয় দেবদেবীর নানাবিধ স্তব, কবচ ও ধ্যান পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত। এরূপ বিশুদ্ধ পুস্তক অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। (১১৫০ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ) মূল্য ১৲ টাকা।

চণ্ডী—(যাহার পাঠে, শ্রবণে, এমন কি যাহা গৃহে থাকিলেও রোগ, শোক, মোহ, অধিক কি, ত্রিতাপ বিদূরিত হয়, সেই চণ্ডী মূল, প্রাচীন টীকানুযায়ী অন্বয়, ব্যাখ্যা ও বিশদ বঙ্গানুবাদসমেত) মূল্য ।৵০ আনা।

কলিকাতা, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত।

৩য় বর্ষ আষাঢ়—১৩১৪। ৩য় সংখ্যা।

সচিত্র

মাসিক পত্র।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি. এল.

সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা।] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

প্রথম ভাগ, ৩য় সংখ্যা। তৃতীয় পর্য্যায়। ১৩১৪, আষাঢ়।

শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় বি, এল.,—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সহকারী সম্পাদক।

## সূচী।



# নিয়মাবলী।

ঐতিহাসিক চিত্রের জন্য প্রবন্ধাদি, বিনিময়ার্থে পত্রিকা প্রভৃতি ও সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে বহরমপুর খাগড়া পোঃ মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় এবং টাকা কড়ি, চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপনের হারও কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও গ্রাহক করা যায় না। গ্রাহকগণ মূল্যাদি পাঠাইবার সময় বা অপর কোন বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিবার সময় নম্বর দিয়া লিখিবেন। মোড়কের উপর যে নম্বর থাকে তাহাই গ্রাহক নম্বর।

নূতন গ্রাহক হইলে "নূতন" কথাটি এবং নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

প্রতি মাসের পত্রিকা তৎপর মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা না পাইলে ১৫ই তারিখের মধ্যে না জানাইলে আমরা পুনরায় দিতে বাধ্য নহি। নমুনার জন্য ৵৹ তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়,
৪৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট—কলিকাতা
মেট্‌কাফ্ প্রেস।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

# ঐতিহাসিক চিত্র।

## হোসেনসাহ।

চারি শত বৎসর অতীত হইল, গৌড়ের পাঠান সিংহাসন যে নরপতির পবিত্র স্পর্শে ধন্য হইয়াছিল, তাঁহার নাম এককালে বিশাল বঙ্গভূমির সর্ব্বত্র গীত হইত। কি পূর্ব্ববঙ্গ, কি পশ্চিম বঙ্গ সকল স্থানেই সেই মহিমাশালী মহানুভব হোসেনসাহের পুণ্য নাম আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িত। বঙ্গকবিগণ যাহার নাম আপনাদের কাব্যের সহিত বিজড়িত করিয়াছেন, বাঙ্গলার অনেক বিশাল দিঘী যাহার নামাঙ্কিত পাষাণবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বাঙ্গালার অনেক বিস্তীর্ণ পথ শত শত বৎসর শয়ন করিয়া যাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে, এবং গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি মস্তক উন্নত করিয়া যাহার নামের ঘোষণা করিতেছে, তিনি বাস্তবিকই যে এককালে সকলের স্মরণীয় ছিলেন, সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে হোসেনসাহ তৎকালে হিন্দু মুসল্‌মান উভয় জাতিরই সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি হিন্দু মুসল্‌মানকে যেরূপ সমভাবে দেখিতেন, দুই এক জন মুসল্‌মান নরপতি ব্যতীত কেহই সেরূপ সমতা দেখাইতে পারেন নাই। তাই আজিও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া জগতের সমক্ষে তাঁহার সমতার সাক্ষ্য দিতেছে। দুই এক শত বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ে যে পাঠান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

হইয়াছিল, তাহার সিংহাসনে এত শীঘ্র যে সমদর্শী নরপতি উপবিষ্ট হইবেন, তাহা কেহই সহজে অনুমান করিতে পারে নাই। আকবর ও আলিবর্দ্দী ব্যতীত এরূপ সমদর্শী মুসল্‌মান নৃপতি দিল্লী বা বাঙ্গলায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা হোসেনসাহের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিয়া তাঁহার রাজত্বের ও সমদর্শিতারও পরিচয় দিতেছি।

হোসেনসাহ সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়দগণ মক্কার অধিবাসী ও মহম্মদ হইতে আপনাদের উদ্ভব বলিয়া থাকেন। হোসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ মক্কার শেরিফ ছিলেন, এমন কি তাঁহার পিতা আসরফ হোসেনিও উক্ত সম্মান প্রাপ্ত হন। তজ্জন্য তাঁহাদের বংশ "শেরিফি মক্কী'' উপাধি ধারণ করিত। হোসেনসাহাও উক্ত উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা আরব দেশের অন্তর্গত ত্রিমিজ নগরে বাস করিতেন। দুরবস্থায় পতিত হওয়ায় আসরফ হোসেনি দুই পুত্র হোসেন ও ইসুফের সহিত বঙ্গদেশে উপস্থিত হন, এবং রাঢ় প্রদেশের অন্তর্গত চাঁদপাড়ায়* বাস করেন। চাঁদপাড়া মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত ও সাগরদীঘী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় চারি ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। কিছুকাল পরে আসরফ ও ইসুফ বিহারে গমন করিলে হোসেন একাকী চাঁদপাড়ায় অবস্থান করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠে যে, সামান্য কর্ম্ম গ্রহণ না করিলে তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেই সময়ে চাঁদপাড়ায় সুবুদ্ধি রায় † নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বাস করি-

* রিয়াজুস সালাতিন ও ষ্টুয়ার্ট প্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাসে চাঁদপাড়ার স্থলে চাঁদপুর লিখিত আছে। রিয়াজে চাঁদপুরকে রাঢ়প্রদেশের অন্তর্গত বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার বর্ত্তমান নাম চাঁদপাড়া। পূর্ব্বে কখনও তাহার চাঁদপুর নাম ছিল কি না বলা যায় না। মুর্শিদাবাদ জেলার সেখের দীঘীর নিকট অবস্থিত সৈয়দ বংশীয়গণ চাঁদপাড়াতেই হোসেন সাহার প্রথম বাসস্থান বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন।

† সুবুদ্ধি রায়কে চাঁদপাড়ার লোকেরা চাঁদরায় বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে ও ভক্তিরত্নাকরে তিনি সুবুদ্ধি রায় নামেই উল্লিখিত হইয়াছেন।

ত্তেন, হোসেন তাঁহার অধীনে একটি সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। * ঐ সময়ে চাঁদপাড়ার জলকষ্ট নিবারণের জন্য সুবুদ্ধি রায় একটি দীর্ঘিকা খননের ইচ্ছা করেন। হোসেন সাহা তাহারই তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হোসেনের কর্ত্তব্যকার্য্যে কোন ত্রুটি লক্ষিত হওয়ায় সুবুদ্ধিরায় তাঁহার অঙ্গে চাবুকের আঘাত করেন। † সেই আঘাতচিহ্ন বহুদিন পর্য্যন্ত হোসেন সাহের অঙ্গে বিদ্যমান ছিল। সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কর্ম্ম করিতে করিতে হোসেন যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হোসেন উত্তরকালে একজন ক্ষমতাশালী লোক হইয়া উঠিবেন। ‡ তৎকালে চাঁদপাড়ায় একজন কাজী বাস করিতেন। তিনি

* সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে, হোসেন সুবুদ্ধি রায়ের গোচারণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে, তিনি সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কোন সামান্য চাকরী করিতেন, ও রায় তাঁহাকে দীঘী খনন করাইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি যে একটি সামান্য চাকরী করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। Stewart লিখিয়াছেন যে, "It is however certain, that, on his first arrival in Bengal, he was for sometime in a very humble situation." মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে হোসেনের চাকরী করার কথা আদৌ উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, এবং চাঁদপাড়ার লোকেরাও অদ্যাপি তাহাই বলিয়া থাকে। হোসেন সাহের রাজত্বকালেই অথবা তাহার কিছু পরে চরিতামৃত-প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম হয়। তিনি হোসেন সাহের সময়ে জীবিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতেই সম্ভবতঃ ঐ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

† "পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী ;<br>
সৈয়দ হুসেন খাঁ করে তাহার চাকরী।<br>
দীঘী খোদাইতে তারে মনসীব কৈল,<br>
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল।"<br>
চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা। ২৫ পঃ।

‡ প্রবাদ মুখে শুনা যায় যে, হোসেন গোচারণ করিতে করিতে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর তীরে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। দুইটি সর্প রৌদ্র নিবারণের জন্য তাঁহার মস্তকে ফণা বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করে। ইতিমধ্যে রায় তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হন। হোসেন জাগ্রত হইলে তিনি তাহাকে বলেন যে, তুমি রাজা হইবে, কিন্তু তখন আমার কথা স্মরণ রাখিও। তদবধি তিনি হোসেনকে আর গোচারণে নিযুক্ত করেন নাই। হোসেন বাদসাহ হইয়া রায়কে চাঁদপাড়া গ্রাম এক আনা হারে বন্দোবস্ত করিয়া দেন; তদবধি উহার

পরিচয়ে হোসেনকে সৈয়দবংশীয় জানিয়া স্বীয় কন্যার সহিত হোসেনের বিবাহ প্রস্তাব করেন। তদবধি হোসেন কাজীর বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে পাঠান বাদসাহগণ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কাজী সর্ব্বদা তাঁহাদের দরবারে যাতায়াত করিতেন এবং গৌড়েশ্বরের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় থাকায়, তিনি স্বীয় জামাতাকে রাজদরবারে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। সেই সময় হইতে হোসেনের ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতে আরম্ভ করেন।

গৌড়ের রাজদরবারে প্রবিষ্ট হইয়া হোসেনসাহ ক্রমে উচ্চ পদ সকল লাভ করিয়াছিলেন, অবশেষে মজফঃর সাহের রাজত্বকালে হোসেন উজীরের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। হোসেনসাহের পরামর্শক্রমে মজফঃর সাহ রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন, হোসেনের মন্ত্রণায় মজফঃর সাহ সৈন্যগণের বেতন হ্রাস করিয়া রাজভাণ্ডারে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ক্রমে অর্থতৃষ্ণা বর্দ্ধিত

এক-আনি চাঁদপাড়া নাম হয়। অদ্যাপি উহা সেই নামেই কথিত হইয়া আসিতেছে। চৈতন্য-চরিতামৃতে কিন্তু আর একটি গল্প লিখিত আছে। হোসেন রাজা হওয়ার পর তাঁহার বেগম তাঁহার গাত্রে চাবুকের আঘাত দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, এবং সুবুদ্ধি রায় কর্ত্তৃক উক্ত আঘাতের কথা হোসেন জ্ঞাপন করিলে বেগম সুবুদ্ধি রায়কে সংহার করিতে বলেন। হোসেন তাহাতে অসম্মত হইলে বেগম তাঁহার জাতি মারিতে বলেন। বেগমের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে হোসেন জলপাত্র হইতে জল লইয়া রায়ের মুখে দিয়াছিলেন।

> "তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে,
> সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজাস্থানে।
> রাজা কয় আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা,
> তাঁহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা।
> স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে,
> রাজা কহে জাতি নিলে ইহো নাহি জীবে।
> স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা,
> করোয়ার পাণী তাঁর মুখে দেয়াইলা।"
>
> চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য। ২৫ পঃ।

সুবুদ্ধি রায় তাহার পর সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া কাশীযাত্রা করেন, ও চৈতন্যদেবের আদেশে বৃন্দাবনে বাস করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করেন।

হওয়ায় মজফঃর সাহ প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে প্রজাপুঞ্জ ও রাজ্যের সকল লোকে তাঁহার প্রতি যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে; এমন কি অনেকে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াও যায়। সৈয়দ হোসেনও মজফঃর সাহের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিপক্ষগণের সহিত যোগদান করেন ও তাঁহাদের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। মজফঃর সাহ বহুসংখ্যক হাবশী, বাঙ্গালী ও আফগানী সৈন্য লইয়া গৌড় দুর্গ গড়বন্দী করিয়া অবস্থিতি করেন। হোসেন সাহ ও তাঁহার পক্ষীয় লোকদিগের সহিত তাঁহার চারি মাস যুদ্ধ চলিতে থাকে। পরে মজফঃর সাহ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, আমীর গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, হোসেন তাঁহাদের নেতা হইলেন। এই যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী হোসেনের মস্তকে আশীর্ব্বাদ নিক্ষেপ করেন। মজফঃর সাহ স্বীয় পক্ষীয় অসংখ্য লোকের সহিত রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। * অবশেষে হোসেন সাহই সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই সময় হইতে তিনি সুল্‌তান আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি ইতিহাসে সুল্‌তান আলাউদ্দীন হোসেনসাহ শেরিফি মক্কী বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হোসেন সাহ দেখিলেন যে, তখনও পর্য্যন্ত সৈন্যেরা গৌড় নগর লুণ্ঠন করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে লুণ্ঠন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার আদেশ অমান্য করায় তিনি প্রায় দশসহস্র লুণ্ঠনকারীর প্রাণদণ্ড করিয়া গৌড়ে শান্তি স্থাপন করেন।

হোসেন সাহ বাদসাহ হইয়া গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর গুপ্ত ধনের অধিকারে সচেষ্ট হন। তিনি বহু ধনরত্ন ও ত্রয়োদশ শত স্বর্ণপাত্র হস্তগত করিয়াছিলেন। পুরাকাল হইতে গৌড় ও বঙ্গের ধনশালী ব্যক্তিগণ ভোজনকালে স্বর্ণপাত্রের ব্যবহার করিতেন। নিমন্ত্রণ ও ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে যিনি যে

* ঐতিহাসিক নিজামউদ্দীনের মতে মজফঃর সাহের অত্যাচারে রাজার সমস্ত লোক অসন্তুষ্ট হওয়ায় সৈয়দ হোসেন গৃহরক্ষক সেনাদলের অধিনায়ককে হস্তগত করিয়া একদিন রাত্রিতে তের জন সৈনিককে সঙ্গে লইয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মজফঃর সাহকে হত্যা করেন।

পরিমাণে স্বর্ণপাত্র বাহির করিতে পারিতেন, তিনি সেই পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, তৎকালে গৌড়রাজ্য কতদূর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

সুল্‌তান হোসেনসাহ ন্যায়পর ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে যারপরনাই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারীদিগকে তিনি অনেক উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন। সৈয়দ, মোগল ও আফগান বংশজাত অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সময়ে দরবারে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। তিনি যে সমস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রূপ ও সনাতন প্রধান, ইঁহারা দবির খাস ও সাকর মল্লিক বলিয়া কথিত হইতেন। এই রূপ ও সনাতনই, পরে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেনসাহা হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষেই রাজকার্য্য প্রদান করিতেন, ইহা যে তাঁহার মহোদার্য্যের নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সময়ে গৌড়ে পাইক নামধারী এক দল সৈন্য অবস্থিতি করিত। তাহারা এরূপ ক্ষমতাশালী ছিল যে, একমাত্র তাহাদেরই সাহায্যে গৌড়ের রাজবিদ্রোহিগণ তাহার নরপতিবৃন্দের শোণিতে গৌড় সিংহাসন রঞ্জিত করিত। হোসেনসাহ আপনার ভবিষ্যতের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের স্থানে ভিন্ন এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত করেন। * এতদ্ব্যতীত হাবশী সৈন্যদিগকেও তিনি রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কারণ তাহাদের অত্যাচারে লোকে অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইয়া ...য়াছিল। হাবশীরা দিল্লী বা জৌনপুরে প্রবেশ লাভ করিতে না পারায়

* ঐ সমস্ত পাইকদিগের কতকগুলি বংশধর মেদিনীপুর প্রদেশে বাস করিয়াছিল। বহিঃশত্রুদিগের আক্রমণ নিবারণের জন্য তাহাদিগকে কতকগুলি জমিও প্রদত্ত হইয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সে অধিকার হইতে বিচ্যুত করায় তাহারা অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল।

গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে গমন করে, ও তথায় অবস্থিতি করিতে থাকে। এইরূপে হোসেনসাহ রাজকার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। জন সাধারণে তাঁহার শাসনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে লাগিল।

হোসেনসাহ গৌড় হইতে রাজধানী অন্তরিত করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী একডালা দুর্গে অবস্থিতি করেন। তিনি একডালা দুর্গকে নিরাপদ মনে করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। হোসেন সাহ সৈন্যের সুব্যবস্থা, রাজধানীর বন্দোবস্ত প্রভৃতি করিয়া দেশশাসনে প্রবৃত্ত হন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী ও সামন্ত রাজগণকে বশীভূত করিয়া উড়িষ্যা পর্য্যন্ত আপনার অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। হোসেনসাহ এরূপ দৃঢ়ভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজত্বকালে একটি সামান্য মাত্র বিদ্রোহেরও চিহ্ন দেখা যায় নাই।

তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে জৌনপুরের অধিপতি সা হোসেন দিল্লীর সিংহাসনলাভের জন্য অনেক বৎসর ব্যাপিয়া বিলোল লোদার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে সেকেন্দর লোদী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া জৌনপুর হইতে বিতাড়িত হন ও বাঙ্গালায় আসিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হোসেন সাহ, সা হোসেনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য তদ্বংশানুযায়ী বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সা হোসেন গৌড়ে অবস্থিতি করিয়া তথায় দেহত্যাগ করেন। অদ্যাপি গৌড়ের নিকট তাঁহার সমাধিমন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বিহার প্রদেশ জৌনপুরের অধীন ছিল। সা হোসেন জৌনপুর হইতে বিতাড়িত হইলে, বাদসাহ সেকেন্দর বিহার দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। অতঃপর তিনি বঙ্গরাজ্য আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। হোসেন তৎসংবাদশ্রবণে বিচলিত হইয়া সেকেন্দর বাদসাহের সহিত সন্ধি করিবার মানসে স্বীয় পুত্র দানিয়েলকে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করেন। সেকেন্দর হোসেন সাহার প্রস্তাবে সম্মত হন। কিন্তু তিনি যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইতে ইচ্ছা করেন, অবশেষে সন্ধিতে তাহাই স্থির হয়। তজ্জন্য বিহার, তিব্বত ও সরকার সারণ দিল্লীসাম্রাজ্য-

ভুক্ত হইয়া যায়। সেকেন্দর বাঙ্গলা জয় হইতে নিবৃত্ত হন, এবং উভয় পক্ষের মধ্যে এইরূপ সন্ধি হয় যে, উভয়ে পরস্পরের শত্রুপক্ষকে কোনরূপে সাহায্য করিবেন না। সেকেন্দর ও হোসেনসাহ এইরূপ সর্ত্তে সম্মত হইলে সেকেন্দর দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন ও হোসেন সাহও নিশ্চিন্ত মনে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন।

হোসেন সাহের রাজত্বের প্রধান ব্যাপার আসাম কামরূপ ও ত্রিপুরাবিজয়। হোসেনসাহের রাজত্বের বহু পূর্ব্বে বঙ্গদেশে মুসল্‌মান আধিপত্য বিস্তৃত হইলেও ঐ সমস্ত প্রদেশ বহু দিন পর্য্যন্ত আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। যদিও ঐ প্রদেশ সকল মধ্যে মধ্যে মুসল্‌মানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় নাই। হোসেনসাহ ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ জয় করিবার জন্ত অনেক সৈন্ত সংগ্রহ করেন। সৈন্তগণসহ তিনি আসাম ও কামরূপ রাজ্য জয় করিয়া আপনার পুত্রকে বিজিত প্রদেশ সমূহের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবৃত্ত হন। আসামের রাজা সপরিবারে সমতল প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বতের উপরিভাগে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায়, সমস্ত প্রদেশ জলে প্লাবিত হইয়া যায়, রাস্তাঘাটের কিছুমাত্র নিদর্শন রহিল না। আসামরাজ সেই সময়ে পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে অবতরণ করিয়া হোসেনসাহের পুত্রকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার রসদ বন্ধ করিয়া দিলে, সুল্‌তানপুত্র বাধ্য হইয়া উক্ত প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন।

কামরূপ ও আসাম জয় করিয়া হোসেনসাহ চট্টগ্রাম জয়ের জন্ত সচেষ্ট হন, তাঁহার সেনাপতি পরাগল খাঁ তজ্জন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া মগরাজ ও ত্রিপুরাধিপের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। তিন দল সৈন্তের অসিক্রীড়ায় চট্টগ্রাম রুধির-ধারায় রঞ্জিত হইয়া উঠে। এই সংঘর্ষে ত্রিপুররাজ জয়ী হইলে হোসেনসাহ ত্রিপুরা আক্রমণে ইচ্ছুক হন। তিনি আপনার অপরিমিত সৈন্তসহ গৌর মল্লিককে ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। সেই সময়ে মহারাজ ধন্যমাণিক্য ত্রিপুরার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার সেনা-

পতি চয়চাগের সহিত কুমিল্লা নগরীতে হোসেন সাহের সৈন্তের সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে ত্রিপুরসৈন্তেরা পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেলে, পাঠান সৈন্তেরা ক্রমশঃ রাজধানী রাঙ্গামাটির দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ত্রিপুর সৈন্তেরা গোমতী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। পাঠান সৈন্তেরা জলমগ্ন হইয়া আপনাদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করে। তাহারা নিরুপায় হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, ত্রিপুর সৈন্তেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিয়া ফেলে। মহারাজ ধন্তমাণিক্য এই যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি দীঘী খনন করাইয়া তাহার তীরে বিজয়স্তম্ভস্বরূপ একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর হোসেনসাহ পুনর্ব্বার এক বিরাট্ বাহিনীর সহিত হাতিয়ান খাঁকে রাঙ্গামাটি অধিকারের জন্ত পাঠাইয়া দেন। সেনাপতি চয়চাগ তাঁহার গতিরোধের জন্ত অগ্রসর হইলেন। আবার কুমিল্লাতে উভয় পক্ষের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেবারও চয়চাগ পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার পাঠানদিগকে গোমতীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। হাতিয়ান খাঁ অকৃতকার্য্য হইয়া সুল্‌তানের নিকট পঁহুছিলে, তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। ইহার পর হোসেন সাহ তৃতীয়বার ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। এবার তিনি কুমিল্লার পথ ছাড়িয়া রাজধানী কৈলারগড় অভিমুখে অগ্রসর হন। কৈলারগড়ের নিকট উভয় পক্ষের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, এবার ত্রিপুর সৈন্তেরা বাস্তবিকই পরাজিত হইয়াছিল। হোসেনসাহ ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করিয়াও লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অধিক দিন আপনার বশে রাখিতে পারেন নাই, তাহা পরিশেষে আবার ত্রিপুররাজ্যভুক্তই হইয়াছিল।

পার্ব্বত্য প্রদেশ সমস্ত জয় করিয়াও তাহা স্বীয় অধিকারে না রাখিতে পারায়, হোসেনসাহ আপনার রাজ্য বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিনি গণ্ডক নদীতীরে যে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক মসজীদ ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গৌড়নগরকে সুশোভিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই

সমস্ত কীর্ত্তি কালবশে বিধ্বস্ত হইয়া গৌড়ের ভগ্নস্তূপের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। কেবল দুই একটি তোরণ-দ্বার আপনাদের ভগ্ন শির উচ্চ করিয়া আজিও তাঁহার কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। একটি তোরণ-দ্বার গৌড় দুর্গের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত আছে। তাহাতে হোসেনসাহের নাম ও তাহার নির্ম্মাণসময় ৯০৯ হিজিরী বা ১৫০৩ খৃঃ অব্দ লিখিত আছে। অপর একটি তোরণ-দ্বার মকদুম সাহেবের সমাধিপ্রাঙ্গণে নির্ম্মিত হয়। ৯১৬ হিজিরী বা ১৫১০ খৃঃ অব্দে তাহা গঠিত হইয়াছিল। হোসেনসাহ এই তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া সাধুপুরুষ মকদুম সাহেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তি যাহা গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীতে ছিল, তাহার আর কোন বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বসংহর্ত্তা কাল তাহাদিগকে ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দিয়াছে।

গৌড়ের কীর্ত্তি ব্যতীত বঙ্গ রাজ্যের অনেক স্থলে হোসেনসাহার কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তিনি অনেক মসজীদ, লাঙ্গরখানা বা অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন অনেক বিশাল দীঘী তাঁহার রাজত্বকালে নিখাত হয়। তদ্ভিন্ন তিনি প্রাচীন সাধুপুরুষদিগের সমাধি ও তৎসংসৃষ্ট অতিথিশালা ও পাঠশালার জন্য অনেক বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকলের মধ্যে কুতুব উল আলমের সমাধির জন্য যাহা নির্দ্দেশ করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেক স্থানে তাঁহার নিখাত দীঘী বিদ্যমান আছে। ইহাদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের সেখের দীঘীই প্রধান। এই দীঘী ৯২১ হিজরী বা ১৫১৪ খৃঃ অব্দে নিখাত হয়। * হোসেন সাহ গৌড় হইতে জগন্নাথ পর্য্যন্ত যে বিশাল সড়ক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার দুই পার্শ্বে অনেক দীঘী

* সেখের দীঘীর প্রস্তর ফলকে এইরূপ লিখিত আছে,—"ঈশ্বর বলিয়াছেন, যে একটি পুণ্যকার্য্য করে, তিনি তাহাকে তাহার দশগুণ ফল প্রদান করেন। এই জলাশয় সুলতান সৈয়দ আসরফ উল হোসেনের পুত্র, আলাউদ্দীন দুনিয়া উদ্দীন আবুল মজফঃর হোসেন সাহার সময় নিখাত হইল। ঈশ্বর তাহার রাজ্য ও রাজত্বকে চিরস্থায়ী করুন। রবিয়লসানি মাস ৯২১ সীন্ হিজরী।"

নিখাত ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত কীর্ত্তির জন্ত হোসেনসাহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা হোসেন সাহ হিন্দু মুসল্মানের প্রতি সমতা দেখাইয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি হিন্দুর অধীনে প্রথমে স্বয়ংই কার্য্যে নিযুক্ত হন, তজ্জন্ত হিন্দুদিগের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইয়াছিল, যদিও রাজা হইয়া তিনি মুসল্মান ধর্ম্ম বিস্তারের জন্ত উড়িষ্যা প্রভৃতি জয়কালে দেবদেবীর মূর্ত্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন, * তাহা কেবল রাজ্য বিস্তার উপলক্ষে বলিয়াই বোধ হয়। মুসল্মানগণ নূতন রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে ঐরূপে ধর্ম্ম বিস্তারও করিতেন। কিন্তু তিনি হিন্দুদিগের গুণগ্রামে মুগ্ধ হওয়ায় তাহাদিগকে উচ্চ রাজপদ প্রদান করিতে ক্রুটি করিতেন না। রূপ ও সনাতনের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পুরন্দর খাঁ ও মালাধর বসু প্রভৃতি তাঁহার সভাষদ বা কর্ম্মচারী ছিলেন। মালাধর বসুকে তিনি গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দু প্রজাগণও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। তিনি হিন্দু ও মুসল্মান প্রজাকে সমভাবে প্রতিপালন করায় তাহারা তাঁহার প্রতি যারপর নাই প্রীত হইয়া উঠে। হিন্দুদিগকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া, হিন্দু প্রজাদিগকে স্নেহচক্ষে দেখিয়া হোসেনসাহ যেরূপ হিন্দুপ্রীতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা আর কোন পাঠান নৃপতি দেখাইতে পারেন নাই।

হোসেন সাহার রাজত্বকালে মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের আবির্ভাব হয়। তাঁহার প্রচারিত নব বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেমবন্যায় যখন সমস্ত বঙ্গভূমি প্লাবিত হইতে থাকে, তখন হোসেনসাহার দরবার পর্য্যন্ত তাহাতে ভাসমান হইয়া উঠে। তাঁহার কর্ম্মচারী রূপ সনাতন তাহাতে ভাসিয়া মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। যদিও সে সময়ে মুসল্মান প্রচারকগণ ইসলাম ধর্ম্ম

* "যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।" চৈতন্ত ভাগবত অন্ত্য খণ্ড।

প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুর আকর্ষণে হিন্দু মুসল্মান উভয় জাতিই আকৃষ্ট হইয়া হরিনামের স্রোতে ভাসিতে আরম্ভ করে। হোসেন সাহা প্রথমতঃ আপন কর্ম্মচারীদিগের পদ পরিত্যাগে বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন দিন দিন নব বৈষ্ণব ধর্ম্ম যুগধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুমুসল্মানকে আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন তিনি নিজেই তাহাতে আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতেন। মুসল্মান সাধু ও ফকীরের ন্যায় মহাপ্রভুরও প্রতি তিনি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তিনি নিজে মুসল্মান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুদিগের ধর্ম্মের প্রতি কখনও অনাদর করিতেন না। কাজেই তাঁহার এরূপ ঔদার্য্যে যে হিন্দু জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? ফলতঃ হোসেন সাহার এরূপ ঔদার্য্য ইতিহাসে বিরল বলিয়াই বোধ হয়।

হোসেন সাহ বঙ্গসাহিত্যেরও উৎসাহবৰ্দ্ধক ছিলেন। তাঁহার সভায় হিন্দু মুসল্মান এক হইয়া শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে ও পদাবলীতে হোসেনসাহের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। * তাঁহার অনুকরণ করিয়া তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গও (?)ন সাহিত্যের উৎসাহ প্রদান করিতেন। তন্মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত পরাগলী ভারত, বা মহাভারত তাঁহার সেনাপতি পরাগাল খাঁর ঐরূপ সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় দিতেছে। †

* শ্রীযুত হসন, জগতভূষণ, সোহ ও রস জানে।"

"নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি। পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার। কলিকালে হরি হৈল কৃষ্ণ অবতার ॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর। তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর ॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি। সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি ॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া। চাটিগ্রামে চলি গেলা হরষিত হৈয়া ॥
পুত্র পৌত্র সনে রাজ্য করে মহামতি। পুরাণ শুনন্ত নীতি হরষিত মতি ॥"

(দীনেশচন্দ্রের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ—১৩৯—৪০)

এইরূপে হিন্দুদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি অনাদর না করিয়া, তাহাদের সাহিত্যেরপ্রতি উৎসাহ দিয়া হোসেন সাহ বাঙ্গালী জাতির নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। একমাত্র আকবর বাদ-সাহের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। ফলতঃ তিনি যেরূপ ঔদার্য্য দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহা যে জগতের ইতিহাসে বিরল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যেরূপ অপ্রীতির সূচনা হইয়াছে, তাহাতে হোসেনসাহার ন্যায় নরপতির চরিত্র আলোচনা করিলে উভয় জাতির মধ্যেই মঙ্গল ঘটিতে পারে। এই সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির চরিত্র যতই আলোচিত হয়, ততই যে আমাদের পক্ষে মহাকল্যাণ সংঘটিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

# মহারাজ রাজবল্লভ সেন।

ও

তৎ সমকালবর্ত্তী বাঙ্গলার ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিবরণ।

( সমালোচনা )

## অবতরণিকা।

অতি শুভক্ষণে বঙ্গদেশে ইতিহাস চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে; বহুকৃতী লোক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, বঙ্গের একটি প্রধান অভাব মোচনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; এজন্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা সঙ্গত। তবে বহুবিধ কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এই আনন্দের ভিতরেও কথন কথন আমাদিগকে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয়। উহার প্রধান কারণ এই যে, প্রায়ই দেখা যায়, যখন যে কোন ব্যক্তি ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তখনই তিনি ইতিহাসোক্ত ব্যক্তি বিশেষের প্রতি, অন্যায় অনুরাগ বা বিরাগ লইয়া আসরে অবতীর্ণ হন। এ বিষয়ে তাঁহারা এত দূর অন্ধতা প্রাপ্ত হন যে, একই শ্লোকের বা কিম্বদন্তীর কতকটা সত্য অপরভাগ অসত্য, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, তর্কশাস্ত্র মন্থনের যথেষ্ট অপব্যবহার করিতেও লজ্জা বোধ করেন না। এমন কি তাঁহারা ঘরের অন্নধ্বংস করিয়া পরের মনোরঞ্জনার্থে প্রতারণার আশ্রয় লইয়া স্বীয় বিবেকটিকে বলিদান দিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই প্রণালীকেই এই শ্রেণীর লেখকেরা নবানুসন্ধানের চূড়ান্ত বলিয়া, আত্মপ্রসাদলাভের আকারে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন।

এতৎসম্বন্ধে আবার অন্য এক কুগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গদেশের মহারাজ বা রাজার সন্তান, তাঁহারা যে কোন উপায়েই হউক, ব্যবহারাজীবগণের মধ্য হইতে কাহাকেও হস্তগত করিয়া, স্বীয় বংশকাহিনী বাহির

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য উহাতে খুঁত খাঁত অনেক কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু মানব মাত্রেরই স্বভাবতঃ এমন অপরিষ্কৃত মন যে, তাহারা উহাতে স্থির থাকিতে পারে না। যাহা হউক অনেক সময়ে অপ্রকৃত বিষয়ের আন্দোলন হইতেও সত্য বাহির হইয়া পড়ে, এজন্য এইরূপ অনুসন্ধানকেও একেবারে মন্দ বিবেচনা করা যায় না।

সম্প্রতি আমরা "মহারাজ রাজবল্লভ সেন" নামধেয় একখানা নবপ্রকাশিত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি; তৎসম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হওয়ায় ধারাবাহিকরূপে গ্রন্থখানা সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এ পর্য্যন্ত তিন খানা "রাজ বল্লভের জীবনচরিত" আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা সমুদয়ই রাজনগরনিবাসী বৈদ্যবংশজ সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ রাজবল্লভ সেনের বিষয়াবলম্বনে বিরচিত। তৎপর পারস্য ভাষায় লিখিত উক্ত রাজার একখানা জীবনচরিত ছিল বলিয়া জানা যায়। উহা আমরা কেন, উক্ত গ্রন্থ ত্রয়ের লেখকেরা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বঙ্গ ভাষার পদ্যেও রাজবল্লভের আর একখানা জীবন চরিত ছিল, অধুনা তাহাও পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা সর্ব্ব প্রথমে রাজবল্লভের জীবনচরিত সম্বন্ধীয় তিন পুস্তকের ও রচয়িতাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া পরে নব গ্রন্থের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। অন্যথা পাঠক মহোদয়গণের গ্রন্থোল্লিখিত বহু বিবরণ বুঝিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে।

প্রথম গ্রন্থখানার নামকরণ করা হইয়াছে, "শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন চরিত" চট্টগ্রাম নিবাসী উমাচরণ রায় কানুনগো প্রণীত; প্রায় ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৮২ শকাব্দে এই পুস্তকখানা ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "ইদানীং শ্রীমন্মহারাজার বংশধর শ্রীযুত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অনুকম্পায়, বিক্রমপুর রাজনগর নিবাসী মৃত গুরুদাস গুপ্তের বিরচিত পদ্যে পূরিত শ্রীমন্মহারাজার জীবনচরিতের অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া তাহার স্থূলাংশ উদ্ধার পূর্ব্বক যথাসাধ্য যত্ন ও শ্রম সহকারে এই জীবন চরিত প্রচার করিলাম।

বহুকাল অতীত হইল, এই পুস্তকখানা মুদ্রিত হইয়া পরে একরূপ লোপ হইয়া পড়িয়াছিল, সম্প্রতি ১৩১১ সালের নবন্নুর পত্রিকার, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, এই চারি সংখ্যায়, চট্টগ্রামনিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেব, উহা পুনরায় প্রচার করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে পুনর্জীবন দান করিয়াছেন। উক্ত সাহেব যে প্রকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাহাও তদীয় নিজ উক্তি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"এই গ্রন্থের রচয়িতা ৺ বাবু উমাচরণ রায় কানুনগো মহাশয়। নামেই তাঁহার বৃত্তি সূচিত হইতেছে। তিনি চট্টগ্রাম পড়ৈকড়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ অভিজাত ও জমিদার বংশজাত, এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের স্বদেশীয় ও আনোয়ারার ভূতপূর্ব্ব আস্থায়ী সবরেজিষ্ট্রার সুহৃদ্‌বর সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আমাকে প্রদান করিয়া পরম উপকৃত করিয়াছেন, এজন্য আমি তাহার নিকট চিরঋণী রহিলাম" ( নবপুর ১৩১১ সন পৌষ ৪০১।৪০২ পৃ )

দ্বিতীয় গ্রন্থখানার নাম হইয়াছে "রাজা রাজবল্লভ জীবনচরিত" রচয়িতা চন্দ্রকুমার রায়। বৈদ্য কুলীন বংশজাত, রাজবল্লভের পৌত্র মহেশচন্দ্র বাবুর দৌহিত্র,রাজবাড়ীতেই জন্ম ও প্রতিপালিত। ১২৯৫ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় পুস্তকের নাম রাখা হইয়াছে "মহারাজা রাজবল্লভ সেন ও তৎ সমকালবর্ত্তী বাঙ্গলার ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিবরণ" ; রচয়িতা শ্রীরসিকলাল গুপ্ত। সাথি প্রেসে মুদ্রিত ; মূল্য ১৲ টাকা, সন ও তারিখ শূন্য, বর্ত্তমান বর্ষের আশ্বিন মাস হইতে সাধারণের গোচরীভূত হইয়াছে। লেখক ওকালতি ব্যবসায়ী।

তৃতীয় লেখক গুরুদাস গুপ্তের ও চন্দ্রকুমার রায়ের প্রণীত গ্রন্থদ্বয়ের নাম স্বীয় পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন ; উমাচরণ রায় বিরচিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই ; কিন্তু গুপ্ত মহাশয় যে উহা অনবগত ছিলেন তাহা নয়। তবে জানি না কি কারণের জন্য উহা সাধারণকে অবগত হইতে দেন নাই। শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত মহাশয়ের ২৪।৫।০৩ ইং তারিখের একখানা চিঠী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইবে যে, গুপ্ত মহাশয় ৺ উমাচরণ রায় প্রণীত রাজবল্লভের জীবন চরিতের কথা অবগত ছিলেন।

"নোয়াখালী কালেক্টরীতে চট্টগ্রাম জিলার পাটিয়া থানা মোতালক, আনোয়ারা আউট পোষ্ট অন্তর্গত পারইকোরা গ্রামনিবাসী উমাচরণ রায় নামে একব্যক্তি খাজাঞ্চির কার্য্য করিতেন, তিনি রাজবল্লভের এক জীবন চরিত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জঙ্গীপুরের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামদয়াল দাস মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন* * * * * *এবিষয় বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই, আপনি অনুসন্ধান করিবেন" ইত্যাদি

গুপ্তমহাশয় রাজবল্লভের জীবনচরিত সম্বন্ধে যত পুস্তক অনুসন্ধানে পাইয়াছেন অথবা জানিয়াছেন, সমুদয়ের নাম উপক্রমণিকায় উল্লেখ করিলেন, (১) করিলেননা এই পুস্তক খানার নাম। উহার এক মাত্র কারণ আমরা এই বুঝিয়াছি যে, তিনি পূর্ব্বেই এ গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন, তবে যে চিঠী প্রেরণ করা হয়, উহা এই অনুসন্ধান জন্য যে, তদ্‌বিষয় অন্যেও অবগত হইয়াছেন কিনা। বস্তুত তৎকাল পর্য্যন্ত ঐ বিবরণ অবগত না থাকায়, "কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নহি" বলিয়াই উত্তর দেওয়া হয়। (২)

কিরূপে উমাচরণ রায় প্রণীত পুস্তকের অনুসন্ধান প্রথম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কোন কার্য্য উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল সেন বি, এ, ডিপুটী কালেক্টর ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায় বি, এল, সহ কাশীমবাজারের রাজবাড়ীতে গমন করা হয়। তৎসময়ে একখানা বঙ্গবাসী পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া নিখিল বাবু সমালোচনার অংশ পাঠ করেন, যথা "নবপুর ১৩১১ সন দ্বাদশ সংখ্যা চৈত্র; এত দিনে মহারাজা রাজবল্লভের জীবন চরিত সমাপ্ত হইল। "ঢাকা, জঙ্গিরা,

(১) "৺ চন্দ্রকুমার রায় মহাশয় রাজবল্লভের যে জীবন চরিত প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে ৺ গুরুদাস গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গলা ভাষায় এবং অন্য একব্যক্তি পারস্য ভাষায় এই রাজপুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম না"

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত প্রণীত গ্রন্থ

(২) শ্রীযুত রসিকলাল গুপ্ত মহাশয় আমাদিগকে সময় সময় যে সকল চিঠী লিখিয়াছেন, আমরা উহা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, মুঙ্গের, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে মহারাজার যে কতকটী আবাস ছিল, তাহার প্রত্যেক স্থানে অতিথি সেবার পৃথক পৃথক স্থান ছিল'' এখন প্রশ্ন হইল জঙ্গিরা কোথায়, কিন্তু তখন উহার কোন উত্তর মিলিল না। (১) তৎপর নবপুর আফিসে চিঠী লিখিয়া ১৩১১ সনের সমুদয় পত্রিকা সংগ্রহ করা হয়।

এখন দেখা কর্ত্তব্য উল্লিখিত গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে কোন্ খানার স্থান উচ্চ। আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থকার মহোদয়েরা কেহই স্বাধীন ভাবে লেখনী ধারণ করিতে সক্ষম হন নাই। প্রথম লেখক মাত্র গুরুদাস গুপ্তের অনুসরণ ও গঙ্গাপ্রসাদ বাবু হইতে যতটুকু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ২য় লেখক রাজবংশের বহু কথা অবগত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন বটে কিন্তু স্বাধীন ভাবে যে কিছু লিখিতে পারিয়াছেন এমন বোধ হয় না। কারণ একদিকে তাঁহাকে কুটম্বপ্রিয়তায়, অন্য দিকে অনুরোধ উপরোধে অভিভূত হইতে হইয়াছে। তৃতীয় লেখক উহার কোনরূপ সুযোগ বা সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাকে কেবল লোকের কথার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইয়াছে। প্রাচীন দলিলাদির বা রাজবংশীয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের উপদেশের কথা কোথাও প্রাপ্ত হইলাম না। প্রতাপ বাবুর কথা লেখকের যতটা প্রিয় বোধ হইয়াছে, অন্যের উপদেশ ততটা গ্রাহ্য হয় নাই। তৎপর ঐতিহাসিক বিবরণের কথা, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস বা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রণীত মুর্শিদাবাদ কাহিনী ও ইতিহাস প্রচলনের পরে উহা পুনর্মুদ্রিত না হইলেও চলিত।

(১) আমরা অনুসন্ধানে জঙ্গিরা সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলাম।

"জঙ্গোলিয়া সুবর্ণ গ্রামের অন্তর্গত, উহার অর্দ্ধাংশ মেঘনার উদরস্থ হইয়াছে। মঘেরা নিয়ত এই স্থানে দৌরাত্ম্য করিয়াছে। একটী জনাকীর্ণ বন্দর ছিল"

রেভারেণ্ড আর—কে—ডি, গুপ্ত প্রণীত
অষ্টচত্বর্পণ ১১৮ পৃষ্ঠা

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সোনার গাঁর অন্তর্গত এই বৃহৎ বন্দর জাঙ্গালিয়াকেই, লেখার ভুলে জঙ্গিয়া বলা হইয়াছে। এই বন্দরের নিম্ন নদীতে নাওয়ার রণপোত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত।

আমাদের মতে ইতিহাস সঙ্কলন ব্যাপারে গুপ্তমহাশয়বিরচিত গ্রন্থখানাই উপযুক্ত হইয়াছে। পারিবারিক বিবরণ সংগ্রহ বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় খানার গৌরবই অধিক। আমাদের সমালোচনা হইতে পরে উহা প্রতিপন্ন হইবে।

আর একটি কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। গুরুদাস গুপ্তের পুস্তক যে অবস্থায় উমাচরণ রায় প্রাপ্ত হন, তাহাতে অনুমান করা যায়, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইলে ঐ গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হয়। এই হিসাবানুসারে প্রায় শত বৎসরের পূর্ব্বে গুরুদাসের পুস্তক প্রণয়ন হয়। পারিবারিক বিবরণ যে এ সময়ে কতকটা টাট্‌কা জুটিয়াছিল তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুরুদাস ছিলেন রাজনগর নিবাসী, কাজেই রাজাশ্রিত বলা যাইতে পারে। তিনি সম্ভবতঃ যতদূর পারিয়াছেন রাজবংশের সম্মান রক্ষার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছেন বলিয়াই বিশ্বাস হয়।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

# আকবর বাদসাহের সন্তানসন্ততি।

মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে আকবর সাহই সর্ব্বাপেক্ষা উদারহৃদয় ও জনপ্রিয় ছিলেন। বিজিত হিন্দু ও জেতা মুসলমান উভয়কেই তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন ও সমান আদর, সমান যত্ন করিতেন। তাই সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। আমরা যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার সম্বন্ধীয় খুটী নাটী সব কথা জানিবার জন্য আমাদের স্বতঃই একটা কৌতূহল হয়, লোককে জানাইবার জন্যও একটা আগ্রহ জন্মে। আমরা সেই আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া "ঐতিহাসিক চিত্রের" পাঠক পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য এ স্থলে জনপ্রিয় সম্রাট আকবর সাহের সন্তানসন্ততির বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

১। ফতেমা বানু বেগম নামক কন্যা আকবরের প্রথম সন্তান। আকবরের ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৫৬২ খৃঃ পুন্‌গ্রাই ( Pungrai ) বেগমের গর্ভে বানুবেগমের জন্ম হয়। ইনি এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

২। ৩।—হুসেন, হাসেন নামক যমজ পুত্রদ্বয় আকবর-পত্নী বিবি আরাম বক্সের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হুসেন অষ্টাদশ দিবস ও হাসেন নবম দিবস বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

৪।—জাহাঙ্গীর আকবরের তৃতীয় পুত্র। যোধপুর রাজকন্যা যোধবাই এর গর্ভে ১৫৬৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। সাধুপ্রবর সেলিমের অনুগ্রহে ইঁহাকে পাইয়াছিলেন বলিয়া আকবর ইঁহাকে সেলিম নামে অভিহিত করিতেন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সেলিম দিল্লীর রাজতক্তে অধিরোহণ করেন। বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা সের আফগানকে নিহত করিয়া তাঁহার পত্নী জগদ্‌বিখ্যাত সুন্দরী নুরজাহানকে জাহাঙ্গীর স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে হিন্দুকুলগৌরব, পুরুষসিংহ প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহ ও বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় স্বীয় স্বাধীনতা

হারাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর অতি কোমল প্রকৃতির সম্রাট ছিলেন। তিনি যে আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, সহৃদয়তা ও সরলতার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬১ বৎসর বয়সে জাহাঙ্গীর মানবলীলা সংবরণ করেন।

৫।—সাহাজাদী খানুমের মাতার নাম সেলিনাবেগম, খানুম আকবরের দ্বিতীয়া কন্যা। ইনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষিনী ও অনুরাগিণী ছিলেন, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময়ই ভগবচ্চিন্তাতে অতিবাহিত করিতেন।

৬।—সুলতান মুরাদ ফতেপুরের পাহাড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আকবর আদর করিয়া ইহাঁকে "পাহাড়ী" বলিয়া ডাকিতেন। মুরাদ আকবরের অন্যতমা পত্নী বিবি থৈরার গর্ভসম্ভূত, ১৫৬৯ খ্রীঃ ইহাঁর জন্ম হয়। মুরাদ আকবরের চতুর্থ পুত্র ও ষষ্ঠ সন্তান। ইনি স্বভাবে বিনয়ী ও তেজস্বী, মন্ত্রে স্থির বুদ্ধি ও যুদ্ধে অতীব সাহসী ছিলেন। ইহাঁর স্বভাব ও কার্য্যদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া আকবর ইহাঁকে পূর্ত্ত বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে থানপুর নামক স্থানে মুরাদ জীবলীলা সংবরণ করেন।

৭।—মিঠি বেগম অষ্টম মাস বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি সম্রাটমহিষী মেহের সেম্মার কন্যা। হিন্দুস্থানী ভাষায় মিঠি অর্থে মিষ্ট বুঝায়।

৮।—সাহাজাদা দানিয়েল ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর দানিয়েল পিতার আদেশে মুরাদের আরব্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দাক্ষিণাত্য সম্পূর্ণরূপে জয় করেন। তাহার এই কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ আকবর তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দানিয়েল বড়ই হস্তিপ্রিয় ছিলেন। কাহারও একটি উন্নতকায় সুদৃশ্য হস্তী থকিলে যেমন করিয়াই হউক তিনি তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। হিন্দুস্থানী গানবাদ্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। হিন্দুস্থানী কবিতা আবৃত্তি করিতেও তিনি আমোদ বোধ করিতেন। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাসমা-

রোহে বিজাপুর রাজকন্যার সহিত দানিয়েলের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। সাহাজাদা দানিয়েল বড়ই সুরাভক্ত ছিলেন। অতিরিক্ত সুরা পান করিয়া বিবাহের বৎসরে বুরহানপুর নগরে ইনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

৯।—লালা বেগম আকবরের অন্যতম কন্যা, ইহাঁর মাতার নাম নান্ বিবি। অষ্টাদশ মাস বয়ঃক্রমে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

১০।—আরামবানু বেগম আকবরের কনিষ্ঠা কন্যা ও সর্ব্বশেষ সন্তান। ইহাঁর মাতার নাম বিবি দৌলৎসা। সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে ইনিই আকবরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। আকবরের মৃত্যু হইলে প্রিয়তমা কন্যা আরামবানুর কি হইবে ইহা ভাবিয়া সম্রাট পুত্র জাহাঙ্গীরকে ইহাঁর সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়া যান। সম্রাট জাহাঙ্গীরও সর্ব্বদা ইহাঁকে বিশেষ যত্নে ও আদরে পালন করিয়াছিলেন। আরামবানু কতদিন জীবিত ছিলেন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। *

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

* লেখক মহোদয় মেজর ডেভিড প্রাইসের অনূদিত জাহাঙ্গীরের আত্মচরিত নামে প্রচারিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই সম্ভবতঃ এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ব্লকম্যান সাহেব তাঁহার আইন আকবরী নামক গ্রন্থে আকবরের পুত্র কন্যা সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

"Akbar had five sons—

Hasan }
Husain } Twins, born 3rd Rabi 1, 972, they only lived one month.

3. Sultan Salim [ Jahangir ]
4. Sultan Murad.
5. Sultan Danyal.

Of daughters, I find three mentioned—(*a*) Sahzadah Khanum, born three months after Salim, in 977. (*b*) Shakrunnisa Begum, who in 1001 was married to Mirza Shahrukh ; and (*c*) Aram Banu Begum ; both born after Sultan Danyal.

ব্লকম্যান ফত্তেমাবানু বেগম ও মিঠি বেগম ও লালা বেগমের নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু শুক্রুন্নিসা বেগম বলিয়া আকবরের এক কন্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি মিঠি বেগম কি না বলিতে পারা যায় না।

লেখক জাহাঙ্গীরকে যোধপুরের রাজকন্যা যোধবাইএর গর্ভসম্ভূত বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা সন্দেহজনক। জাহাঙ্গীরের মাতা কে তাহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে, এমন কি তাহা এরূপ রহস্যময় যে স্থির করা কঠিন। এ সম্বন্ধে আমরা এস্থলে একটু আলোচনা করিতেছি। সাধারণতঃ এইরূপ প্রচলিত যে, জাহাঙ্গীর যোধবাইএর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং আগরাতে যোধবাই ও সেলিমের এক চিত্র তাহাই প্রমাণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণও তাহাই বলেন, ম্যালেসন বলিতেছেন,—

"Towards the end of the year his wife, whom he had sent to reside at Sikri, gave birth to a son at the house of the saint, who is known in history as the Emperor Jahangir, though called after the saint by the name of Salim. His mother was a Rajput princess of Jodhpur."

ব্লকম্যান প্রথমে উহাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহা সংশোধন করেন।

"5 Jodh Bai, or Princess of Jodhpur, the mother of Jahangir. Her name is not mentioned by any Muhammadan historian. As Akbar's mother had the title of *Maryam Mukani*, so was Jodh Bai called *Mariam Uzzamani*."

পরে বলিতেছেন,—

"I stated on p. 309, that Jahangir's mother was called Jodh Bai, this is wrong. Jodh Bai was the wife of Jahangir and daughter of Motha Raja of Jodhpur. There is little doubt that Jahangir's mother (the Maryam Uzzamani) is the daughter of Rajah Bihari Mall and sister to Raja Bhagwandas." ব্লকম্যান আকবরনামার অনুকরণ করিয়াই শেষোক্ত উক্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি আর একটি ভ্রম করিয়াছেন। যোধবাইকে তিনি জাহাঙ্গীরের বেগম বলিয়াছেন। যোধবাই জাহাঙ্গীরের বেগম নহেন, তিনি আকবরের বেগম; তিনি মোটা রাজার ভগিনী ও মালদেবের কন্যা। জাহাঙ্গীরের বেগমের নাম যোধাবাই, তিনি বিকানীরের রাইসিংহের কন্যা।

এক্ষণে আকবরনামায় জাহাঙ্গীরের জন্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা উক্ত হইতেছে—

"Before that time the Emperor had several children born to him, but in the mysterious wisdom of the creator, they had all travelled to the world of eternity; unthinking people attributed this to the unluckiness of the locality, and the king, wishing to shut the mouth of the triblers with the seal of silence, determined on a change of place. The choice falling on Fathehpur, the Dar-ul-khalifaut, a son was born to the Emperor at an auspicious hour, by the Hindu princes, Mariam-uz-zumani, daughter of Raja Behari Mal of Ambar in the Soobah of Ajmir, sister to Raja Bhagwan Das and aunt to Koar Man Singh." এই পুত্রই সেলিম বা জাহাঙ্গীর। তিনি ফতেপুরশিক্রির সুপ্রসিদ্ধ ফকীর সেখ সেলিমের বাটীতে ভূমিষ্ঠ হন। ফকীরের নামানুসারে তাঁহারও সেলিম নামকরণ করা হয়। সুতরাং আকবরনামার মতে জাহাঙ্গীর বিহারীমল্লের

কন্যার গর্ভে জন্মেন, যোধবাইএর গর্ভে নহে। ব্লকম্যান শেষে আকবরনামারই অনুসরণ করিয়াছেন।

আবার প্রাইস সাহেবের অনুদিত জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে এক অদ্ভুত কথা লিখিত আছে উক্ত গ্রন্থের জাহাঙ্গীর বলিতেছেন,—

"The first of the Rajput chieftains who became attached to the government of my father Akbar was Bharmal, the grandfather of this Rajah Maun Sing, and pre-eminent in his tribe for courage, fidelity, and truth. As a mark of distinguished favour, my father placed the daughter of Bharmal in his own palace, and finally espoused her to me. It was by this princes I had my son Khassru."

আকবরনামায় লিখিত আছে যে, বিহারীমল্লের কন্যার গর্ভে আকবরের ঔরসে সেলিম বা জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। আবার প্রাইসের জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর মতে সেলিম বা জাহাঙ্গীরের ঔরসে বিহারীমল্লের কন্যার গর্ভে আকবরের জন্ম হয়। কি রহস্যময় ব্যাপার! ইলিয়ট প্রাইসের জাহাঙ্গীরের আত্মচরিতকে প্রকৃত গ্রন্থ বলেন না। তিনি যাহা হইতে অনুবাদ করিয়াছেন তাহাই প্রকৃত বলিতেছেন। তাঁহার মতে মানসিংহ খসরুর মাতুল। "Rajah Mansingh, who was in Bengal, was Khasru's maternal uncle." সুতরাং উক্ত গ্রন্থের মতে খসরুর মাতা বিহারীমল্লের কন্যা হন না। ভগবান দাসের কন্যা হন। এইরূপ মত ভেদে জাহাঙ্গীরের মাতা সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ মনে উদয় হয়।

( সম্পাদক

# কাজুলি তিস।

তোডার রাজপ্রাসাদস্থিত একটি সুসজ্জিত সুন্দর প্রকোষ্ঠের মণিমুক্তাখচিত রৌপ্য পর্য্যঙ্কোপরে দুগ্ধফেননিভ কুসুমশয্যায় একটি যুবতী ও একটি পুরুষ বসিয়া আছেন। যুবতীর অনুপম রূপজ্যোতি যেন কোন ভবিষ্যতের অমঙ্গল ছায়ায় ঈষৎ মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যুবতী আনত মস্তকে পদাঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছিলেন।

পুরুষটি যুবতীর স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া একটু আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন; "তোমার বাবাকে কি আমার প্রার্থিত নশ্বর প্রস্তরের কথা জানাইয়া ছিলে? তিনি কি বলিলেন?"

যুবতী আনত বদন আরো সঙ্কুচিত করিয়া কম্পিতকলেবরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "জানাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই।"

বজ্রগম্ভীরনাদে পুরুষটি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিয়াছেন?"

যুবতী ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত বল সংগ্রহ করিয়া অতি কষ্টে বলিলেন, "তিনি বলিয়াছেন, আমার বোধ হয় নাপুজি এইবার আমার স্ত্রীকে চাহিবে! এরূপ জামাতা আমি ভালবাসি না; যাউক্, সে আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যাউক।"

এই কথা শুনিবামাত্র পুরুষবর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, আরক্তিম গণ্ডের প্রতিবিম্বে হীরক কুণ্ডল লোহিতাভা ধারণ করিল, করদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইল। তিনি ত্বরিতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। রমণী দ্বারদেশে আসিয়া বাহুবল্লী দ্বারা পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া বলিলেন "শান্ত হও! ক্ষমা কর।"

"কি? ক্ষমা!" এই বলিয়া সবলে বাহুবল্লী বিচ্ছিন্ন করিয়া পুরুষবর

অগ্রসর হইলেন, তাঁহার চরণ তাড়নায় যুবতীর বক্ষঃস্থলে দারুণ আঘাত লাগিল, তিনি সহকারচ্যুত ব্রততীর ন্যায় ধরণীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

বুন্দিরাজ সমরসিংহ তিনটি পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, ১, নাপুজি (উত্তরাধিকারী) ২, হরপাল। হর জুজাবর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক সন্তান সন্ততি, তাহারা সকলেই হরপালপোতা নামে অভিহিত। ৩, জয়ৎসিংহ। ইনিই প্রথমে চম্বল নদের পরপারে হারকুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সমরসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বুন্দি সিংহাসনে সমারূঢ় হন। নাপুজি একজন প্রসিদ্ধ নরপতি বলিয়া কীর্ত্তিত। তিনি তোডার শোলাঙ্কি রাজের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একদা সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গমন করিতে করিতে তিনি এক খানি অতি সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তর দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই তাহার লইতে ইচ্ছা হইল। তিনি নিজ পত্নীকে পিতার নিকট হইতে তাহা চাহিতে বলিয়াছিলেন। তোডাপতি তাহাতে কি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই আগ্রহসহকারে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। পরে তাহার কিরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন, পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন।

গ্রীষ্মকাল, বেলা অবসান প্রায়। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। স্বর্ণকিরণে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত। মৃদু সমীরণ তাপদগ্ধ ধরার ক্লান্তি দূর করিতেছে। এমন সময়ে বুন্দি রাজবাটীর অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের একটি লতামণ্ডপে দুইটি রমণী বসিয়া আছেন। দুজনেই নীরব। ক্রমে সন্ধ্যার ধূষর অঞ্চল সমীরতাড়িত মেঘখণ্ডের ন্যায় ধরণীর দেহ আবরিত করিল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একজন কহিলেন "সখি! উঠ, উঠ, সন্ধ্যা-আরতির ঘণ্টাধ্বনি শুনা যাইতেছে এ বিশ্রামের সময় নয়।"

দ্বিতীয়া কহিলেন "হাঁ যাও।"

প্রথমা "যাও কি চল।"

দ্বিতীয়া—'কোথায় যাব বোন্। নয়নের আনন্দ, জীবনের সুখ যে দিন বিধাতা মুছিয়া দিয়াছেন, সে দিন হতে সকল আশায় বিসর্জ্জন দিয়াছি;

তুষানলে হৃদয় ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে ; যদি আমার মঙ্গল চাও, চিতা সাজাও। শান্তিময়ের প্রশান্ত ক্রোড়ে আশ্রয় লই।"

প্রথমা রমণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্নেহমিশ্রিত ভৎর্সনার স্বরে কহিলেন, "তুমি না রাজপুত কুমারী, তোডার শোলাঙ্কিরাজের দুহিতা! বীরবর নাপুজির মহিষী! একথা কি তোমার উপযুক্ত! রাজপুতবালা অসীম সাহস ও সহিষ্ণুতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তোমার ন্যায় আদর্শকুলবধূর এরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি বড় লজ্জা ও ঘৃণার কথা। রাজপুতের মেয়ে জহরব্রতের ভয় করে না। কিন্তু সে যখন বিপক্ষের হস্তে অপমানিত বা লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কা হয়, তখন, আর যদি কোন পুরুষ প্রেমদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে তাহলে হাসিতে হাসিতে রাজপুতের মেয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে। আর পারে, প্রাণপতির অন্তিম শয্যার পার্শ্বে শয়ন করিয়া জন্মান্তরে পুনর্ম্মিলনের আশায় সহমরণ যাইতে এ দুর্দ্দমনীয় লোভ কোন রাজপুত বালাই সংবরণ করিতে পারে না।"

শোলাঙ্কি রাজকুমারী সহচরী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সজলনয়নে কহিলেন, "সত্য বটে রাজপুতের মেয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, যাহাদের আশা আছে! স্বামী যখন যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিদায় লইতে আসেন, সেই পবিত্র পদধূলি মস্তকে লইয়া শক্রদমন তরবা'র হস্তে দিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় দেওয়া যায়, বিদায়ের মধুর আলিঙ্গন হৃদয়ে সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দেয়। শত্রু দলন করিয়া যদি ফিরিয়া আসেন, জয়মালা গাঁথিয়া বিজয়ী পতির গলদেশে পরাইতে পারিলে কত সুখ তা ত ভুলি নাই! কিন্তু এখন এমন করিয়া কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় শূন্য মার্গে কত দিন ঘুরিয়া বেড়াইব!"

সহচরী সস্নেহে মহিষীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, "সখি, উতলা হইও না, রাজা ক্রোধপরবশ হইয়া তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছেন, ক্রোধের শমতা হইলে অবশ্য অনুতপ্ত হবেন, সন্দেহ নাই! তোমার এই সুন্দর মুখখানি কত দিন না দেখিয়া থাকিবেন? সম্মুখে "কাজুলি তিস" সে দিন অবশ্যই স্মরণ করিবেন।" রাণী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

৩

বেলা এক প্রহর, তোডাপতি অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া দরবার গৃহে বসিয়া আছেন। একজন পত্রবাহক দূত দরবার-গৃহসমীপে দণ্ডায়মান আছে। রাজা পত্রখানি আদ্যন্ত পাঠকরিয়া মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। রাজার তৎকালীন মুখমণ্ডল দেখিয়া সকলের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল, রাজা দরবার ভঙ্গ করিতে আদেশ দিলেন।

একজন অমাত্য কহিলেন, "মহারাজ! দূতের প্রতি কি আদেশ হয়!"

রাজা কহিলেন "যাও দূত! রাজকুমারীকে বলিও "তোমার পিতা, তাহার প্রতিবিধান করিবেন।"

দূত প্রতিগমন করিল। সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরের বিশ্রাম-প্রকোষ্ঠে শোলাঙ্কি-মহিষী বিশ্রাম করিতেছেন, দুই জন দাসী তাঁহার পদসেবা করিতেছে। একজন পরিচারিকা ত্রস্তভাবে আসিয়া সংবাদ দিল, মহারাজ আসিতেছেন। অনতিবিলম্বে মহারাজ প্রবেশ করিলেন। দাসী দুইজন প্রস্থান করিল, মহারাণী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজ পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলে তিনিও পার্শ্বে বসিলেন, কিন্তু মহারাজের মুখভাব দর্শন করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলেন না। মহারাজ হস্ত-স্থিত পত্রখানি রাণীকে অর্পণ করিলেন, রাণী তাহা স্পর্শ করিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্র কার?"

রাজা কহিলেন "কন্যার"।

"কি সংবাদ আছে?"

অতি জড়িত কণ্ঠে রাণী এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজা ঘূর্ণিতলোচনে বলিলেন "সংবাদ শুভ, তোমার জামাতার গুণ,—আমার কন্যা নাপুজির গৃহদাসীর ন্যায় বাস করিতেছে, নাপুজি তাহাকে অশেষ প্রকারে পীড়ন করিতেছে।"

রাণী ধীরে ধীরে শয্যার আশ্রয় লইলেন ও গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন "মহারাজ,

তুমিই কন্যার এ দুঃখের কারণ, জামাতার সামান্য প্রার্থনা যদি রক্ষা করিতে, কিংবা তাহাকে যদি চলিয়া যাইতে না বলিতে, তাহা হইলে কন্যার এ দুর্গতি ঘটিত না।”

মহারাজ বলিলেন, ভাল, “আমি না হয় জামাতার অপমান করিলাম, তাহাতে কন্যার কি অপরাধ হইল ?”

রাণী। “অপরাধ তোমার কন্যা বলিয়া। অগ্নি যেমন জ্বলিয়া শুষ্ক তৃণপত্র গুলি অগ্রেই দগ্ধ করিয়া থাকে, তাহার জ্বলন্ত রোষানলে সরলা বালিকা ভস্মীভূত হইতেছে। মহারাজ! সন্তানের মুখের দিকে চাও, জামাতাকে ক্ষমা করে ডেকে পাঠাও।”

রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার মুখ দিয়া এই কথা কয়টি উচ্চারিত হইল “আমিই কন্যার দুঃখের কারণ, প্রতিকার আমারই কর্ত্তব্য।” রাণী শ্রবণমাত্র কম্পিত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে এই কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিল, তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। রাজা বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন।

৪

আজ ভরা শ্রাবণ রাজপুত দিগের মতে ইহা একটি পর্ব্বদিবস। উক্ত দিনে গৃহে উপস্থিত থাকিয়া ষষ্ঠী দেবীর পূজা এবং স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতে হয়। ইহা “কাজুলি তিস” নামে অভিহিত। যে যতদূরে থাকুক না কেন, গৃহে আসিয়া ঐ “কাজুলি তিস্” বাসরে নিজ বনিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবেই হইবে। বুন্দিরাজ নাপুজি উক্ত পর্ব্বোৎসবে স্বীয় সামন্তদিগকে বাটী গমনে অবকাশ দিলেন। অনন্তর তাহারা সকলে নগর পরিত্যাগ করিয়া গেলে, বুন্দিরাজ এক প্রকার অরক্ষিত রহিলেন। এই শুভদিনে সমস্ত রাজপুত-মহিলা নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিতেছে। আজ তাহাদের বড় আনন্দের দিন, সকলেই মুখভরা হাসি, বুক ভরা আনন্দ নিয়ে পরস্পর সম্মিলিত হইতেছে।

সন্ধ্যা আগত। রজতাধারে একরাশি পুষ্প লইয়া মহিষীর সখী রাণীর

কাছে উপস্থিত হইলেন। বিষাদের হাসি হাসিয়া রাণী কহিলেন “ও গুলি কি হইবে ?”

“কি হইবে এখনি দেখিতে পাইবে” এই বলিয়া সহচরী রাণীর কেশরাশি লইয়া কবরী বাঁধিতে লাগিল।

রাণী বলিলেন, “আজ এ সখ চাপিল কেন ?”

সখী বলিল “আজ যে কাজুলি তিস্ তোমার কি স্মরণ নাই ?”

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন “আজ কাজুলি তিস্”। তা বেশ, তুই কি আমাকে লইয়া ঠাট্টা করিতেছিস্ !”

সখীর সহসা মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল, দৃঢ়স্বরে কহিল, “না মহারাণী “আশৈশব তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ কর, সেই সাহসে তোমার কাছে কত আবদার করিয়াছি ও অসম্ভ্রমের কার্য্যও করিয়াছি, স্নেহগুণে তুমি মার্জ্জনা করিয়াছ, কিন্তু আমি আজ তোমাকে উপহাস করিতে আসি নাই। আজ রাজপুতদিগের পর্ব্বদিন। মহারাজ নিজ সামন্তদিগকে অবকাশ দিয়াছেন, অবশ্যই তিনি এ শুভ দিনের অবমাননা করিবেন না।”

রমণী সখীর প্রতি সজল কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “আর যদি তিনি হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অন্তঃপুরে না আসেন, তখন কি করিব।”

সখী বলিল “দেবদর্শনত চিরদিনই দুষ্প্রাপ্য ; কিন্তু তাই বলিয়া সাধক কি সাধনায় বিরত থাকে ? রক্ষিগণ স্থানান্তরিত হইয়াছে কেহ বাধা দিবে না ; তিনি ন্যায়পরায়ণ, অবশ্যই তোমার এ অর্ঘ্য প্রত্যাখ্যান করিবেন না”।

রাণী। যদি চরণে স্থান না দেন।

সখি। তখন আর চিন্তা কি ? হয় আজ ফুলশয্যা, না হয় এই বেশেই চিতাশয্যা। স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইবে। সকল দিক্ মুক্ত রহিয়াছে, তোমার সাজ সজ্জা বৃথা হইবে না।”

রাণীর মুখে আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, তিনি সখীর চিবুক ধরিয়া,

কহিলেন "সাধে কি তোকে ভাল বাসি, তুই আমার প্রাণের কথা বলছিলি কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে, আজ মণিমুক্তায় আমাকে সাজাইতে পার্‌বিনা। শুধু ফুলে সাজাও, ফুল গুলো যদি দেবতার কাজে না লাগে, তবে ওদের সঙ্গে এই অকিঞ্চিৎকর জীবনটা শুদ্ধ চিতানলে দগ্ধ করিব। সপ্তমীর চাঁদ যেন কাল এসে আমায় দেখে উপেক্ষার হাসি না হাসে।"

দুই জনে কথোপকথন করিতে করিতে বেশ ভূষা শেষ হইল। সখী দর্পণ আনিয়া রাণীর হাতে দিয়া হাসিয়া কহিল, "দেখ দেখি রাজা চিনতে পারবেন তো? আমার যেন ভ্রম হচ্ছে। তিনি আবার অনেক দিন দেখেননি।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল সহচরী রাণীর নিকট বিদায় লইয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করিল। মহানগরী নিস্তব্ধ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘ খণ্ড মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ চন্দ্রমাকে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আলোকমালায় মহানগরী আলোকিত। মধ্যে মধ্যে কুকুরের চীৎকারধ্বনি নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে। এই শুভদিনে সুখৈশ্বর্য্যের অধীশ্বরী বুন্দির মহারাণী ব্যথিত হৃদয়ে নিশা যাপন করিতেছেন। কখন শয্যায়, কখন ভূমিতে শয়ন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে কার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অর্দ্ধ যামিনী অতীত হইল, কাহারও মধুর সম্ভাষণ তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ে শান্তি সেচন করিতে আসিল না। তখন উঠিয়া বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া আকাশপানে চাহিয়া দেখিলেন, রাত্রি কত হইয়াছে; কিছু উপলব্ধি হইল না, ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। 'কি করি, আমার কর্ত্তব্য কি!' চিন্তা করিতে করিতে বারাণ্ডায় পদচারণা করিতে লাগিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, 'দিবসের ক্লান্তিপ্রযুক্ত মহারাজ নিশ্চয়ই নিদ্রিত হইয়া থাকিবেন, নচেৎ এত বিলম্ব হইবার কোন কারণ নাই। আমি যদি তাঁর সম্ভাষণে যাই, তিনি আমাকে দেখিয়া কত না লজ্জিত হইবেন, তাঁর আমার প্রতি কঠোর ব্যবহারের জন্ত বিলক্ষণ অনুতপ্ত হইবেন। তিনি নিদ্রা দেবীর কোমল অঙ্কে বিশ্রাম করিতেছেন, আমি তাঁহাকে নিষ্ঠুর ভাবিয়া মনে মনে কত ভৎ‍‍র্সনা করিতেছি। যাই আর বিলম্ব করার প্রয়োজন নাই।'

আশার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া রাণী অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া স্বামি সম্ভাষণে চলিলেন। রাজার শয়ন-মন্দিরের নিকটস্থ হইলে লজ্জা ও অভিমান আসিয়া তাঁহার গতিশক্তি রোধ করিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজবধূ এরূপ অনাবৃত স্থানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা অবৈধ স্থির করিয়া অগ্রসর হইয়া শয়ন-প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। দ্বার অর্গলাবদ্ধ ছিল না, স্পর্শমাত্র উদ্ঘাটিত হইল। কম্পিত কলেবরে ধীরে ধীরে রাণী গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সুসজ্জিত গৃহের এক পার্শ্বে একখানি পর্য্যঙ্কের উপর মহারাজ অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় নিদ্রা যাইতেছেন, গৃহশোভিত বেলোয়ারী ঝাড়ের আলোক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মহারাণী উদ্ভ্রান্তচিত্তে সেই মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইলেন। দ্বারোদ্ঘাটন মাত্রেই মহারাজের তন্দ্রা অপসৃত হইয়াছিল; মৃদু নূপুরধ্বনিতে তিনি জাগরিত হইলেন, নেত্রোন্মীলন মাত্র পুষ্পাভরণা রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া বনদেবী বলিয়া ভ্রম হইল, তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিলেন। দেবীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; রাজা কিন্তু স্থির অকম্পিত দৃষ্টিতে হতচেতনের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। পরে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। কাহারও বাক্যস্ফূরণ হইল না। বহুক্ষণ এইভাবে অবস্থিতি করিয়া শঙ্কিত চিত্তে রাণী মহারাজের পদতলে আশ্রয় লইলেন। ক্রমে মহারাজের মনের কোমলতা নষ্ট করিয়া শ্বশুর কর্ত্তৃক ঘোর অপমান কঠোর ভাব আনয়ন করিল। তিনি ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শোলাঙ্কি রাজকুমারী তুমি এখানে কেন?"

মুহূর্ত্তে কুসুমমালা শুকাইয়া গেল। এতদিনের আশা কল্পনা এক আঘাতেই ছিন্ন হইয়া গেল, সর্পদষ্ট শবের ন্যায় তাঁর মুখবর্ণ পাণ্ডুবর্ণ ধারন করিল, পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর রাজা আবার বলিলেন, "শোলাঙ্কিকুমারী স্থানান্তরে যাও, আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইও না" আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব

না করিয়া রাণী ভূমিতে দণ্ডায়মান হইলেন, নিদাঘদগ্ধ মুখকমল হইতে অমানুষিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল। নতজানু হইয়া স্থির অকম্পিত স্বরে কহিলেন, "মহারাজ বিদায় হই। কিন্তু বিদায়ের সময় একটি কথার উত্তর প্রদান করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। আমি কি অপরাধে মহারাজের পরিত্যক্তা হইলাম জানিতে চাই।"

কঠোরস্বরে রাজা কহিলেন, "তুমি অপরাধীর কন্যা, পুরুষ হইলে এ অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড হইত।"

রাণী।—"মহারাজ! আনতমস্তকে রাজাজ্ঞা বহন করিব। কিন্তু প্রভো, জন্মান্তরে ক্ষমা করিও।"

এই বলিয়া মহারাণী গমনোদ্যতা হইলেন। ব্যথিতা অবমানিতা রাজ-বালার বিষম মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইল। তাঁহার শরীরের সমস্ত বল কে যেন হরণ করিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার বোধ হইল।

মহিষী মন্দপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইবার সময় পশ্চাৎ ফিরিয়া একবার মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অমনি চারি চক্ষু মিলিত হইল, মহারাজ তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইলেন, ভিত্তিবিলম্বিত বিশাল মুকুরে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, মহারাণীর সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব পড়িয়া মুকুর যেন কাঁপিতে ছিল। সে চিত্র দেখিয়া মহারাজ শিহরিয়া উঠিলেন। সহসা প্রতি-মূর্ত্তির নেত্র হইতে ঝর ঝর করিয়া মুক্তা ফল বর্ষণ হইতে দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহারও নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাণী মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে অন্তঃপুরসমীপে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে তাঁহার সখী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া অভিমানে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, সে বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি মূৰ্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন।

৫

মহারাণীকে বিদায় দিয়া রাজার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, তিনি উন্মত্তের ন্যায় গৃহে পদচারণা করিতে লাগিলেন। ছুটিয়া মুকুরের নিকট রাণীর প্রতিবিম্ব দেখিতে যাইলেন, নিজের বিশাল অবয়ব প্রতিবিম্বিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাতে আঘাত করিলেন, দর্পণ চূর্ণ বিচূর্ণিত হইয়া চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। রাজা ক্লান্ত হৃদয়ে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুই হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া নিদ্রা দেবীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে তন্দ্রা আসিল; রাজা স্বপ্ন দেখিলেন,—পুষ্পাভরণা সেই রমণীমূর্ত্তি তাঁহার শিয়রে বসিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। রাজা ভুজদ্বয় প্রসারিত করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি মূর্ত্তি অপসৃত হইল, রাজারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন সেই বিষাদময়ী প্রতিমা যেন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাজা উদ্ভ্রান্ত চিত্তে বার বার বলিতে লাগিলেন "ক্ষমা কর! ক্ষমাকর! আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া যাইতেছে।" রাজা দুই হস্তে চক্ষু আবরিত করিলেন।

প্রাসাদের চতুর্দ্দিক হইতে রমণীকণ্ঠের মৃদু ক্রন্দনধ্বনি আসিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। রাজার অন্তঃকরণ ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আজ কাজুলি তিস। রাণীকে বিদায় দিয়া কাজ ভাল করিনি; যাই, অবশিষ্ট রজনী অন্তঃপুরে যাপন করিব। রাণী নিরপরাধিনী; তাহার উপর ক্রোধ করা বৃথা। কিন্তু আজ তাহাকে অপমানিত করিয়া বিদায় দিয়াছি, আবার আমি যদি এরূপ সময়ে উপস্থিত হই, আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইবে, তাহা হইলে আমার অপমানের প্রতিশোধ হইল কই? যাক্ সমস্ত রজনী নানারূপ দুঃস্বপ্নে নিদ্রা হয় নাই, শীতল সমীরণে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাই।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। আবার সেই

শত শত রমণীকণ্ঠের আকুল ক্রন্দনধ্বনি চারিদিক কম্পিত করিয়া তুলিল। ভয়ে, বিস্ময়ে মহারাজ হতচেতনের ন্যায় শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, রাজমার্গে জন মানবের যাতায়াত নাই,—এহেন সময় একজন ভীমকায় পুরুষ দ্রুতপদে রাজ-প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তাহার সর্ব্ব শরীর বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। সেই পুরুষ ক্রমে রাজার শয়নপ্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে আসিয়া গাত্রাবরণ মুক্ত করিলে, গৃহস্থিত আলোকে তাহার হস্তস্থিত শাণিত ভল্ল ঝলসিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজার শয্যার নিকট নতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রিত রাজার সমস্ত শরীর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার তপ্ত নিশ্বাসে রাজা জাগরিত হইয়া সম্মুখে ভীমকায় পুরুষকে দেখিয়া চমকিত হইলেন।

আগন্তুকের মুখে পৈশাচিক হাস্য, এবং হস্তেশাণিত ভল্ল দেখিয়া রাজা আপনার আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিলেন, আগন্তুককে চিনিতে বিলম্ব হইল না—দেখিলেন, আততায়ী আর কেহ নয়, স্বয়ং তোড়াপতি। নিমেষ মধ্যে তোড়াপতি হস্তস্থিত ভল্ল উত্থিত করিলেন, এবং প্রচণ্ড বেগে জামাতার মস্তকে আঘাত করিয়া বেগে পলায়ন করিলেন। সেই আঘাতেই নাপুজির জীবনের অবসান হইল।

৬

এইরূপ কাপুরুষোচিত উপায়ে জামাতাকে সংহার করিয়া উদ্ধত তোড়ারাজ পলায়ন করিয়া বুন্দির কিয়দ্দূরস্থ একটি গুহার সম্মুখে স্বীয় সামন্তগণের নিকট নিজের জঘন্য প্রতিশোধের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। সেই কন্দরের অভ্যন্তরে বুন্দির একজন সর্দ্দার নিজের অদৃষ্টচিন্তায় নিমগ্ন ছিল। অশ্বের ক্ষুর-ধ্বনিতে তাহার চিন্তা অপসৃত হইলে, সে দেখিল কতকগুলি অপরিচিত সৈনিক অশ্লীল কৌতুক বাক্যে হাররাওএর আচরণ সমালোচনা করিতে করিতে যাইতেছে। চতুর চৌহান সর্দ্দার তাহাদের ভাবভঙ্গিতে সমস্ত বিষয় অনুমান

করিয়া লইলেন, এবং সেই সময় শোলাঙ্কিপতিকে নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তরবারির আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিলেন। সেই ছিন্ন হস্ত উত্তরীয় দ্বারা আবৃত করিয়া সোলাঙ্কিরাজ রাজধানীর অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

প্রভাত হইতে না হইতেই বুন্দি রাজধানীতে হাহাকার উঠিল। রাজার এইরূপ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে সকলেই শোলাঙ্কিরাজকে সন্দেহ করিল। বহুক্ষণ এইরূপ শোকাভিনয়ের পর মহারাজকে সংকারের জন্য লইয়া চলিল। অন্তঃপুরে মহারাণী এই হৃদয়-বিদারণ কথা শ্রবণ মাত্র উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিলেন, এবং অচিরাৎ সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রজাবর্গের কাতর অনুনয় তাঁহাকে সে সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতে পারিল না। রাজপুতবালা নিজ কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

মহাশ্মশানে চন্দন কাষ্ঠের বৃহৎ চিতা সজ্জিত হইয়াছে, মহারাণী সখীবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। একে একে সহচরীদিগের নিকট ও চিতোরের নিকট বিদায় লইয়া চিতারোহণ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় চৌহানসর্দ্দার ছুটিয়া আসিয়া মহারাণীকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "মাতঃ! বিদায়কালে সন্তানের উপহার গ্রহণ কর।" এই বলিয়া বস্ত্রাবৃত হৈমবলয়শোভিত ছিন্নহস্ত শোলাঙ্কি রাজকুমারীকে অর্পণ করিল। তিনি পিতার হস্ত চিনিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা জাগিয়া উঠিল, শোকের উপর আবার শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখনই লেখনী লইয়া নিজ ভ্রাতাকে এই কয়টী কথা লিখিয়া পাঠাইলেন, "যদি তুমি এ কলঙ্ক মোচন না কর তোমার বংশ 'এক-হেতো' শোলাঙ্কির বংশ বলিয়া চিরকাল নিন্দিত হইবে।" পত্র প্রেরণ করিয়া সতী চিতানল প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অনন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া স্বামীর বামপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সতীদেহ স্পর্শমাত্র অগ্নি সহস্র জিহ্বা ব্যাদান করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, দেখিতে না পারিয়া দর্শকগণ হাহাকার করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত

হইয়া পড়িল। অমরাবতীতুল্য সুসজ্জিত রাজধানী শ্মশানের ভাব ধারণ করিল।

এদিকে যথাকালে পত্র শোলাঙ্কিরাজকুমারের হস্তগত হইল। পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল, নিদারুণ প্রতিশোধ-পিপাসা তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিল। কিন্তু সেই প্রচণ্ড প্রবৃত্তির তৃপ্তিবিধানে আপনাকে অসমর্থ জানিয়া তিনি একটি পাষাণ স্তম্ভে স্বীয় মস্তক আঘাত করিয়া অচিরে প্রাণত্যাগ করিয়া বংশগত দুর্নাম হইতে আপনাকে রক্ষা করিলেন।

শ্রীমতী

# ভারতের লিখন প্রণালী।

## ( পরিপুষ্টি )।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যে সকল ভারতীয় বণিক ব্যাবিলন হইতে বর্ণজ্ঞান আহরণ করিয়া পশ্চিম ভারতে আনিয়াছিল, তাহারা তৎসহ তৎকালীন ব্যাবিলন-প্রচলিত লিখন-প্রণালী আনয়ন করে নাই কেন? এই লিখন-প্রণালীর সাহায্যে কেবল যে তাহাদের ব্যবসায়ের কাগজ পত্র সুন্দররূপে লিখা চলিত তাহা নহে, তদ্দ্বারা ইষ্টক খণ্ড বা কর্দ্দম-বেদির ( tablets ) উপর পুস্তকাকারে লিখাও যাইতে পারিত।

এ সমস্যা বড় কঠিন। কিন্তু এ সমস্যা কেবল ভারতেই উত্থিত হয় নাই। অন্যত্রও—ইউফ্রেটিস্ উপত্যকায় যে সকল ব্যবসায়ী বা জাতি বর্ণজ্ঞান শিক্ষা করে, তাহারাও ইষ্টক প্রভৃতির উপরে লিখিবার প্রণালী অনুসরণ করে নাই। ইষ্টক, tablet, এবং শিলা—সমস্তই কর্দ্দমময়; ভারতের বহু বিচ্ছিন্ন প্রদেশে ঐ সকলের উপর অক্ষর এবং পদরচনা করিতে দেখা যায়। ইষ্টকের অক্ষর যদিও প্রাচীন-লিপির প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তত্রাচ উহা কেবল রাজমিস্ত্রির অস্তিত্ব পরিচায়ক। মাটীর tabletএর উপর কেবল ছোট ছোট ছত্র বা লিপি খোদিত হইত এবং শিলের উপরে উপাখ্যান ( legends ) সমূহই কেবল লিখিবার সাধারণ নিয়ম ছিল। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, পুস্তক লিখিবার বা সংবাদ প্রভৃতি লিখিয়া পাঠাইবার উদ্দেশ্যে 'কাদা' জন-সাধারণের মধ্যে সচরাচর প্রচলিত ছিল না। ডাঃ Hacy এই কাদার tabletএর উপর লিখিত একখানি প্রাচীন লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা একখানি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ-লিপি। অবশ্য স্বর্ণ ও তাম্র প্রশস্তিও অতি পুরাতন এবং তৎকালে

সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইত। এতন্মধ্যে তক্ষশিলার তাম্র-লিপি এবং মঙ্গ্-গোর (Maung-gou) স্বর্ণফলক লিপির প্রতিকৃতি এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে এই অভিপ্রায়ে ভূর্জ্জপত্র বা তালবৃক্ষ পত্র ব্যবহৃত হওয়ায় উভয় ভাবেরই (literary and archœological) প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ, খোতানের (Khotan) ত্রয়োদশ মাইল দূরবর্ত্তী গোসিঙ্গ্ বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একখানি পুস্তকের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপি কালি দ্বারা ভূর্জ্জপত্রের উপরে খারোষ্ট্রী (Kharostri) অক্ষরে লিখিত। ৫০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে খারোষ্ট্রী বর্ণমালা পরিচিত হইয়া গান্ধ্রদেশ (Gandhara) বাসী কর্ত্তৃক তাহা ব্যবহৃত হয় (১)। এই পাণ্ডুলিপির যে অংশ প্যারিস্ এবং সেণ্ট পিটাস্‌বর্গ নগরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা খৃষ্টীয় অব্দারম্ভের কিছু পূর্ব্বে বা পরে গান্ধ্রতে লিখিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তকাদি হইতে কতকগুলি ধর্ম্মসূত্র উদ্ধৃত করিয়া পদ্যে—পালীভাষা হইতেও অপ্রাচীন তদ্দেশীয় প্রাকৃত ভাষায় তাহা লিখিত হইয়াছে। (২)

পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডুলিপির বহুদিন পরের আর একখানি পাণ্ডুলিপি কাপ্তান বোয়ার (Bower) কর্ত্তৃক কাছারের নিকটবর্ত্তী মিংগাই (Mingai) নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে ঔষধের ব্যবস্থা এবং সাপ খেলাইবার মন্ত্র চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দী কালের অক্ষরে কালী দ্বারা ভূর্জ্জপত্রের উপর লিখিত

(১) "The name of this alphabet has always been spelt *kharosthi*. But Professor Sylvain livi in his just published article in the *Bulletin de l'cole francais d' extreme-orient* for 1902 has clearly shown that the right spelling is as above, and that the Kharostra is simply the name of a country, to wit, Kachgar."—David.

(২) See Senart in the *Journal Asiatique* for 1898; and compare Rh. David's note in the J. R. A. Society for 1899.

হইয়াছে। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির ভূর্জ্জপত্র তালপত্রের অনুকরণে কর্ত্তিত হইয়াছে, এবং পত্রের মধ্যস্থানে ছিদ্র করিয়া সূত্র দ্বারা বাঁধা আছে। তাল-পত্রের পাণ্ডুলিপি একত্রে বাঁধিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে সচরাচর পত্রের মধ্যস্থানে ছিদ্র করা হয় কিন্তু ভূর্জ্জপত্রের পাণ্ডুলিপিতে ঐ প্রকার ছিদ্র করিলে পত্র ছিঁড়িয়া যায়। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির পত্রও ঐরূপ সূত্রের টানে স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। পাণ্ডুলিপিখানির ভাষা অনেকটা প্রাচীন সংস্কৃতের ন্যায়, তজ্জন্য ইহাকে সংস্কৃত বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে যে পাঁচটী সংক্ষিপ্ত বিষয় আছে, তাহাতে বহুতর গ্রাম্য ভাষা দেখা যায়।(১) আর একখানি অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি তুকিস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যতগুলি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই গুলিই অতি পুরাতন। অপর কতকগুলি ডাঃ Hoernle-এর নিকট আছে, তাহার পাঠোদ্ধার এবং সম্পাদন কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই।

বোয়ার আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি যখন সংস্কৃত ভাষায় ( যদিও ভাল সংস্কৃত নহে ) এবং গালিঙ্গা পাণ্ডুলিপি পালী ভাষার পরবর্ত্তী এবং মিশ্রিত ভাষায় লিখিত, তখন ইহা হইতে স্থির করা যাইতে পারে যে, পালী হইতে যখন সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন তখন বোয়ার-এর পাণ্ডুলিপির ভাষাই প্রাচীন। এই পাণ্ডুলিপির নকলখানি যাহা বর্ত্তমানকালে বিদ্যমান আছে, তাহা দুই এক শতাব্দী আগে হোক্ বা পরে হোক্ তাহাতে কিছু আসে যায় না। ইতালিন এবং লাতিন ভাষায় যেরূপ ব্যবধান, পালী এবং সংস্কৃতেও তেমনি সময় ব্যবধান। ভারজিলের গ্রন্থাবলী যেমন ডান্টের গ্রন্থাবলী হইতে প্রাচীন—তাহা যে সময়েই

(১) See note, on this Ms., Dr. Hoernle's magnificent edition of the texts, with lithographed reproductions, transliterations, and translations. Professor Bupler's preliminary remarks on it are in the fifth volume of the *Vienna oriental Journal.*

কেন মুদ্রিত হোক্ না, তদ্রূপ প্রাচীন পাণ্ডুলিপির নকল যে সময়েই কেন করা যায় না, তাহা প্রাচীনই রহিয়া যায়। সুতরাং যে সময়েই নকল করা হইয়া থাকুক্ না কেন, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি পালী ভাষায় লিখিত পাণ্ডু-লিপি হইতে প্রাচীন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এবং তজ্জন্যই পালীভাষার পরবর্ত্তী ভাষা সমূহ অপেক্ষাও প্রাচীন।

বোয়ারের পাণ্ডুলিপিখানিই যে কেবল গোসিঙ্গের পাণ্ডুলিপি হইতে প্রাচীন তাহা নহে, পরন্তু উহার ভাষাও ( পদ্য ) শেষোক্তখানির ভাষা ( পদ্য ) হইতে প্রাচীন। তাহার মূল কারণ—শেষোক্তখানি প্রাকৃত পালীর অনুরূপ ভাষায় লিখিত। উক্ত দুইখানি পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিলে এবং লিপির সময়ের প্রাচীন প্রমাণ আমার নিকট অজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও আমি কেবল উহার ভাষা দেখিয়াই পুর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি। কারণ যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি, যে সময়ের কোনও পুস্তক বা প্রস্তর-লিপি যত বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবে, ততই তাহাতে গ্রাম্য শব্দ এবং পালী শব্দ ও বৈয়াকরিণ পদের ভেজাল কম হইবে। পালী ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে বয়সে ছোট।

ভাষার বৈষম্য বুঝাইবার জন্য যাহা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট। খোদিত লিপির তুলনা দ্বারা আরও সহজে বুঝান যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—Mr. Peppe'র আবিষ্কৃত শাক্য স্তূপের হাঁড়ির ( Vase ) উপরের লিপির বিষয় ধরুন। আমার মতে, ভারতে এ যাবত প্রকাশিত খোদিত লিপির মধ্যে উহাই প্রাচীন। তাহাতে আমরা কি দেখিতে পাই ?

(১) ভাষা সম্বন্ধে ইহাই দেখিতে পাই যে, উহা প্রচলিত কথিত ভাষা। এইরূপ ভাষা জীবন্ত।

(২) বর্ণবিন্যাস ; হলবর্ণের ( Consonants ) অসাধু প্রয়োগ।

(৩) ব্যঞ্জনবর্ণের উপরে চিহ্ন দ্বারা স্বরবর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) যুক্ত অক্ষর যুক্তরূপে উচ্চারিত হইলেও যুক্তরূপে লিখিত হইত না।

(৫) একত্র অনেকগুলি হলবর্ণের প্রয়োগ নাই। অর্থাৎ একত্র বহু হলবর্ণ লিখিত হইত না ( যথা—উজ্জ্বল )।

আপনারা দেখিবেন যে, ইহার বর্ণ বিন্যাস পদ্ধতি অতিশয় অসম্পূর্ণ। বর্ণ গুলিকে ঠিক উচ্চারিত বর্ণ না বলিয়া যেন শব্দের ধ্বনি বিভাগ বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে,—শাক্যানাং শব্দ পূর্ণরূপে লিখিত না হইয়া শক্য নং এইরূপে লিখিত হইত। প্রত্যেক হলবর্ণে অন্য স্বর সংযুক্ত না থাকিলেও অকার সংযুক্ত আছেই। এই শাক্য স্তূপের সময়ে স্বরবর্ণের ( vowels ) হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভেদ হয় নাই। যুক্তস্বর লিখিত হইত না, হসন্ত বর্ণ উচ্চারিত হইবার কোন লিখিত সঙ্কেত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সকল অভাব এবং যুক্ত হল বর্ণের লিখন-প্রণালীর অভাব বশতঃ উচ্চারিত ভাষাকে সম্যক্ রূপে লিখিয়া প্রকাশ করা অতীব কঠিন ছিল।

ভারতীয় লিপিমালার এতৎ পরবর্ত্তী অবস্থাতেই অশোক লিপি। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে ৩৪টী অশোক লিপি আবিষ্কৃত হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ M. Senarat তাঁহার 'পিয় দশীর শিলা লিপি' গ্রন্থ ( Inscriptions de-Piyadasi ) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের সাহায্যেই ভরতস্তূপের অধিকাংশ লিপির তুলনা করিতে হইবে। অশোক লিপি হইতে ভরত স্তূপের কতকগুলি লিপি প্রাচীন, কতক গুলি নূতন এবং একখানি কি দুই খানি লিপি অশোক লিপির বহুকাল পরে খোদিত হয়।

তৃতীয় খৃষ্টাব্দের এই লিপি সমূহের দুইটী লিপির দুইটী বিষয় অতি উল্লেখ যোগ্য। প্রথম বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি অনেকাংশে উন্নত। স্বরবর্ণের বিশেষত্ব এই যে, দীর্ঘস্বরের চিহ্ন ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং একবার যুক্ত স্বরও দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্ত এবং একাধিক হলবর্ণ একত্রে লিখিত হইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মোটের উপর অক্ষর মালা পরিষ্কার ভাবে রীত্যনুযায়ী খোদিত হইয়াছে, তজ্জন্য অক্ষর গুলি অধিকতর অভ্রান্ত এবং সম্পূর্ণ স্বর পরিচায়ক ( phonetic ) হইয়াছে।

পক্ষান্তরে খোদাইকারী বা লিখকগণ অথবা উভয়ে প্রচলিত ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ তাহাদের নিজেদের নিকট যেরূপ বর্ণবিন্যাস এবং ব্যাকরণ সঙ্গত পদ বিশুদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে, তদনুরূপ বর্ণবিন্যাস ও পদ যোজনা করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছে। এ হিসাবে এই লিপিমালা সঠিক নহে এবং তৎকাল প্রচলিত ভাষার পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয় নাই।

ডেভিড্ মহোদয় বলেন, আমাদের বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি যখন স্থিরীকৃত হয়, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত বিষয়টীর সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। ইংরেজগণ সম্ভবতঃ চিরদিনই বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় would এবং could শব্দ উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি কোনও সময় স্মরণ করিয়া ছিলেন যে, যখন would শব্দের উচ্চারণে প্রাচীন কালে একটী 'l' ব্যবহৃত হইত, তখন ঐ ব্যক্তি অধিকতর শুদ্ধরূপে বর্ণবিন্যাসের জন্য would শব্দের বর্ণবিন্যাসে একটী 'l' যোজনা করিয়া দেন। কিন্তু তখন কথিত ভাষায় আর 'l' উচ্চারিত হইত না। অপর কোন ব্যক্তি এইরূপ could শব্দের মধ্যেও একটী 'l' যোগ করা নিরাপদ বোধ করিয়া ছিলেন। কিন্তু could এর প্রাচীন অথবা আধুনিক উচ্চারণে কখনই 'l' উচ্চারিত হইত না। এই পাণ্ডিত্যের ফলে এক্ষণে ঐ দুইশব্দ অকারণে 'l' এর বোঝা বহিতেছে। ভারতবর্ষেও তৎকালে এইরূপ প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কথিত ভাষাকে লেখায় পরিণত করিতে উচ্চারণের অনুরূপ বর্ণমালা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক কিন্তু ক্রমশ সেই চেষ্টার উপর পাণ্ডিত্যাভিমানী গণের ভাষায় বৈয়াকরণিক ও ঐতিহাসিক বিশুদ্ধতা রক্ষা করার চেষ্টাও ক্রমশঃ সংযোজিত হইতে লাগিল। শব্দের কথিত উচ্চারণ অপেক্ষা তাহার অতীত ইতিবৃত্তের প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদত্ত হইতে লাগিল। তাহার ফলে প্রশস্তির ভাষা এবং বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি উভয়ই ক্রমে ক্রমে অপ্রাকৃত হইতে লাগিল অর্থাৎ কথিত ভাষা হইতে ক্রমে ক্রমে ভিন্নরূপ ধারণ করিতে লাগিল। শব্দের কথিত উচ্চারণ ও তাহার প্রাচীন ইতিবৃত্ত এতদুভয়ের বিশুদ্ধি রক্ষার চেষ্টা হইতে দুই বিভিন্ন প্রক্রিয়া

সমুদ্ভূত হয়। তাহা কতিপয় শতাব্দী স্বকার্য্য সাধন করিতে করিতে অবশেষে যেমন প্রত্যেক বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল, যেমন প্রত্যেক বর্ণকে উচ্চারিত ধ্বনির অনুরূপ করিয়াছিল, তেমনি কথিত ভাষাকে প্রশস্তি ও স্তম্ভলিপি হইতে একবারে উঠাইয়া দিয়া তৎস্থানে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ব্যবহার করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। এইরূপ বর্ণের উৎকর্ষতা এত হয় যে, পৃথিবীতে আর কোন ভাষায় তদ্রূপ হয় নাই; কিন্তু প্রশস্তির ও স্তম্ভের ভাষাকে একরূপ মৃত ভাষায় পরিণত করিয়া ফেলে,—উহা আর কথিত জীবন্ত ভাষা ছিল না।

কাটিওয়ারের অন্তর্গত গিরনারের (girnear) 'রুদ্রদমন' লিপিই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার অতি প্রাচীন লিপি; উহা ৭২ শকাব্দে খোদিত হয়। সুতরাং উহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লিপি। এই অবস্থায় উপনীত হইতে অশোকের সময় হইতে চারিটী শতাব্দী প্রয়োজন হইয়াছে।

মুদ্রার লিপিতে আরও শিক্ষনীয় বিষয় আছে। অনুমান ২০০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ক্ষত্রপা (Kshatrapa) সাম্রাজ্যের সত্যধন নৃপতির মুদ্রার অনুরূপ এক মুদ্রায় সংস্কৃত ভাষার লিপি আছে।—আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহের মধ্যে তাহাই সর্ব্বপ্রাচিন। (১) এই মুদ্রায় খোদিত সাতটী শব্দেরই সংস্কৃত বিভক্তি আছে, কেবল একটী শব্দ সংস্কৃত সন্ধির নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুদ্রাতে পালী কিম্বা তৎকাল কথিত ভাষায় উপাখ্যান লিখিত আছে। ইহার পরবর্ত্তী দুইশত বৎসর উপরোক্ত বিশুদ্ধ বা প্রায় বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিপি খোদিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রণালী অবশেষে বাধ্য হইয়াই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে কথিত ভাষাই মুদ্রাপৃষ্ঠে সচরাচর ব্যবহৃত হইত, তবে টাকশালার কর্ম্মচারিগণ আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্ত ঐ কথিত ভাষার মধ্যেও এক একটী শুদ্ধ সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে

(১) Rapson in the I. R. H. S. 1899, P. 399.

পারিতেন না। কিন্তু অপণ্ডিত জন সাধারণ ঐ কর্ম্মচারীবৃন্দের পাণ্ডিত্যের সমাদর বুঝিত না। সুতরাং অবশেষ রাজা, জনসাধারণের দুর্ব্বোধ্য অথবা অবোধ্য মুদ্রা প্রচার করিতে বিরত হন। ডেভিড্ বলেন, আমাদের দেশেও (ইয়ুরোপে) উনবিংশশতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ ভাবেই কোন সুপ্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তির সম্মানার্থে স্তম্ভলিপি সর্ব্বদাই লাটিন ভাষায় লিখিত হইত। অধিকাংশ মুদ্রাতেই লাটিন ভাষায় মটো (motto) লিখিত হইত এবং সমগ্র ইয়ুরোপ খণ্ডেও সে দিনও—বর্ত্তমান সময় হইতে বেশী দিন পূর্ব্বে নহে, লাটিন ভাষাতেই নানাবিধ গ্রন্থ লিখিত এবং ঐ ভাষাতেই শিক্ষা বিতরিত হইত। (১) পঞ্চম খৃষ্টাব্দে ভারতের যেমন অপ্রচলিত সংস্কৃত বিশুদ্ধ কথা সর্ব্ব বিষয়ে ব্যবহৃত হইত, সেরূপ অবস্থা আমাদের দেশে কখনও উপস্থিত হইবে না। তত্রাচ এ অবস্থা হইতে আমরা অধিক দূরবর্ত্তী নহি এবং এ বিষয়ে ভারতবর্ষ এবং ইয়ুরোপ উভয় প্রদেশেরই অবস্থা প্রায় একরূপ। উভয় দেশেই মৃতভাষা ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, ধর্ম্মকার্য্যেই ইহার বিশেষ গৌরব ছিল। যদিও বহুশতাব্দী বহুতর ভাষা জনসাধারণের মধ্যে কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল, তত্রাচ ঐ বিশুদ্ধ সংস্কৃত প্রায় সকলেই বুঝিত। উভয় দেশেই এমন সময় ছিল, যখন, পুরোহিতগণ জ্ঞান বিস্তারের প্রধানতম কারণরূপে বিবেচিত হইতেন; সুতরাং ধর্ম্ম মন্দিরের ভাষাই বহুতর শিক্ষিত ও বর্দ্ধিষ্ণু জনমণ্ডলীর সহিত মনোভাব আদান প্রদানের ভাষারূপে পরিচিত হইত, এতদ্ব্যতীত অপর কোন ভাষা দ্বারা তদ্রূপ হইতে পারিত না। কিন্তু যাহারা জনসাধারণের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতে ইচ্ছা করিত, তাহারা অপ্রচলিত বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার না করিয়া প্রচলিত ভাষাই ব্যবহার করিত। সে হিসাবে ইহাকে সংস্কার কার্য্য বলা যাইতে পারে।

এইসাধারণ প্রচলিত ভাষাই প্রাকৃত কিন্তু ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষেও

১) Even in 1855. the first palitext edited in Europe was edited with Latin introduction. Latin notes. and a Latin translations.

এবিষয়ে প্রভেদ না ছিল এরূপ নহে। ভারতবর্ষে জনসাধারণের ভাষাই অগ্রবর্ত্তী তাহার সংস্কারেই বিশুদ্ধ ভাষার উৎপত্তি, সুতরাং আমরা ঐ উভয় ভাষার সংমিশ্রনে একটী আধা সংস্কৃত আধা প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার অনেক সময় দেখিতে পাই ; তাহা কখনও সংস্কৃত বহুল প্রাকৃত কখনও প্রাকৃত বহুল সংস্কৃত।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

# রাণী ভবানী।

বঙ্গীয় রমণীকুলে তুমি যে গো—
প্রাতঃস্মরণীয়া ;
তোমার পবিত্র কথা   যথা যাই শুনি তথা,
স্বর্গীয় অশেষ গুণে, হে ললনে,
তুমি বরণীয়া।
প্রাবৃটের কাদম্বিনী করে যথা
বারি বরিষণ,
তেমতি বসন, ধন,   দীনে করি বিতরণ,
লভিলে অক্ষয় কীর্ত্তি, বঙ্গ-ভূমে
রমণী রতন !
লভি ভূরি ভূমি দান বাঙ্গালার
ব্রাহ্মণ নিকর,
তুলি সবে দুই কর,   আশীষিছে নিরন্তর,
এ মর জগতে দেবি তাই তুমি,
হইলে অমর।
কুশাগ্রীয়া বুদ্ধি তব ইতিহাস
দেয় পরিচয়,
যাহার উজ্জ্বল ভাতি, আলোকে বাঙ্গালী জাতি,
দুর্লভ রমণী কুলে সে প্রতিভা
অনন্ত অক্ষয়।
অধীনতা নাশিবারে অভাগিনী
বঙ্গ জননীর।

যত বঙ্গ-ধুরন্ধর যবে বদ্ধ পরিকর,
তুমি মাত্র নিষেধিলে খাল কেটে,
আনিতে কুম্ভীর।

## উমিচাঁদ

কলঙ্কী, স্বদেশ দ্রোহী তুমি উমিচাঁদ,
যার স্তন্য সুধা ধারা,
পান করি বসুন্ধরা—
হেরিলে, তাহার তরে পাতিলে কি ফাঁদ ?
ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতী তুমি উমিচাঁদ।
ঐ উদ্ঘাটিত হের, নরকের দ্বার,—
সামান্য অর্থের তরে,
যে পারে পরের করে,
সমর্পিতে জননীর ভবিতব্য ভার,
অপবিত্র দেহ তার,
নহে বাহু বসুধার,
অনন্ত নরকে চির নিবাস তাহার।
যত দিন এ ধরায়,
মানব অস্তিত্ব হায়—
রহিবে, রটিবে চির কলঙ্ক তোমার।
তুমি সে কালিমা রেখা শুভ্র বাঙ্গালার।

———

---


কলিকাতা, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্‌ প্রেসে মুদ্রিত।

৩য় বর্ষ | শ্রাবণ—১৩১৪। | ৪র্থ সংখ্যা।

সচিত্র

মাসিক পত্র।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি. এল.

সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা ] [ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

...বন্ধের সত্যাসত্যের জন্য লেখকগণ দায়ী।

প্রথম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা। তৃতীয় পর্য্যায়। ১৩১৪, শ্রাব

শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় বি, এল.,—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সহকারী সম্পাদক।

## সূচী।



## নিয়মাবলী।

ঐতিহাসিক চিত্রের জন্য প্রবন্ধাদি, বিনিময়ার্থে পত্রিকা প্রভৃতি ও সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে বহরমপুর খাগড়া পোঃ মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় এবং টাকা কড়ি, চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপনের হারও কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও গ্রাহক করা যায় না। গ্রাহকগণ মূল্যাদি পাঠাইবার সময় বা অপর কোন বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিবার সময় নম্বর দিয়া লিখিবেন। মোড়কের উপর যে নম্বর থাকে তাহাই গ্রাহক নম্বর

নূতন গ্রাহক হইলে "নূতন" কথাটি এবং নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

প্রতি মাসের পত্রিকা তৎপর মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা না পাইলে ১৫ই তারিখের মধ্যে না জানাইলে আমরা পুনরায় দিতে বাধ্য নহি। নমুনার জন্য ৵০ তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট—কলিকাতা
মেট্‌কাফ্ প্রেস।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

# ঐতিহাসিক চিত্র।

## দায়ুদ খাঁ।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে গৌড়ের পাঠান সিংহাসন স্বাধীন নরপতিবৃন্দকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপিত করিয়াছিল। প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীনতা-লক্ষ্মী সেই সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বে কল্যাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে দিন হইতে পানিপথ-ক্ষেত্রে পাঠান নিশানকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া মোগলের বিজয়-পতাকা ভারতের ভাগ্যাকাশে সমুদিত হইল, সেই দিন হইতে পাঠানলক্ষ্মী চিরবিদায় লইতে আরম্ভ করেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি দিল্লী হইতে অন্তর্হিতা হইয়া কয়েক বৎসর পরে গৌড় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। দিল্লী পরিত্যাগ করিলেও গৌড়ের প্রতি মমতাবশতঃ তিনি তাহাকে আশ্রয় করিয়া আরও কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু আবার যখন পানিপথ-ক্ষেত্রে মোগল-বিজয়কেতু মধ্যাহ্ন ভাস্করকে সমাচ্ছাদিত করিয়া সমুত্থিত হইল, তখন হইতে তিনি ধীরে ধীরে গৌড়ের ভাগ্যে অধীনতার ছায়া বিস্তার করিয়া অন্তর্ধানের উপক্রম করেন। গৌড়ে অধীনতার ছায়া বিস্তৃত হইলেও সান্ধ্য সৌরকিরণচ্ছটার ন্যায় তাঁহারও জ্যোতিষ্কণা অল্পদিন লক্ষ্মণাবতীকে আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে বিরাজিত রাখিয়াছিল।

যে সময়ে গৌড় আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত ছিল; সেই সময়ে দায়ুদ খাঁ গৌড়-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পাঠানের শেষ রাজচ্ছত্র মস্তকে

ধারণ করিয়াছিলেন। যখন মোগলের বিজয়-পতাকা পানিপথ হইতে আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে দ্রুতসমীরণসঞ্চালিত হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইতেছিল, তখন দায়ুদ খাঁ পাঠানলক্ষ্মীর অঞ্চলসূত্র ধারণ করিয়া তাঁহার অন্তর্ধানের বাধা জন্মাইতেছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় সেই ক্ষীণসূত্র অচিরেই ছিন্ন হইয়া যায়। মোগলকেশরী আকবর সাহের হুঙ্কারে পাঠানলক্ষ্মী ভীত ও চমকিত হইয়া সেই অঞ্চলসূত্র ছিন্ন করিয়া নিমেষের মধ্যে গৌড় হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিতা হন। দায়ুদ খাঁর ক্ষীণ চেষ্টা তাঁহাকে গৌড়ে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হয় নাই। মোগলের শাণিত তরবারি দায়ুদের রুধিরপানের জন্য লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া ধাবিত হইতেছিল, এবং তিনিও প্রকৃত পাঠানের ন্যায় স্বীয় মস্তক বলি দিয়া সেই তরবারির পিপাসা নিবারণ করিয়াছিলেন। কিরূপে দায়ুদ খাঁর উত্থান ও পতন হয়, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

বাবর সাহ দিল্লী সাম্রাজ্যের একাধীশ্বর হইয়া ভারতে মোগল রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিলেও, হুমায়ুন তাহাকে সুদৃঢ় রাখিতে পারেন নাই। পাঠানবীর সেরসাহের অমিত বিক্রমে হুমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সেরসাহের মৃত্যুর পর তদ্বংশীয় দুর্ব্বল রাজগণের হস্ত হইতে হুমায়ুন আবার দিল্লী সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। সেরসাহের রাজত্বকালে অনেকগুলি পাঠানবংশ আপনাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া, তাহার নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেরাণী বংশই প্রধান। কেরাণীগণ ভোজপুর, খাসপুর, টাঁড়া প্রভৃতি স্থানের জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত বংশের তাজ খাঁ ও সুলেমান খাঁ নামক ভ্রাতৃদ্বয় সেরের পুত্র সেলিম সাহের অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুলেমান বিহারের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। তাজ খাঁ সুলেমানের সহকারিরূপে বাঙ্গলা অধিকার করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সুলেমান বঙ্গরাজ্যের একাধীশ্বর হইয়া উঠেন।

যে সময়ে সুলেমান বাঙ্গলার একাধিপত্য লাভ করেন, সে সময়ে আকবর

বাদসাহ মোগলের রাজচ্ছত্র মস্তকে ধারণ করিয়া আসমুদ্র হিমালয় অধিকারের জন্য শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিলেন। সেই প্রবল বন্যার মুখে আপনাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া সুলেমান তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিলেন। বাদসাহও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গরাজ্য হইতে কিছুদিনের জন্য আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অপসারিত করিলেন। কিন্তু উভয়ে উভয়ের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বিস্মৃত হইলেন না। সুলেমান বাঙ্গলা ও বিহারের সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া রোটাসদুর্গ অধিকারের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু আকবর তাঁহাকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিলেন না। বাদসাহের তর্জ্জনীতাড়নায় সুলেমানকে রোটাসের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। সুলেমান অনেক দিন হইতে উড়িষ্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, বাদসাহ তাহা বুঝিতে পারিয়া উড়িষ্যার রাজাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু সে সময়ে বাদসাহ পশ্চিম দিক্ অধিকারের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। সুলেমান সেই অবকাশে উড়িষ্যা অধিকার করিয়া লইলেন। যাজপুরের নিকট তাঁহার সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত যুদ্ধে উড়িষ্যার শেষ হিন্দুরাজা মুকুন্দদেব নিহত হন। ইহার পর সুলেমান কোচবেহার অধিকারে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সমস্ত দিগ্বিজয়ে আকবর বাদসাহ তাদৃশ সন্তুষ্ট নহেন জানিতে পারিয়া, সুলেমান মধ্যে মধ্যে উপহার পাঠাইয়া বাদসাহকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপে প্রায় নয় বৎসর গৌড়রাজ্যে একাধিপত্য করিয়া সুলেমান ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

সুলেমানের মৃত্যুর পরই গৌড়ের পাঠানলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়জিদ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু অল্পদিন পরে তিনি তাঁহার ভগিনীপতি হাসু কর্ত্তৃক নিহত হন। হাসু সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, সুলেমানের প্রধান অমাত্য লোদী খাঁ বায়জিদের হত্যার প্রতিশোধের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি অন্যান্য আফগান সর্দারকে নিজ পক্ষে আনয়ন করিয়া, হাসুর প্রাণদণ্ডবিধান ও সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ূদকে গৌড়ের সিংহাসন প্রদান করেন।

গৌড়ের স্বাধীন নরপতিগণ যে সিংহাসনকে ধন্য করিয়াছিলেন, তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া যুবক দায়ূদ স্বাধীনতার রসাস্বাদের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। যদিও তাঁহার পিতা সুলেমান মধ্যে মধ্যে উপহার প্রদান করিয়া "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" কে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন, তথাপি তিনিও একেবারে গৌড়রাজ্য হইতে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীকে চিরনির্ব্বাসিতা করেন নাই। দায়ূদের মনে যে এ বিষয়ের উদয় হয় নাই এমন নহে। অধিকন্তু তিনি পিতৃপরিত্যক্ত বহু সহস্র অশ্বারোহী, পদাতি, কামান ও হস্তী এবং ধনরত্নপরিপূর্ণ রাজকোষ দেখিয়া স্বাধীনতা-লক্ষ্মীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন যে, তিনি ৪০ সহস্র অশ্বারোহী, ১ লক্ষ ৪০ সহস্র পদাতি, ২০ সহস্র কামান, ৩ সহস্র ৬ শত হস্তী ও বহুশত রণতরীর অধিকারী হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার ধনরত্নেরও ইয়ত্তা ছিল না। যিনি এইরূপ বিপুল ধন ও সম্পত্তির অধিকারী, তিনি যে সহজেই অধীনতা-শৃঙ্খলকে দূরে পরিহার করিবেন, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? সেই জন্য দায়ূদ খাঁ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই আকবর বাদসাহের অধীনতা অস্বীকার করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

কেবল আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াই দায়ূদ ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মোগল সাম্রাজ্যেও হস্তপ্রসারণ করিতে প্রবৃত্ত হন। গাজীপুরের নিকট গঙ্গাতীরস্থ জামনিয়া দুর্গ মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্ত সৈন্যাবাসরূপে অবস্থিত ছিল। দায়ূদ সর্ব্বপ্রথম জামনিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া বসেন। বাদসাহ সে সময়ে গুজরাট প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, দায়ূদের ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা মুনিম খাঁকে বিহার আক্রমণের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। মুনিম খাঁ বিরাট্‌ মোগল বাহিনী লইয়া বিহারে উপস্থিত হইলে, দায়ূদের আমীর উল ওমরা লোদী খাঁ তাঁহার গতিরোধ করেন। উভয় পক্ষের কয়েকটি সামান্য যুদ্ধের পর মুনিম খাঁ ও লোদী খাঁ দিল্লীশ্বরের সহিত গৌড়াধিপের সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া দেন। উক্ত সন্ধিতে এইরূপ স্থির হয় যে, মোগল সৈন্য বিহার হইতে চলিয়া যাইবে, কিন্তু গৌড়াধিপকে নগদ দুটি

লক্ষ টাকা বাদসাহের রাজকোষে প্রেরণ করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালার উৎপন্ন রেশম, মসলিন প্রভৃতিতেও এক লক্ষ টাকার দ্রব্য উপহার দিতে হইবে।

অবশ্য দুই পক্ষের প্রধান অমাত্য যেরূপ সন্ধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে দিল্লীশ্বর ও গৌড়াধিপ উভয়েরই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সন্ধিতে কেহই সম্মত হন নাই। দায়ুদ খাঁ এজন্য লোদী খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, এবং লোদী খাঁর আধিপত্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রভুত্ব খর্ব্ব করিবার জন্য সচেষ্ট হন। কেবল তাহাই নহে, তিনি লোদীকে এ জগৎ হইতে অপসারিত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। যে লোদীর অনুগ্রহে তিনি গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকেই কণ্টকস্বরূপ মনে করিয়া তাঁহার উৎপাটনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে কতলু খাঁ ও শ্রীহরি দায়ুদের দক্ষিণ ও বামহস্তস্বরূপ ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা দায়ুদের নিকট হইতে উচ্চপদের আশায় লোদী খাঁকে হত্যা করিতে দায়ুদকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, এবং দায়ুদও সেই পরামর্শানুসারে লোদী খাঁকে প্রথমে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া কষ্ট প্রদান করেন, পরে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। অবশেষে তাঁহার যাবতীয় ধনরত্ন হস্তগত করিয়া আপনার পূর্ণ রাজকোষকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলেন। *

* "At the instigation of Katlu Khan, who had for a long time held the country of Jagannath and of Sridhara Hindu Bengali, and through his own want of judgment he seized Lodi his amir ul-omra, and put him confinement under the charge of Sridhar Bengali. * * * Katlu Khan and Sridhar Bengali had a bitter animosity against Lodi, and they thought that if he were removed, the offices of Vakil and Wazir would fall to them, so they made best of their opportunity. They represented themselves to Daud as purely disinterested, but they repeatedly reminded him of those things which made Lodi's death desirable. Daud in the pride and intoxication of youth, listened to the words of these sinister counsel-

এদিকে বাদসাহও মুনিম খাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। দায়ুদের প্রতি এরূপ অনুগ্রহপ্রদর্শনে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য কেবল মুনিম খাঁর প্রতি সৈন্যচালনার ভার না দিয়া রাজা তোড়লমল্লকেও দায়ুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ দেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বাদসাহ তোড়রমল্লকে দায়ুদের দমনের জন্য প্রধান সেনাপতিই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, রাজা ও মুনিম খাঁ পরে একযোগে দায়ুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

বিরাট্ মোগল বাহিনী দায়ুদ খাঁকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য যখন ভীমবেগে অগ্রসর হইল, তখন দায়ুদও সতর্কতা অবলম্বন করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি আপনার কতকগুলি দক্ষ ও সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া পাটনা দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মোগল বাহিনী আসিয়া প্রথমে পাটনা অবরোধ করিল। কিন্তু কয়েক মাস অপেক্ষা করিয়া যখন তাহারা দুর্গ অধিকারে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা বাদসাহের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। স্বয়ং দিল্লীশ্বর এবার গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি ফতেপুর ও আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে উপস্থিত হন। এই সময়ে ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদ নগর ও দুর্গের প্রতিষ্ঠা হয়। * তাহার পর বারাণসী অতিক্রম করিয়া তিনি পাটনায় উপস্থিত হইলেন। খানখানান মুনিম খাঁ তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া আসেন।

lers. The doomed victim was put to death, and Daud became the master of his elephants, his treasures and his troops." (Nizam-ud-din. Ahmad's Takati-Akbari-Elliot's History of India Vol. V.)

নিজামউদ্দীন শ্রীহরিকে শ্রীধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্রীহরিই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য। পরে তাহা উল্লিখিত হইবে।

* "On Safar 23rd A. H. 982, His Majesty arrived at Payag (Prayag), which is commonly called Illahabas, where the waters of the Ganges and Jamuna unite, * * * Here His Majesty laid the foundations of an imperial city, which is called Illhabas."

(Badauni)

বাদসাহ পাটনায় উপস্থিত হইয়া মুনিম খাঁর শিবিরে সামরিক মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হন। মন্ত্রণায় স্থির হয় যে, পাটনা দুর্গ অধিকার করিতেই হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে পাটনার পরপারস্থ হাজীপুর দুর্গ অধিকার করা কর্ত্তব্য। কারণ, তথা হইতে দায়ুদের সৈন্যগণের খাদ্য দ্রব্য অনবরত আসিতেছিল। খাঁ আলম নামক মোগল সেনাপতির প্রতি গাজীপুর অধিকারের ভার অর্পিত হইল, এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য বিহার প্রদেশের জমীদার রাজা গজপতির প্রতি আদেশ প্রচার হয়। খাঁ আলম ও গজপতি তিন সহস্র সৈন্যের সহিত নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া গাজীপুরের দিকে অগ্রসর হইলে, দুর্গরক্ষক ফতে খাঁ তাঁহাদিগকে বাধা প্রদানের জন্য সচেষ্ট হন। হাজীপুরের ব্যাপার সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে না পারায়, বাদসাহ তিনখানি রণতরী হাজীপুর অভিমুখে প্রেরণ করেন। ফতে খাঁ তাহা দেখিতে পাইয়া ১৮ খানি নৌকা তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সেই তিন খানি বাদসাহী নৌকা তাহাদিগের মধ্য দিয়া খাঁ আলমের নৌকার সহিত যোগদান করে। পরে খাঁ আলম হাজীপুর দুর্গ আক্রমণ করিলে ফতে খাঁ বাধা দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ মোগল সৈন্যের নিকট তাঁহার বিক্রম ব্যর্থ হইয়া যায়। সেই যুদ্ধে ফতে খাঁ ও আরও অনেকগুলি আফগান বীর নিহত হন। ফতে খাঁর এবং সেই সমস্ত আফগান বীরের মুণ্ড নৌকাযোগে বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইলে, তিনি সেই সমস্ত মুণ্ড দায়ুদের নিকট পাঠাইয়া দেন। দায়ুদ ফতে খাঁর শোচনীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া পাটনা পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন।

ক্রমে মোগলসেনাসমূহ পঙ্গপালের ন্যায় পাটনা দুর্গের চারিপাশে সমবেত হইতে আরম্ভ করিলে, দায়ুদ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। যদিও সে সময়ে তাঁহার নিকট ২০ হাজার অশ্বারোহী, বহুসংখ্যক গোলন্দাজ ও অনেকগুলি হস্তী ছিল, তথাপি হাজীপুরের পতন স্মরণ করিয়া তিনি পাটনা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। মোগল সৈন্যের বিভীষিকায় গভীর রজনীযোগে গৌড়ের শেষ স্বাধীন পাঠান-নরপতি দায়ুদ খাঁ একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া

গোপনে পাটনা হইতে অপসৃত হন। তাঁহার প্রিয়পাত্র ও তাঁহার নিকট হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধিপ্রাপ্ত শ্রীহরি তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন নৌকা পূর্ণ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। * প্রবাদমুখে শুনা যায় যে, ঐ সমস্ত ধনরত্ন রক্ষার জন্য বিক্রমাদিত্য তৎ সমুদয় আপনার নবগঠিত যশোর নগরে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু সেই সমস্ত ধনরত্ন দায়ুদের করায়ত্ত হয় নাই। কারণ, দায়ুদ তাহার পর হইতে অবিরত বাদসাহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং অবশেষে সেই যুদ্ধের অবসানে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। ঐ সমস্ত ধনরত্নের প্রভাবেই যশোর রাজবংশ বিপুল পরাক্রমের অধিকারী হইয়াছিল, এবং তাহারই বলে প্রতাপাদিত্য দিল্লীশ্বরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দায়ুদের প্রধান অমাত্য গুজর খাঁ তাঁহার হস্তীগুলি লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহাকে অনেকগুলি হস্তী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। তাহার পর মোগল সৈন্যেরা দুর্গ অধিকার করে। বাদসাহ মুনিম খাঁকে পাটনায় থাকিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং গুজর খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। গুজর খাঁ ক্রমে এক একটি করিয়া হস্তী পরিত্যাগ করিতে করিতে পলায়ন করিতে থাকেন। এইরূপে প্রায় চারি শত হস্তী বাদসাহের হস্তগত হয়। বাদসাহ দরিয়াপুর পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, এবং খানখানান মুনিম খাঁকে বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজা তোড়রমল্ল ১০ সহস্র অশ্বারোহীর সহিত মুনিম খাঁর সাহায্যের জন্য অবস্থিতি করিতে আদিষ্ট হন। তদ্ভিন্ন বাদসাহের সহিত যে সমস্ত রণতরী আগরা হইতে পাটনায় প্রেরিত হইয়াছিল, সে সমস্তও তাঁহাদের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে। তাঁহাদের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হয় যে, দায়ুদ ও তাঁহার সহকারী আফগানদিগকে বঙ্গরাজ্য হইতে যেরূপে হউক বিতাড়িত করিতে হইবে।

* "Sridhar the Bengali, who was Daud's great supporter, and to whom he had given the title of Raja Bikramajit, placed his valuables and treasure in a boat and followed him." (Tabkati Akbari).

বাদসাহের ঐরূপ আদেশ পাইয়া খানখানান মুনিম খাঁ ও রাজা তোড়রমল্ল উপযুক্তরূপ যুদ্ধসজ্জা করিয়া ক্রমে বিহার হইতে গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

মুসল্মান ঐতিহাসিকগণ পাটনার পতনের দিন হইতেই মোগলগণ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। * কিন্তু আমরা তেলিয়াগুড়ি ও বঙ্গরাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী টাঁড়া অধিকার হইতেই প্রকৃত বঙ্গবিজয় মনে করিয়া থাকি। পাটনা হইতে পলায়ন করিয়া দায়ুদ বঙ্গের দ্বার তেলিয়াগুড়িতে † উপস্থিত হন। তেলিয়াগুড়ির দুর্ভেদ্য দুর্গ পরীক্ষা করিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, ইহাতে যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে মোগলেরা এক বৎসর ব্যাপিয়া ভেদ করার চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইবে না। ইহা মনে করিয়া তিনি নিশ্চিন্তভাবে বঙ্গরাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী টাঁড়ায় উপস্থিত হন। এই টাঁড়া গৌড়ের নিকটই অবস্থিত। দায়ুদের পিতা সুলেমান টাঁড়াকেই গৌড় বা বঙ্গরাজ্যের রাজধানী করিয়াছিলেন। দায়ুদও তথায় অবস্থিতি করিতেন।

মুনিম খাঁ ও তোড়লমল্ল গঙ্গাতীরস্থ সুরযগড়, ও পরিশেষে গোরখপুরের রাজা

* "The date of the fall of Patna, which was indeed the conquest of Bengal, is found in this line, '*Mulk-i-Sulaiman-zi Daud raft*' (983)" (Nizamu-d-din Ahmads' Tabakat-i-Akbari).

কিন্তু তারিখী দায়ুদীপ্রণেতা আবদুল্লা এই তারিখকে দায়ুদের হত্যার তারিখ বলেন।

† তেলিয়াগুড়ি রাজমহল ও সাহেবগঞ্জের নিকট। মুসল্মান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে কেবল গড়ি (Garhi) বলিয়াছেন। কোন তেলি রাজার রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত বা তাহার সহিত সংস্রব ছিল বলিয়া ইহার তেলিয়াগড়ি নাম হইয়া থাকিবে।

আকবর নামায় তেবলিয়াগুড়ি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

"Garhi is the gate of Bengal On one side of it is a lofty mountain, very difficult of ascent, even for a man on foot, how then can a horseman get up it ? On the other side several rivers join the Ganges. In the midst a strong fortress had been built by the rulers of the country. * * * The Zemindars of the neighbourhood said that there was a secret way hrough the country of the Teli Raja, which, though impracticable for beasts of burden, might be surmounted by active and intellegent horsemen." এই তেলিরাজার বিষয় আমরা অবগত নহি।

সংগ্রাম সিংহের ও গিধোড়ের রাজা পূরণমলের সাহায্যে মুঙ্গের দুর্গ অধিকার করিয়া তেলিয়াগুড়ির নিকট উপস্থিত হন। প্রথমে মাজনন খাঁ পরে কিয়া খাঁ দুর্গাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিলেন। খানখানান মুনিম খাঁও সমস্ত সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন। সেই বিরাট্ মোগল বাহিনী দেখিয়া আফগানগণ ভীত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, এবং মুনিম খাঁ সহজেই দুর্গ অধিকার করিয়া লন। বঙ্গের দ্বারস্বরূপ তেলিয়াগুলির দুর্গ অধিকার করিয়া মুনিম খাঁ টাঁড়া অভিমুখে যাত্রা করেন। তেলিয়াগুড়ির পতন ও মোগল সেনাপতির টাঁড়া অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ দায়ুদের নিকট পৌঁছিলে, দায়ুদ ও তাঁহার অমাত্যবর্গ পাটনার পতনের বিষয় চিন্তা করিয়া টাঁড়া পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে সপ্তগ্রামে, পরে তথা হইতে উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। * মুনিম খাঁ টাঁড়ায় উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে পাছে দায়ুদ বাধা প্রদান করেন মনে করিয়া, অন্যান্য আমীরের সহিত পরামর্শের পর আপনার সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া টাঁড়ায় উপস্থিত হন। দায়ুদ তৎপূর্ব্বেই টাঁড়া পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। মুনিম খাঁ বিনা রক্তপাতে বঙ্গরাজ্যের রাজধানী অধিকার করিয়া তাহাতে মোগলের বিজয়-নিশান প্রোথিত করিলেন। পাঠান নরপতির পরিত্যক্ত সিংহাসন তাঁহাকে আশ্রয় দিবার জন্য আপনার বক্ষ পাতিয়া দিল। তদবধি অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে গৌড়ের স্বাধীন পাঠান নরপতির পরিবর্ত্তে মোগল সুবেদার বঙ্গরাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইলেন।

খানখানান মুনিম খাঁ নির্ব্বিবাদে বঙ্গরাজ্যের রাজধানী অধিকার করিয়া মাজনান খাঁকে ঘোড়াঘাট বা রঙ্গপুর প্রদেশে ও রাজা তোড়রমল্লকে উড়ি-

* আবুলফজেল দায়ুদের উড়িষ্যায় পলায়নোপলক্ষে যে ভৌগোলিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন; তাহা সমীচীন নহে। তিনি বলিতেছেন—

"At Tanda the river Ganges separates into two branches. One flows towards Satganw and Orissa, the other towards Mahmudabad, Fathabad, Sunarganw, and Chittaganw. Daud followed the course of the river of Satganw until he reached the confines of Orissa"

কিন্তু গঙ্গা টাঁড়ায় দুই শাখায় কদাচ বিভক্ত হয় নাই। টাঁড়ার অনেক পরে সুতীর নিকট বিভক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সুতী হইতেও কিছু দূরে উক্ত বিভাগ হইয়াছে।

ষাভিমুখে প্রেরণ করেন। ঘোড়াঘাটে কতকগুলি আফগান জায়গীর ভোগ করিতেছিল। তাহাদের সর্দ্দার স্থলেমান মাঙ্গুলী অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিল। মাজনান খাঁ তাহাকে নিহত করিয়া জায়গীরগুলি অধিকার করেন ও আপনার অনুচর-বর্গের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। রাজা তোড়রমল্ল দায়ুদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া প্রথমে মন্দারণে * উপস্থিত হন। তথা হইতে সংবাদ পান যে, দায়ুদ দিন-কেশরী † নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। রাজা অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া মুনিম খাঁর নিকট সেই সংবাদ পাঠাইলে, তিনি তাঁহার সাহায্যের জন্য মহম্মদ কুলী খাঁকে পাঠাইয়া দেন। সেই মিলিত মোগল বাহিনী দিনকেশরীর নিকট গোয়ালপাড়ায় উপস্থিত হইলে, দায়ুদ ভীত না হইয়া ধারপুর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া মোগল বাহিনীর সম্মুখীন হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে দায়ুদের পিতৃব্যপুত্র জুনৈদ দিনকেশরীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। জুনৈদ সাহস ও বীরত্বে আফগানদিগের মধ্যে সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি কিছুকাল বাদসাহের অধীনেও কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে আগরা হইতে গুজরাট, অবশেষে বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হন। জুনৈদ দায়ুদের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। রাজা তোড়রমল্ল অন্যান্য আমীরদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া জুনৈদকে আক্রমণের জন্য আবুল কাসীম ও নজর বাহাদুরকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহারা জুনৈদের নিকট পরাজিত হইতে বাধ্য হন। রাজা তোড়রমল্ল সেই সংবাদ শুনিয়া নিজেই জুনৈদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি পঁহুছিবার পূর্ব্বেই জুনৈদ জঙ্গলমধ্যে আশ্রয় লন। অগত্যা তোড়রমল্ল মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসেন। এই খানে পীড়িত হইয়া মহম্মদকুলী খাঁ প্রাণত্যাগ করেন।

* এই মন্দারণ দুর্গেশনন্দিনীর গড় মন্দারণ।

মন্দারণকে ষ্টুয়ার্ট মাদারুণ বা বীরভূম বলেন। ইলিয়ট তাহাকে হুগলী জেলায় ও বর্দ্ধমান মেদিনীপুরের মধ্যে বলেন। কাজেই তাহা মন্দারণ হইতেছে। মাদারুণ হইলে তাহা বীরভূমই হইত।

† ষ্টুয়ার্ট দীপকেশরী বলেন।

ইহার পর রাজা তোড়রমল্ল ও অন্যান্য আমীরগণ মেদিনীপুর হইতে মন্দারণে ফিরিয়া যান। তথায় কিয়া খাঁ আমীরগণের উপর বিরক্ত হইয়া জঙ্গলমধ্যে চলিয়া যান। রাজা তোড়রমল্ল মুনিম খাঁর নিকট সেই সংবাদ পাঠাইলে, তিনি সাহাম খাঁকে রাজার সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেন। সাহাম খাঁ বর্দ্ধমানে রাজার সহিত মিলিত হইলে, রাজা জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়াখাঁকে শান্ত করিয়া লইয়া আসেন। পরে সকলে মিলিয়া মন্দারণ হইতে জিতুয়ায় * উপস্থিত হন। তথায় তাঁহারা সংবাদ পান যে, দায়ুদ কটকদুর্গে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন। রাজা তোড়রমল্ল টাঁড়ায় মুনিম খাঁর নিকট সেই সংবাদ পাঠাইলে, মুনিম খাঁ খাঁ আলম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মোগল সেনানীর সহিত দায়ুদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তোড়রমল্লের সহিত আসিয়া মিলিত হন। দায়ুদ খাঁও মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হইবার জন্য আপনার সৈন্যদিগকে সজ্জিত করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন।

৯৮২ হিজরীর ( ১৫৭৪ খৃঃ অব্দ ) ২০এ জিল্কদ মোগল ও আফগানগণ পরস্পরের সম্মুখীন হয়। আফগানদিগের সহিত অনেকগুলি হস্তী ছিল। কিন্তু মোগলেরাও কতকগুলি কামান ও বন্দুক লইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। মোগলদিগের কামানের ও বন্দুকের অগ্ন্যুদ্গীরণে আফগানদিগের হস্তী ও সৈন্যসকল বিচলিত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে দায়ুদের প্রধান সেনাপতি গুজর খাঁ অগ্রসর হইয়া খানখানানের সম্মুখবর্ত্তী শ্রেণীর সৈন্যদিগকে তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্রেণীর উপর নিক্ষেপ করিলেন। প্রসিদ্ধ মোগল সেনানী খাঁ আলম অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ভূমিতলে আশ্রয় লইলেন। সমস্ত মোগল সৈন্য বিচলিত হইয়া উঠিল। গুজর খাঁ অগ্রসর হইয়া মুনিম খাঁকে আহত করিলেন, মুনিম খাঁর হস্ত হইতে তরবারি চ্যুত হইয়া পড়িল, তিনি গুজর খাঁর প্রতি কশাঘাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার অশ্ব ভীত হইয়া পলাইয়া যায়। আফগানেরা অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে। সঙ্গে সঙ্গে কিয়া

* ষ্টুয়ার্ট বখতুর বলেন।

খাঁ আফগানদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলেন। ইতিমধ্যে খানখানান আপনার অশ্বকে শান্ত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকেও উৎসাহিত করেন। তাহাদের অবিশ্রান্ত শরবর্ষণে আফগানদিগের হস্তী ও সৈন্য বিচলিত হইয়া পড়ে। একটি তীক্ষ্ণ শর আসিয়া গুজর খাঁকে ভূতলে পাতিত করিয়া ফেলে।

রাজা তোড়রমল্ল ও লস্কর খাঁ প্রভৃতি দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। খাঁ আলমের মৃত্যুর ও খানখানানের অশ্বের পলায়নের পর মোগল সৈন্যেরা বিচলিত হইয়া উঠিলে, রাজা তোড়রমল্লই তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে দেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "খাঁ আলম মরিয়াছেন, তাহাতেই বা কি ক্ষতি! এবং খানখানান পলায়ন করিয়াছেন তাহাতেই বা ভয় কি! সাম্রাজ্য আমাদেরই।" * কেবল ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার আক্রমণে আফগানদিগের বাম পার্শ্বের সৈন্যগণ মথিত হইয়া যায়। ওদিকে বাম পার্শ্ব হইতে সাহম খাঁও তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ব্যাকুল করিয়া তুলেন। এই সময়ে খানখানানও অগ্রসর হইয়া সকলের সম্মুখীন হন। যখন তাঁহার নিশান সকলের দৃষ্টিগোচর হইল, তখন মোগল সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া অসীম বিক্রমে আফগানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদিগের সেই প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আফগান সৈন্যগণ ধরাশায়ী হইতে লাগিল। হস্তিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। দায়ুদ এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া ধীরে ধীরে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। বিজয়লক্ষ্মী মোগলের পক্ষই আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। মোগল সৈন্যেরা দায়ুদের শিবির লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন অধিকার করেন।

* "In the battle with Daud Khan-i-Kararani, when Khan Alam had been killed, and Munim Khan's horse had run away; the Rajah held his ground bravely, and not only there no defeat, but an actual victory. 'What harm' said Todar Mull 'if Khan Alam is dead: what fear if the Khan Khanan had run away, the empire is ours!" (Blochmann)

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া দায়ুদ কটকদুর্গে উপস্থিত হন ও তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিবার সংকল্প করেন। রাজা তোড়রমল্ল ও অন্যান্য আমীরগণ প্রথমে দায়ুদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। মুনিম খাঁও তাঁহার সৈন্যসকল হতাহতদিগের ব্যবস্থা করিবার জন্য কিছুকাল অবস্থিতি করেন। রাজা ভদ্রকের * নিকট উপস্থিত হইয়া, দায়ুদের কটকদুর্গে অবস্থিতির সংবাদ পান দায়ুদ পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে বাধা দিবার জন্য সজ্জিত হইতেছিলেন। রাজা খানখানানের নিকট এই সংবাদ পাঠাইলে, খানখানান কটকাভিমুখে অগ্রসর হন ও মহানদীর তীরে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। দায়ুদ বারম্বার পরাজয়ের কথা স্মরণ করিয়া বিশেষতঃ গুজর খাঁর মৃত্যুতে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে খানখানানের উপস্থিতি শুনিয়া তিনি যুদ্ধসংকল্প পরিত্যাগ করিয়া সন্ধির জন্য ইচ্ছুক হইয়া পড়েন। তিনি আফগান সর্দ্দারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া খানখানানের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন দূত খানখানানের নিকট উপস্থিত হইয়া দায়ুদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া বলে যে, "মুসল্মান কর্ত্তৃক মুসল্মানের ধ্বংস শোভনীয় নয়, তবে গৌড়াধিপ আপনার জীবিকার জন্য বিস্তৃত বঙ্গ রাজ্যের যৎকিঞ্চিৎ অংশ মাত্র প্রার্থনা করেন। তাহা প্রাপ্ত হইলে তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন ও আর কখনও বিদ্রোহাচরণ করিবেন না।" খানখানান দায়ুদের প্রস্তাব অবগত হইয়া অন্যান্য আমীরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন ও দায়ুদকে স্বয়ং উপস্থিত হইবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। এই প্রস্তাবে কেবল রাজা তোড়রমল্ল আপত্তি করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি দায়ুদকে বিশেষরূপেই জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আপত্তি খানখানানের রুচিকর হয় নাই।

পরদিন খানখানান আপনার দরবার সজ্জিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, অন্যান্য আমীরগণও স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুসারে উপবেশন করিলেন। সৈন্যসকল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। দায়ুদ তাঁহার আফগান সর্দ্দার

* তবকত আকবরীতে কফল ঘাটি আছে, কিন্তু আকবরনামায় ভদ্রক দেখা যায়।

গণের সহিত দরবার-ভূমিতে উপস্থিত হইলে, খানখানান অৰ্দ্ধপথ হইতে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে আনিতে গেলেন। দায়ুদ কটিদেশ হইতে তরবারি উন্মোচন করিয়া খানখানানকে তাহা প্রদান করিয়া কহিলেন, "যখন হইতে আপনার ন্যায় ব্যক্তি আহত হইয়াছেন, তখন হইতে আমি যুদ্ধে ক্লান্তি অনুভব করিতেছি।" খানখানান তরবারি লইয়া নিজের এক অনুচরের হস্তে প্রদান করিলেন, এবং দায়ুদকে সসম্ভ্রমে আনিয়া আপনার আসনের পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। তাহার পর মিষ্টান্ন প্রভৃতি গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। অবশেষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইতে আরম্ভ হয়। দায়ুদ শপথসহকারে বলিলেন যে, তিনি আর কখনও বাদসাহের বিদ্রোহাচরণ করিবেন না, এবং চিরদিনই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবেন। খানখানান তাঁহাকে এক রত্নখচিত তরবারি প্রদান করিয়া বলিলেন যে, "তুমি যখন বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতেছ, তখন তোমার সাহায্যের জন্য এই তরবারি প্রদত্ত হইল, এবং আমি বাদসাহের নামে তোমাকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রদান করিতেছি।" তাহার পর তিনি নিজ হস্তে দায়ুদকে তরবারি পরাইয়া দিলেন। অতঃপর দরবার ভঙ্গ হইল। এই সন্ধির পর মুনিম খাঁ টাঁড়া অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঘোড়াঘাটের আফগানগণ মাজনান খাঁকে বিতাড়িত করিয়া রাজধানীর নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, এবং গৌড়দুর্গ অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু খানখানানের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া তাহারা তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

যে সময়ে মুনিম খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসেন, সে সময়ে টাঁড়া বাঙ্গলার রাজধানী ছিল, উহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দায়ুদের পিতা সুলেমান গৌড় হইতে রাজধানী টাঁড়ায় লইয়া যান। মুনিম খাঁ যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া গঠিত গৌড়ের বিশাল ও সুন্দর সৌধাবলি দেখিয়া তাহাকেই বাঙ্গলার রাজধানীর উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, এবং টাঁড়া হইতে পুনর্ব্বার রাজধানী গৌড়ে স্থাপন করিবার জন্য আদেশ দেন। সেই সময়ে ঘোরতর বর্ষা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সুবেদার আপনার ইচ্ছার অনুবর্ত্ত

হইয়া আমীরগণকে ও সৈন্যদিগকে গৌড়ে যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। অবশ্য তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। কিন্তু সে সময়ে গৌড়ের জলবায়ু অত্যন্ত দূষিত হইয়াছিল, এবং ভূমিও জলসিক্ত ছিল। বিশেষতঃ বর্ষায় আরও দূষিত হইয়া পড়ে। ক্রমে সৈনিকগণের ও অধিবাসীদিগের মধ্যে পীড়ার সঞ্চার হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা প্রবল মহামারীতে পরিণত হইল। প্রতিদিনই শত শত সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের মৃতদেহ দগ্ধ বা সমাহিত করার উপায় না থাকায়, সমস্তই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। * তাহাতে মহামারী আরও প্রবল হইয়া উঠিল। অনেক সম্রান্ত আমীর তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। অবশেষে মুনিম খাঁও সেই মহামারীতে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করিলেন। খৃষ্টীয় ১৫৭৫ অব্দে গৌড়ের ভয়াবহ মহামারী আবির্ভূত হইয়াছিল। এরূপ লোকধ্বংসকর মরক বঙ্গদেশে অল্পই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

খানখানান মুনিম খাঁর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া দায়ুদ খাঁ আবার বাঙ্গলা অধিকারের জন্য ইচ্ছুক হইলেন। তিনি মুনিম খাঁর সহিত সন্ধির কথা বিস্মৃত হইয়া মোগলদিগকে বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য আফগান সর্দ্দারেরা তাঁহার সহিত যোগদান করিলে, তিনি উড়িষ্যা হইতে টাঁড়া অভিমুখে অগ্রসর হন। মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর মোগলেরা সাহামখাঁ জলৈরকে আপনাদের অধ্যক্ষ মনোনীত করিয়াছিল। কিন্তু দায়ুদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসমর্থ হইয়া উক্ত মোগল সেনাপতি মোগল সৈন্যদিগকে লইয়া বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিলেন, এবং পাটনা ও হাজী-

* "By degrees the pestilence reached to such a pitch that men were unable to bury the dead, and cast the cropses into the river." (Tabkuti Akbari).

"Thousands died every day and the living tired with burying the dead threw them into the river, without distinction of Hindoo or Muhammedan." (Stewart)

"Out of the many thousand men that were sent to that country, not more than a hundred were known to have returned in safety, (Badauni)

পুরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। খানখানানের মৃত্যু-সংবাদ বাদসাহের নিকট পঁহুছিলে, বাদসাহ লাহোরের শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলী খাঁকে খাঁ জাহান উপাধি প্রদান করিয়া বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত করেন, ও তাঁহাকে সত্বর অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ দেন। কিন্তু হোসেন কুলীখাঁর সৈন্যসকল পঞ্জাবে থাকায়, তাঁহাকে কয়েক মাস অপেক্ষা করিতে হয়। দায়ুদ টাঁড়া অধিকার করিলে, বাদসাহ হোসেন কুলীখাঁকে অবিলম্বে বাঙ্গলায় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন এবং হোসেন কুলীও বাঙ্গলা অভিমুখে অগ্রসর হন। আফগানেরাও তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

এই সময়ে চারি দিক হইতে পাঠানেরা দায়ুদের পতাকামূলে আসিয়া সমবেত হয় এবং তিনি প্রায় ৫০ সহস্র অশ্বারোহীর নেতা হইয়া উঠেন। তাহারা এরূপ দুর্দ্দর্ষ ছিল যে, আপনাদের জীবন বলি দিতে কিছুমাত্র বিচলিত হইত না। খাঁ জাহান প্রথমে বাঙ্গলার দ্বার তেলিয়াগুড়িতে আসিয়া উপস্থিত হন; তথাকার দুর্গে ৩ সহস্র পাঠান অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা মোগল-দিগের গতিরোধ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই যুদ্ধে তাহাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চদশ শত জীবন বিসর্জ্জন দেয়। তেলিয়াগুড়ি অধিকার করিয়া খাঁ জাহান টাঁড়ায় উপস্থিত হন। সেখানে আসিয়া দেখেন যে, দায়ুদ রাজ-ধানী পরিত্যাগ করিয়া আকমহলে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই আক-মহল পরে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক রাজমহল নাম ধারণ করে, ও বাঙ্গলার রাজধানী হইয়া উঠে। আকমহলের একদিকে গঙ্গা, অপর দিকে পর্ব্বতশ্রেণী তাহাকে দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিয়াছিল। দায়ুদ পরিখা খনন করিয়া নিজ শিবিরকে আরও সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

খাঁ জাহান রাজমহলে উপস্থিত হইলে, মোগলপাঠানে আবার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল এবং কিছু দিন ধরিয়া সেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। খাজা আবদুল্লা নামে একজন মোগল সেনানী প্রথমে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। বাদসাহ সেই সংবাদ পাইয়া পাটনার শাসনকর্ত্তা মজঃফর খাঁকে খাঁ জাহানের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। মজঃফর খাঁ পাঁচ হাজার

অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রাজমহলে উপস্থিত হইলে, মোগলেরা বিপুল বিক্রমে পাঠানদিগকে আক্রমণ করে। দায়ুদের পিতৃব্যপুত্র জুনৈদ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মোগল সৈন্যদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল পক্ষ হইতে এক রক্তবর্ণ কামানের গোলা আসিয়া তাঁহার এক পদ ভগ্ন করিয়া দেয়। তাহার পর উভয় পক্ষে নিকটবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, মোগলদিগের বিক্রমের নিকট আফগানেরা পরাজিত হইয়া যায়। দায়ুদও সেই যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অশ্বের পদ কর্দ্দমে প্রোথিত হওয়ায়, তিনি মোগলদিগের হস্তে বন্দী হন। হাসেন বেগ নামক একজন মোগল সেনাপতি তাঁহাকে বন্দী করিয়া খাঁ জাহানের নিকট লইয়া যায়। কোন কোন মুসল্মান ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন যে, কতলু খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দায়ুদের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হইয়াছিল। কতলু যে দায়ুদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সেই বিশ্বাসী অমাত্য কতকগুলি পরগণাপ্রাপ্তির লোভে মোগলদিগের প্ররোচনায় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অপসৃত হন।* দায়ুদ একাকী ও সহায়হীন হওয়ায়, এবং দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার অশ্বের পদ পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়ায় তিনি মোগলহস্তে বন্দী হন। স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিবার জন্য যিনি বারংবার 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'র বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন, অবশেষে তিনি অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মোগল শিবিরে বন্দিরূপে উপস্থিত হন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ গৌড়ের শেষ স্বাধীন পাঠান-নরপতি মোগল সুবেদারের নিকট উপস্থিত হইয়া, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া তাঁহার নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করেন। সুবেদার আপনার পানপাত্র হইতে তাহা প্রদান করিয়া, দায়ুদকে

* "The Mukhzam-i-Afghani represents that this defeat was entirely owing to the treachery of Katlu Lohani, who was rewarded by the settlement upon him of some pergunahs by withdrawing from the field at a favourable juncture." (Elliot Vol. IV. p. 513. Note)

জিজ্ঞাসা করেন যে, "তুমি মুসলমান হইয়া শপথপূর্ব্বক যে সন্ধি করিয়াছিলে, তাহা ভঙ্গ ক'রলে কেন?"

দায়ুদ তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "সে সন্ধি মুনিম খাঁর সহিত ব্যক্তিগত ভাবেই হইয়াছিল।"

তাঁহার এই উত্তরে আমীরগণ খাঁ জাহানকে দায়ুদের শিরশ্ছেদনের জন্য উত্তেজি··করেন। খাঁ জাহান সেই সৌন্দর্য্যময়ী দেহযষ্টিকে দ্বিখণ্ডিত করিতে একটু সঙ্কুচিত হইতেছিলেন, কিন্তু আমীরগণ তাঁহাকে বাদসাহের আদেশ স্মরণ করাইয়া দিলে, তিনি বাধ্য হইয়া উক্ত কঠোর আদেশ প্রদান করেন। অবিলম্বে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। কিন্তু সেই তেজস্বী পাঠানের মুণ্ড তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া সহজে ভূতলে পড়িতে চাহেন নাই। দুই তিন আঘাতের পর দায়ুদের ছিন্ন মুণ্ড ভূমিবিলুণ্ঠিত হয়। পরে সেই ছিন্ন মুণ্ড বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।* কারণ, দায়ুদের ছিন্নমুণ্ড

* আমরা দায়ুদের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান ঐতিহাসিকের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

"Daud Shah Kirani was brought in a prisoner, his horse having fallen with him. Khan Jahan seeing Daud in this condition, asked him if he called himself a Musalman, and why he had broken the oaths which he had taken on the Koran and before God. Daud answered that he had made the peace with Munim Khan personally, and that if had now gained the victory he would have been ready to renew it Khan Jahan ordered them to relieve his body from the weight of his head which he sent to Akbar the king. The date of this transaction may be learnt from this verse. Malki Sulaiman-zi-Daud raft.' 983H. 1575 A D. Abdulla's Tarikhi Daudi).

"Daud being left behind was made prisoner, and Khan Jahan had his head struck off, and sent it to His Majesty.' (Nizam-u-d-din Ahmad's Tabkat-i-Akbari).

"The horse of Daud stuck fast in the mud, and Hasan Beg made Daud prisoner, and carried him to Khan Jahan The prisoner being oppressed with thirst, asked for water. They filled his slipper with water and took it to him. But as he would not drink it, Khan Jahan supplied him with a cupful from his own canteen and enabled him to slake his thirst. *The Khan was desirous of saving his life, for he was a handsome man, but the nobles urged that if his life were spared, suspicions might arise as to their loyalty, so he ordered him to be beheaded.* His execution was a very clumsy work, for after receiving two chops he was not dead, but

দেখিবার জন্য তাঁহার স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। দায়ুদের এই শোচনীয় পরিণামকালে তাঁহার পরিবারবর্গ সপ্তগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। খাঁ জাহান বিজয়লাভের পর সপ্তগ্রাম অভিমুখে ধাবিত হইলে, দায়ুদের অনুচর জমশেদ ও মিট্টি তাঁহার গতিরোধ করে। কিন্তু প্রবল বন্যার মুখে তৃণের ন্যায় তাহারা মোগল সৈন্যের তাড়নায় ভাসিয়া যায়। দায়ুদের মাতা দন্তে তৃণ করিয়া খাঁজাহানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলেন। খৃষ্টীয় ১৫৭৫ অব্দ হইতে স্বাধীন গৌড়রাজ্যের নাম বিলুপ্ত হয়।

এইরূপে দায়ুদ খাঁর অবসান হয়। যিনি গৌড়ে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন, অবশেষে দেবী তাঁহার শোণিতপানে উন্মত্তা হইয়া গৌড় পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য অন্তর্হিতা হন। তেজস্বী পাঠানবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দায়ুদ অধীনতাকে দূরে পরিহার করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল-মার্ত্তণ্ডের মাধ্যাহ্নিক তেজ তাঁহাকে নিষ্প্রভ করিয়া তাঁহার শোণিতধারা শোষণ করিয়া লয়। পাণিপথ-ক্ষেত্রে যে বিজয়-নিশান উত্থিত হইয়াছিল, অবশেষে তাহা বাঙ্গলার শ্যামল প্রান্তরেও প্রোথিত হয়। গৌড় আপনার স্বাধীনতা হারাইয়া মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া যায়, দায়ুদ খাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাহারও ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হয়।

suffered great torture. At length his head was cut off. It was then crammed with grass and annointed with perfumes, and placed in charge of Saiyed Abdalla Khan." (Tarikh-i-Badauni)

"When victory declared for the imperial army, the weak-minded Daud was made prisoner. His horse stuck fast in the mud, and a party of brave men seized him, and brought him prisoner to Khan Jahan. The Khan said to him, where is the treaty you made and the oath that you swore? throwing aside all shame he said I made that treaty with Khan Khanan. If you will alight, we will have a little friendly talk together and enter into another treaty. Khan Jahan, fully aware of the craft and perfidy of the traitor, ordered that his body should be immediately relieved from the weight of his rebellious head. He was accordingly decapitated and his head was sent of express to the Eperor. His body was exposed on a gibbet at Tanda, the capital of that country." (Akbarnama)

# মহারাজ রাজবল্লভ সেন

( সমালোচনা )

দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়।

ও

কৃষ্ণজীবন মজুমদার।

বৈদ্যধন্বন্তরি গোত্রীয় বলভদ্রবংশীয় বেদগর্ভ সেন যশোহর ইৎনা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরান্তর্গত দায়নিয়া গ্রামে বাসস্থাপন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকণ্ঠ সেন পরে জপসা গ্রামে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করতঃ বাস করিতে থাকেন। কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পৈতৃক আবাসেই স্থিত রহেন। নীলকণ্ঠের চতুর্থস্থানীয় গোপীরমণ সেন খাসনবীশ মহাশয় ও শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ স্থানীয় কৃষ্ণজীবন মজুমদার মহাশয় কালক্রমে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

উক্ত মজুমদার মহাশয়ের ৫ম পুত্র রাজা রাজবল্লভ বেদগর্ভ সেনের বংশে ভাস্কর-স্বরূপ হইলেও তাঁহার উন্নতিলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গোপীরমণের ২য় পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায় এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী উন্নত লোক ছিলেন। পরে তৎপুত্র লালা রামপ্রসাদ রায় ঐশ্বর্য্যে ও কীর্ত্তিকলাপে পিতাকেও অতিক্রম করেন বটে, কিন্তু তত্তুল্য উচ্চরাজকার্য্যে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। পৈতৃক সম্পত্তি ও স্বোপার্জ্জিত অর্থ এই দুইয়ের অধিকারী হইয়া তিনি বিখ্যাত হন। এই বংশ অধুনা জপসার "লালা-বাবু" নামে পরিচিত। দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়কে আর কেহ তত অবগত নহেন।

এই সময়ে অপর দুই জন মহাত্মা বিক্রমপুর মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। উঁহার একটি রাজা রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত্যুঞ্জয় দেওয়ান, অপরটি রাইসবর ( শ্রীনগর ) নিবাসী কায়স্থবংশীয় লালা-

কীর্ত্তিনারায়ণ। শ্রীযুত রসিকলাল গুপ্ত মহাশয় এই কয়েকটি পুরুষের কিঞ্চিৎ বিবরণ স্বপ্রণীত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, এজন্ত আমরা অগ্রেই তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিয়া রাখিলাম।

কৃষ্ণরাম প্রথমতঃ পিতার পরিত্যক্ত খাসমহালের তহশীলদারী পদে নিযুক্ত হইয়া, পরে কার্য্যদক্ষতাগুণে নাওবার দেওয়ানী পদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হন। প্রথমতঃ খাসনীস বা খাসনবীস বলিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল, পরে তিনি দেওয়ান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বিক্রমপুরান্তর্গত, মালখানগরে রাজকীয় এক ইষ্টকালয় ( সেঘরা ) বর্ত্তমান আছে; উহাতে এক খানা ইষ্টকলিপি ছিল; তাহাতে এই কয়েকটি কথা অঙ্কিত ছিল বলিয়া জানা যায়। যথা—

"বাদসাহ আলমগীর নবাব আমিরওমরা দেওয়ান সফি খাঁ, শ্রীগোবিন্দ আসকন্দ, দেবীদাস বসু কানুনগোই, নাওবাব এতমান শ্রীকৃষ্ণাই খাসনীস, সন ১০৮৭ বাঙ্গালা মাহে চৈত্র" প্রচলিত হিসাবানুসারে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হয় (১)

শ্রীযুত রসিকলাল গুপ্ত মহাশয় পূর্ব্ব কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণাইকে রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় উহা ঠিক হয় নাই। এই কৃষ্ণাই যেন অপসার কৃষ্ণরাম বলিয়া অনুমান হয়। খাসনিস উপাধি দ্বারাও উহাই সমীচীন বোধ হয়। কৃষ্ণরামের পৈতৃক উপাধিও খাসনবীশ ছিল। পরে দেওয়ানীলাভ দ্বারা উহা পরিবর্ত্তিত হয়। কৃষ্ণজীবন পৈতৃক মজুমদার উপাধিতেই পরিচিত ছিলেন। গুপ্তমহাশয় বলেন, কৃষ্ণজীবন "মজুমদারী" সেরেস্তার কার্য্য করিয়া

(১) "বাদসাহ ( সাজাহান ) স্বীয় পুত্র মোহাম্মদ সুজাকে বাঙ্গলার সুবেদারী পদে অভিষিক্ত করিয়া সাহাজাদা কর্তৃক বাঙ্গলার শাসনভার স্বহস্তে গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত সাফর খাঁকে প্রতিনিধি স্বরূপ শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে আদেশ করেন" ( রিয়াজ-উস সালাতিন, শ্রীযুত রামপ্রাণগুপ্ত অনুবাদিত ১৯৫।১৯৬ পৃষ্ঠা )

পরে এই ব্যক্তি দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন।

এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহা সত্যকথা নয়। কৃষ্ণজীবনের পিতা ও পিতৃব্যগণেরও মজুমদার উপাধি ছিল। তাঁহার পিতৃব্য রামনারায়ণ মজুমদার রাউৎপাড়ার বর্ত্তমান মজুমদার উপাধিবিশিষ্ট মহাশয়গণের পূর্ব্ব-পুরুষ। কৃষ্ণজীবনের পিতার নাম রামগোবিন্দ মজুমদার। এইটীও তাঁহার স্বোপার্জ্জিত নয়।

বিক্রমপুরময় রাষ্ট্র কৃষ্ণজীবন মজুমদার দেবীদাস বসুর বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বা কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজকীয় ইষ্টকালয়ের সহিত তাঁহার নামের কোন সম্পর্ক নাই। উহা কতদূর ঠিক তাহা আমরাও বলিতে পারি না। তবে একজন ইংরেজ লেখক তৎকৃত গ্রন্থে কৃষ্ণজীবনকে দেবীদাসের servant ( চাকর ) বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। ( ১ )

শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় কৃষ্ণজীবনকে এই চাকুরীর দায় হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য নানারূপ কথার অবতারণা করিয়াছেন ; কিন্তু ডাক্তার ওয়াইজের লিখিত বিবরণ জানিয়া শুনিয়াও কেন তাহা উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ আর নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। সম্ভবতঃ ইংরেজের হাতের গন্ধ পাইয়া পাছে কেহ তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে না চাহে, তজ্জন্যই লেখক এস্থলে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। অন্যথায় ইটালিয়ান অক্ষরে এই "সর্ব্বেণ্ট" পদটী উদ্ধৃত করা কি উচিত ছিল না ?

শ্রীযুত গুপ্ত মহাশয় যে ওয়াইজের লিখিত বিবরণ অবগত ছিলেন, তাঁহার স্বহস্ত লিখিত একখানি চিঠি হইতে আমরা উহা প্রমাণ করিব। ( ২ )

গ্রন্থকার কৃষ্ণজীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া অতি সংক্ষেপে উহা সমাপ্ত করিলেন কিজন্য ? আমরাও সংক্ষিপ্ত ভাবে দুই একটি বিষয় নূতন করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি।

(১) "Krishnajiban, servant of Debidas" Vide "An elaborate study of the castes of Eastern Bengal" by the late Dr. James Wise.

(২) তোমা ২০।১২।০৩ ইং

"ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব মালখানগর গিয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ভ্রম করিয়াছেন।" যদি ভ্রমই বুঝিলেন তবে কথাটা উল্লেখ করিয়া তাহা মীমাংসা করিতে সাহসী হইলেন না কেন ?

কৃষ্ণজীবন পৈতৃক সম্পত্তির যে অংশ প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা সচ্ছলভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া উঠিত না। (১) এমন কি একদা রাজস্বদায়ে ধৃত হইয়া তিনি ঢাকাতে নীত হন। প্রবাদ, পরে প্রচুর ভোজনের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার মুক্তিলাভ ঘটে। ঢাকার রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারীর (দেওয়ানের) অনুগ্রহে কৃষ্ণজীবন উন্নতাবস্থায় উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত রাজস্ব দায় হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই সময়ে দেবীদাস বসুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, এবং তাঁহার অনুগ্রহেই কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করেন।

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ অবস্থার এত উন্নতিসাধন কিরূপে করেন, তৎসম্বন্ধীয় আভাস আমরা উমাচরণ রায় প্রণীত রাজবল্লভের জীবনচরিত হইতে কতকটা প্রাপ্ত হই। কিন্তু অপর দুই গ্রন্থকর্ত্তা এতদ্বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন। রাজবল্লভের দেওয়ানী পদলাভের সময়ে ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান যশোবন্ত রায় নবাব-সমক্ষে রাজবল্লভের যে পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে জানা যায় "রায় দেওয়ান রাজবল্লভের সদ্বংশোদ্ভবতার ও কার্য্যদক্ষতার গুণানুবাদ পূর্ব্বক পূর্ব্ব নবাব রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের কৃতকার্য্যে নিকাসের দায় হইতে নিস্তার পাওয়ার এবং সেই সুকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ নবাব সরকার হইতে লক্ষ মুদ্রা মজুমদারকে পুরস্কার দেওয়া পাইবার প্রসঙ্গ সহ পরিচয় দিয়া রাজবল্লভকে

(১) বিক্রমপুর আকসাইলগ্রামবাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা দামুনীয়াবাসী বহু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের দীক্ষাগুরু ছিলেন। কৃষ্ণজীবন মজুমদার মহাশয় তাঁহার অংশে পতিত হন. সেই গুরু দেব খাগটীয়া বাসী কোন ভট্টাচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। পাঠসমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা প্রদান-কালে শিক্ষক ভট্টাচার্য্য, ছাত্র ভট্টাচার্য্যের নিকট একঘর বৈদ্য শিষ্যস্বরূপ পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ছাত্র ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণজীবনের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকেই দক্ষিণাস্বরূপ গুরুকে দান করেন। অদ্যাপি কৃষ্ণজীবনের বংশধরেরা খাগটীবার এবং অপর জ্ঞাতিগণ, যাঁহারা রাজনগর নিবাসী তাঁহারা আকসাইলের ভট্টাচার্য্যদের শিষ্য।

"তৃতীয় প্রবাদ এই যে মজুমদার মহাশয়ের চারি পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে তাঁহার আরও দুইটি পুত্র জন্মে। তাঁহারা যখন ১০।১২ বৎসর বয়সে উত্তীর্ণ হন, তখন এক দিবস এক সন্ন্যাসী হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, মজুমদার মহাশয়কে বলিলেন যে "এই দুই পুত্র মানব নহে এবং ইহারা বাঁচিয়া থাকিলে আপনার কোন প্রকার সুখ হইবে না" (চন্দ্রকুমার রায় প্রণীত জীবনচরিত ৪ পৃষ্ঠা)

রায় মহাশয় স্পষ্ট না কহিলেও এই কথা প্রতিপন্ন হয় যে, কৃষ্ণজীবন প্রথমাবস্থায় সুখী ছিলেন না।

দেওয়ানী পদে নিয়োগ করণের অনুরোধ করাতে ( পরদিন ) তাহাকে নবাব সমক্ষে আনয়নের অনুজ্ঞা হয়।" ৺ উমাচরণ রায় প্রণীত জীবনী
( নবপুর ১৩১১ সন পৌষ ৪০৪।৪০৫ পৃষ্ঠা )

বাঙ্গালার ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বোধহয় অবগত আছেন যে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দেওয়ানী সময়ে, যেকালে নিকাশী কাগজাতসহ বাদসাহসদনে যাইতে প্রস্তুত হন, তৎকালে প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণ এই নিকাশে সহি বা মোহরাঙ্কিত করিবার জন্য তিন লক্ষ টাকার দাবি করিলে, দেওয়ান লক্ষটাকা দিতে স্বীকৃত হইলেও যখন কানুনগো উহাতে সম্মত হইলেন না, তখন তদধীন কর্ম্মচারী রঘুনন্দন রায়কে নবাব হস্তগত করিয়া, তদ্দ্বারা কানুনগো দপ্তরের মোহর বাহির করিয়া স্বীয় নিকাসী কাগজে সংযোগান্তে অভীষ্ট সংসাধন করেন। ইহাই যেমন নাটোর-রাজবংশ-স্থাপয়িতা রঘুনন্দনের প্রথম পুণ্যকার্য্য, তদ্রূপ ঢাকার নায়েব নাজিমের সহিত তত্রত্য প্রধান কানুনগোর এইরূপ অবিকল কার্য্য উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণজীবন স্বীয় প্রভুর অসাক্ষাতে কানুনগোর মোহরাঙ্কিত করিয়া নায়েব নাজীমকে নিকাশের দায় হইতে অব্যাহতি করিয়া দেন, এবং প্রত্যুপ-কারে সুবেদারের নিকট হইতে লক্ষটাকা পুরস্কারস্বরূপ পাইয়া স্বীয় পুণ্যবলে রাতারাতি বড়মানুষ হইয়া উঠেন। অথচ শ্রীযুত গুপ্তমহাশয় উহা ঢাকিবার জন্য কত বাজে কথার অবতারণা করিয়াছেন।

তাঁহার মতে ঢাকার কানুনগো সেরেস্তার কার্য্য পরিদর্শন জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে একজন কর্ম্মচারী ঢাকাতে আগমন করেন। এদিকে ঢাকার কানুনগোর হিসাবাদিতে বহু ক্রটি থাকা প্রযুক্ত তিনি পলায়ন করেন। এ সময়ে যে প্রকোষ্ঠে বসিয়া কানুনগো কার্য্য করিতেন, তথায় ভিন্ন সেরেস্তার কার্য্যে কৃষ্ণজীবন নিযুক্ত ছিলেন। আসামী পলাতক, পর্য্যবেক্ষণকারক উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষ্ণজীবনকে ধরিলেন; কেননা তিনি কানুনগোর সহিত একত্র কেন অবস্থান করিতেন? মজুমদার করেন কি, তিন কি চারি মাস খাটিয়া কানুনগোর দপ্তর ঠিক করিয়া নিকাশ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তদন্তকারী

পুরস্কারস্বরূপ মজুমদার মহাশয়কেই কানুনগোর পদে বরণ করিলেন। কি অসীম ক্ষমতা! কেন স্বয়ং জাঁহাপনা ঢাকার নায়েব নাজীম কি তখন এরূপ অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন যে, এতটা কাণ্ড হইয়া গেল, আর উহার বিন্দু বিসর্গও তিনি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন না। কানুনগোর পদটী যেন এমনই ক্ষুদ্র, যে তাহা একটা বাজে লোক আসিয়া যাহাকে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া চলিয়া গেল, আর তাহাই ঠিক থাকিল। বাদসাহদের সময়ে দিল্লীর দরবার হইতে এই পদের ফর্ম্মাণ প্রেরিত হইত, পরে বাঙ্গালার নবাব নাজীমদের ক্ষমতার প্রসার বর্দ্ধিত হইলে, নবাব নাজীমের দরবার হইতেই বাদসাহের ফরমাণানুসারে এই কার্য্যের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। প্রাদেশিক নাজীম বা সুবেদারদের উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার ছিল না। যাহা হউক এই নিকাশ উপলক্ষে যে মজুমদার মহাশয় লাভবান হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণজীবন মজুমদার একসঙ্গে বহু অর্থ প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। নবরত্ন মন্দির তদীয় অর্থে নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন কতক ভূসম্পত্তিও ক্রয় করিতে সমর্থ হন। রাজবল্লভ ভ্রাতৃগণের সহিত এই সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিঃ টমসন রাজবল্লভের পুত্রদের সম্পত্তি বণ্টন জন্য রাজনগরে উপস্থিত হইলে, সেরেস্তাদার মৃত্যুঞ্জয় মুখটীর সাক্ষ্যবাক্যে এই কথার প্রমাণ হয়। (১) মিঃ বিভারিজ এই কথার আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, রাজবল্লভের পূর্ব্বপুরুষেরা সম্পত্তিশালী ছিলেন। রাজা অসম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব নন। এই স্থানে আর একটি কথার উল্লেখ করা সঙ্গত।

(১) ১৭৯১ সনের ২০ সেপ্টেম্বর রাজনগর সম্বন্ধে মিঃ টমসনের নিকট সাক্ষ্য দিবার সময় সেরেস্তাদার মৃত্যুঞ্জয় মুখটীর সাক্ষ্য বাক্যে বোধ হয় রাজবল্লভ কতক সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। কেবল নিজ ক্ষমতায় বড় হন না। সেরেস্তাদার বলেন "আমি ১৫।১৬ বৎসর বয়স হইতে এই জমিদারীর কার্য্য করিতেছি, এখন আমার বয়স ৬২ বৎসর, আমার পিতা রাজবল্লভের পিতার সময় আমার পূর্ব্বে কাজ করিতেন এবং আমরা দুইজনেই সমস্ত জমিদারীর হেড সেরেস্তাদার স্বরূপে নিযুক্ত হই।"

(মিঃ বিভারিজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস ৯৭ পৃষ্ঠা হইতে অনুবাদিত)

লেখক বলেন, রাজবল্লভের পিতা উত্তর সাহাবাজপুর নগরে বৈদ্য জমিদার বংশে বিবাহ করিয়া, লক্ষ্মীদিয়া প্রাপ্ত হন।

আমাদের ধারণা ছিল, উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার ও লক্ষ্মীদিয়ার বৈদ্য-বংশীয় জমিদারগণ একবংশ সম্ভূত, কিন্তু সাহাবাজপুর বাসী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর রায় মহাশয় বলেন, তাঁহারা পরস্পর এক বংশ নন, লক্ষ্মীদিয়ার জমিদারেরা দত্তবংশীয়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় বিরচিত জাতিতত্ত্ববারিধির ২য় খণ্ডের ৪৭ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে, রাজবল্লভ আশদীরাম দত্তের দৌহিত্র। লক্ষ্মীদিয়া প্রাপ্তির জনরব হইতে উহা কতকটা প্রতিপন্ন হয়।

উক্ত রায় মহাশয় আরও বলেন, জপসাবাসী গোপীরমণ সেন তাঁহাদের বংশে বিবাহ করেন, এই বিষয় তাঁহারা প্রাচীনগণ হইতে অবগত আছেন। কিন্তু রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার মহাশয় তাঁহাদের বংশে বিবাহ করেন কি না। তদ্‌বিবরণ তাঁহারা পরিজ্ঞাত নন।

অতঃপর জপসাবাসী গোপীরমণ সেন মহাশয়ের ছয় পুত্রের বিষয় (১)

(১) পিতার মৃত্যুর পর গোপীরমণ পিতৃব্যগণের ষড়যন্ত্রে দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে উত্তর সাহাবাজার নগরে জমিদার চাঁদ রায়ের ভগিনীর পাণি গ্রহণ করিয়া এক তালুক যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। পুনরায় দেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করেন। নবাব সরকারের খাসমহালের কার্য্য করিয়া বিপুল অর্থ অর্জ্জন করেন ও সাহাবাজপুর পরগণার দুই আনা অংশ ক্রয় করিয়া লন। জমিদার তনয়া হরিপ্রিয়ার গর্ভে গোপীরমণের যথাক্রমে, শ্রীরাম, কৃষ্ণরাম, গোবিন্দরাম, রামমোহন, রাজারাম, রঘুনন্দন এই ছয় পুত্র ও সত্যবতী নামে তনয়া জন্ম গ্রহণ করে। অনেকের ধারণা গোপীরমণ বিবাহের কৌতুক স্বরূপ সাড়াই আনা পরগণার মালিক হন, বাস্তবিক একথা সত্য নয়।

অত্যল্পদিবস গত হয়, উত্তর সাহাবাজপুর নিবাসী ভূতপূর্ব্ব জমিদার বংশীয় প্রাচীন ও অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎভাবে আমাদের সহিত যে কথা হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। রায় মহাশয় বলেন, "উত্তর সাহাবাদপুর পরগণা প্রথমতঃ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীমন্তরায়ের নিকট গচ্ছিত হয়। তৎপর জমিদারী বন্দোবস্ত সময়ে চারি আনা শ্রীমন্তের ভ্রাতা বাণেশ্বরও আট আনা শ্রীমন্তের পুত্র শ্রীরাম রায় (চাঁদ রায়) এবং বাকি চারি আনা অংশ ঢাকা বাসী মহম্মদ বশির চৌধুরীর সহিত বন্দোবস্ত হয়। (কেহ কেহ বলেন আট আনার মালিক মুসলমান জমিদার ছিলেন।)"

গুপ্ত মহাশয় বলেন, "কৃষ্ণরাম ও রামমোহন নবাব সরকারে করসংগ্রহ কার্য্য করিয়া যথাক্রমে "দেওয়ান ও ক্রোড়ী উপাধি লাভ করেন।" (৫১ পৃষ্ঠা)। দেওয়ান ও ক্রোড়ীগণ যে সমশ্রেণীর কর্ম্মচারী নন তাহা লেখক বুঝিতে সক্ষম হন নাই, ক্রোড়ীদিগকে দেওয়ানের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে হইত। আমরা দেওয়ানী ফর্ম্মাণের অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

## দেওয়ানী ফর্ম্মাণ

"(বিশেস সমন্বিত)......কে...... সুবার (যে দেওয়ানীতে নিযুক্ত করা হয়) দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে, তিনি প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম অনুসারে সরকারী মাহজাৎ এবং সায়রজাৎ রাজস্ব আদায় জায়গীরদারগণের কার্য্য ও সাধারণতঃ রাজকরসম্বন্ধীয় সমগ্র ব্যবস্থা পরিদর্শন করিবেন। প্রথামত রাজকীয় ব্যয়নির্ব্বাহের পর অবশিষ্ট রাজকোষে প্রেরণ করিতে হইবে এবং ইহার হিসাব ও পূর্ব্বতন দেওয়ানের হিসাবও সদরে পাঠাইবেন। যাহাতে আমাদের সুখশাসনে প্রজাবর্গ বর্ষে বর্ষে নিরাপদে গৃহ আবাদ ও অন্যান্য অধিকার ভোগ করিতে পারে এবং দেশের ঐশ্বর্য্য ও সুখ বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য তাহাদের প্রতি সদয় ও কোমল ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদত্ত হইতেছে।"

"ক্রোড়ী, কানুনগো, জায়গীরদার প্রভৃতি সমশ্রেণীর রাজস্ববিষয়ক কর্ম্মচারীকে জানান যাইতেছে যে, উক্ত প্রশংসিত ব্যক্তিকে আমাদের রাজকীয় নিয়োগে দেওয়ান বলিয়া স্বীকার করেন। দেওয়ানী সংক্রান্ত কার্য্যে তাহার নিকট দায়ী থাকেন, কিছুই গোপন না করেন এবং তাহার আইন সঙ্গত ও

"এই মহম্মদ মশির চারি আনা অংশ হইতে ৵১০ আড়াই আনা জপসার জমিদার ও /১০ দেড় রাজনগরের রাজারা খরিদ করিয়া লন।"

এই কথার সহিত আমাদের প্রাচীন কিম্বদন্তীর ঠিক ঐক্য হয়। আমরা শুনিয়া আসিতেছি জপসার গোপীরমণ সেন খাসনবীশ মহাশয় প্রথম পরগণার দুই আনা অংশ ও পরে তাহার পৌত্র রামগঙ্গা রায় আধ আনা ক্রয় করিয়া আড়াই আনার মালিক হন। জপসার অংশ দুর্গাপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ সেন ও রামগঙ্গা সেন নামে এবং রাজনগরের অংশ বাসুদেব রায় নামে পরিচিত আছে। যৌতুকপ্রাপ্ত ভূমি তালুক শ্রীরামসেন নামে লিখিত।

দেশহিতসাধক ও শ্রীবৃদ্ধিকর আদেশ মান্য করেন। এই নির্দ্দেশমত কার্য্য হয়, ব্যতিক্রম না ঘটে।" (১)

( অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস ৫২৬ পৃষ্ঠা )

উচ্চবংশজাত এবং বিদ্বান ও কার্য্যদক্ষ লোক দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সনন্দ ও পাঞ্জা প্রাপ্ত হইতেন। শুনা যায় কৃষ্ণরাম ঔরেঙ্গজীব বাদসাহের সহিযুক্ত পাঞ্জা ও সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা আইনই আকবরি হইতে অনুবাদ গ্রহণ করিয়া দেখাইব কোন্ শ্রেণীর লোক সনন্দ প্রাপ্ত হইতেন।

"কোন হুকুমনামা পত্র দস্তখত হইয়া বাদসাহী পাঞ্জা সংযুক্ত হইয়া থাকিলে তাহাকে সনন্দ বলে। সনন্দের তিন খানা নকল হয়, একখানা বাদসাহী দপ্তরে থাকে, একখানি যাহার নামে সনন্দ দেওয়া হয়, তাহাকে দেওয়া যায়; আর একখানি সুবেদারের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়; অর্থাৎ যে সুবায় সনন্দগ্রাহী বাস করেন, সেই সুবার সুবেদারের নিকট সনন্দের নকল যায়। এই বিভাগে বিশেষ বিশ্বাসী, সুপণ্ডিত সদ্বংশজাত ব্যক্তিই নিযুক্ত হইয়া থাকেন।"

( বসুমতী আফিস হইতে অনুবাদিত আইন ই আকবরি ৬৭ পৃষ্ঠা )

পরে আমরা যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিব, তৎসাপক্ষে এই সকল সনন্দও সনন্দগ্রহীতাদের কার্য্যকলাপের বিশেষ সম্বন্ধ থাকিবে। কাজেই উহার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন জন্য এতগুলি অনুবাদ সঙ্কলন করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

( ক্রমশঃ )

শ্রীআনন্দ নাথ রায়।

( ১ ) নিম্নলিখিত দেওয়ানী পদ গুলির বিষয় জানা যায়।

১। দেওয়ানই আলা ( প্রধান মন্ত্রী )
২। দেওয়ানই সরিফা
৩। দেওয়ানই ওলফ ( জায়গীর বিভাগে
৪। দেওয়ানই রেয়ুদাৎ
৫। দেওয়ানই খাসসামান
৬। দেওয়ানই সুজাবৎ ( প্রদেশিক মন্ত্রী )
৭। দেওয়ানই খাজানা
৮। দেওয়ানই নাওয়া

# জাহাঙ্গীরের অনুশাসন

১৬০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ১০ই তারিখে সম্রাট্ আকবর তনয় সেলিম, জাহাঙ্গীর নাম পরিগ্রহ করতঃ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতা মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিয়া পুত্রকে যে সকল সদুপদেশ ও শাসননীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর তদনুযায়ী কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে এবং সকল শ্রেণীর সর্ব্বজাতীয় প্রজার প্রীতিভাজন হইবার আশায়, সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই নিম্নলিখিত দ্বাদশটী অনুশাসন (বা রাজাজ্ঞা) প্রচার করেন। সম্রাট্ আত্মজীবন-চরিতে স্বয়ং লিখিয়াছেন :—

১। আমি জেখৌত, সায়মোহারী এবং তাম্‌ঘা নামক তিন প্রকার কর হইতে প্রজাবৃন্দকে অব্যাহতি প্রদান করি। এই ত্রিবিধ কর হইতে অন্যূন ষোড়শ সহস্র হিন্দুস্থানী স্বর্ণ মোণ সংগৃহীত হইত।*

২। ভগবানের সৃষ্ট জনপ্রাণী—যাহারা আমার তত্ত্বাবধানে বাস করে, তাহাদের কাহারও কোনও ধনসম্পত্তি যদি কেহ দস্যুতা দ্বারা অপহরণ করে বা অন্য কোন প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া আদায় করে, তাহা হইলে তৎস্থানবাসী সমস্ত প্রজা সেই অপহরণকারীর বা অপহৃত সম্পত্তির সন্ধান বলিয়া দিতে বাধ্য ;—কারণ স্থানীয় ঘটনা প্রযুক্ত তাহারাই এ সম্বন্ধে অধিক তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম। আমি আজ্ঞা করিতেছি যে, কোন জেলা পতিত অবস্থায় থাকিলে বা জনশূন্য হইয়া পড়িলে, তথায় নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রজাদিগকে বাস করিতে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের সুখসাচ্ছন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকার যত্ন লওয়া হইবে। ঐরূপ পরিত্যক্ত স্থানসমূহের জায়গীর-

* ইংরেজি আটাইশ পাউণ্ডে এক মোণ ধরা হয়।

দারগণের প্রতি আদেশ করিতেছি যে, এই সকল স্থান যাহাতে পুনরায় বাস-যোগ্য হয় এবং পথিকবৃন্দ নিরাপদে ঐসকল স্থান দিয়া গমনাগমন করিতে পারে, তন্নিমিত্ত মস্‌জিদ এবং বড় বড় সরাই নির্ম্মাণ করিবে। এইরূপ পরিত্যক্ত কোন স্থান যদি সম্রাটের খাস শাসনাধীন হয় এবং তথায় যদি 'ক্রোরী'র আবাস-গৃহ থাকে, তবে ক্রোরী (১) রাজকীয় ব্যয়ে এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।

৩। দেশবিদেশে পর্য্যটনশীল বণিকগণের পণ্যের মোট্ বা গাঁইট্ তাহাদের অসম্মতিতে খোলা হইবে না। তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে কোন দ্রব্য যদি প্রদর্শন করে বা বিক্রয় করিতে উদ্যত হয়, তবে ক্রেতৃগণ তাহা দেখিতে পারিবে। কিন্তু তাহা নষ্ট বা অপব্যবহার করিতে পারিবে না।

৪। কোন ব্যক্তি সন্তানসন্ততি রাখিয়া পরলোক গমন করিলে এবং সে রাজকর্ম্মচারী না হইলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাহার সন্ততিগণ পাইবে, অপরে তাহার তিলমাত্র অংশ পাইবে না বা পাইতে চেষ্টা করিবে না। কিন্তু মৃতের সন্তানসন্ততি না থাকিলে কিম্বা উপযুক্ত কোন উত্তরাধিকারী পাওয়া না গেলে, তাহার সমুদয় সম্পত্তি তাহার আত্মার সদ্গতির নিমিত্ত মস্‌জিদ এবং তালাও বা জলাশয় নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে।

৫। কোন ব্যক্তি কোনও প্রকার মদ্য প্রস্তুত করিতে বা ব্যবহার করিতে পারিবে না। যদিও সকলেই অবগত আছে যে, আমি নিজে একজন প্রসিদ্ধ মদ্যপায়ী—ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে অবাধে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পানাসক্ত, তথাপি আমি, এই অনুশাসন প্রচার করিলাম। প্রকৃতই আমি বালকসুলভ চপলতা বশে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক চঞ্চলমতি সঙ্গিগণের প্ররোচনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কেনা স্বীকার করিবে যে, সুরাপায়ী ব্যক্তির মানসিক শক্তি ও স্বাভাবিক তেজস্বিতা প্রভূত পরিমাণে মন্দীভূত হয়, এবং মনে নানারূপ কু-বাসনা সঞ্জাত হইতে থাকে ?

(১) ইহারা এক ক্রোর বা একশত লক্ষ দাম রাজস্ব আদায় করিতেন। এখন যেমন লক্ষ-পতি, ক্রোড়পতি বলা হয়, আকবরের সময়ে তেমনি এই 'ক্রোরী' পদের সৃষ্টি হয়।

আমার নিজের কথা বলিতেছি যে, আমার পানের মাত্রা এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, প্রত্যহ অর্দ্ধসের পরিমিত পেয়ালার কুড়ি হইতে ত্রিশ পেয়ালা পর্য্যন্ত সুরা পান করিতাম। এই কু-অভ্যাসের শোচনীয় পরিণাম এই যে, আমি সুরা পান না করিয়া এক ঘণ্টাও থাকিতে পারিতাম না, আমার হস্ত কম্পিত হইত এবং সচ্ছন্দ ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতাম না। এই সকল লক্ষণ দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, এই কু-অভ্যাস আরও কিছুদিন আমাতে সংক্রামিত থাকিলে, আমাকে শোচনীয় দশায় উপনীত হইতে হইত। কিন্তু সময় থাকিতে আমি সাবধান হই, এবং ছয় মাসের মধ্যে মাত্রা কমাইয়া প্রত্যহ পাঁচ পেয়ালা নির্দ্ধারণ করি। অবশ্য উৎসব বা আমোদাদির দিনে এই মাত্রার কিছু ইতর বিশেষ হইত। আমি আর একটী নিয়ম করি যে, দুই ঘণ্টা বেলার বেশি থাকিতে কোন ক্রমেই পান করিতে আরম্ভ করিব না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাজকার্য্যে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন হওয়ায়, আমি সায়ংকালীন উপাসনারও একঘণ্টা পরে পান করিতে আরম্ভ করি। পাঁচ পেয়ালার অধিক গ্রহণ করি না, পরন্তু উহার অধিক আর আমার পাকস্থলীতেও সহ্য হয় না। প্রধানতঃ দিবসে একবার মাত্র আমি আহার করি, এবং একবারে পাঁচ পেয়ালা পান করিলেই আমার মদ্যের তৃষ্ণা বিদূরিত হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত মাংস অপেক্ষা মদ্য কম প্রয়োজনীয় নহে, তন্নিমিত্ত এ অভ্যাস আমি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারিব না। তথাচ আমি পিতামহ হুমায়ুনের ন্যায়, যিনি পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পানাভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই,—বিশ্বাস করি যে, আমিও শীঘ্র বা বিলম্বে একদিন না একদিন এই কদর্য্য অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইব।

৬। কোন ব্যক্তি আমার রাজ্যের কোনও প্রজার গৃহে গৃহস্বামীর অসম্মতি-ক্রমে বাস করিতে পারিবে না। রাজকীয় সৈন্যদলের কোনও ব্যক্তি যদি রাজকার্য্যোপলক্ষে নগরে আগমন করে, এবং তদ্রূপ কোন ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় লইতে বাধা হয়,তবে তাহাকে তন্নিমিত্ত উপযুক্ত ভাড়া দিতে হইবে; তদন্যথায় তাম্বু পাতিয়া তাহাকে নিজের আবাস-মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

একজন সম্পূর্ণ-অপরিচিত ব্যক্তির গৃহে অনধিকারপ্রবেশ পূর্ব্বক পরিবার মণ্ডলীর বক্ষের উপর আসন গাড়িয়া, গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা আরামপ্রদ কক্ষটী দখল করিলে, প্রজার যে কষ্ট হয় তদপেক্ষা অধিকতর মনোদুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে? নিজের পরিবার ও সন্তানসন্ততিগণ আশ্রয়াভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলে, কোন্ প্রজার মনে শান্তি বিরাজ করিতে পারে?

কোন ব্যক্তির কোনও অপরাধে আর কর্ণ বা নাসিকা ছেদন করা হইবে না। চৌর্য্যাপরাধে কেহ অপরাধী হইলে তাহাকে কণ্টকিত বেত্রদণ্ড দ্বারা প্রহার করা হইবে, অথবা ভবিষ্যতে এরূপ অপরাধ আর যাহাতে না করে তজ্জন্য কোরাণ স্পর্শ দ্বারা শপথ করাইয়া লওয়া হইবে।

৮। ক্রোরী এবং জায়গীরদারগণের প্রতি আদেশ করা যাইতেছে, তাহারা যেন অত্যাচার করিয়া কোনও প্রজার জমাজমা অধিকার বা নিজেরাই চাষ আবাদ না করে। কোন জেলার কোন জায়গীরদারই যেন স্বক্ষমতার অতিরিক্ত পরিচালন না করে। অথবা অপর জেলা হইতে কোন ব্যক্তি বা পশুকে যেন নিজের জেলায় আনিতে বাধ্য না করে। পক্ষান্তরে নিজের জেলার কৃষিকার্য্যের উন্নতি পক্ষে তাহারা যেন সবিশেষ মনোযোগী হয়।

৯। কোন ব্যক্তি অসাধু উপায়ে কোন প্রকার ভেষজ দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে বা তাহার ব্যবহারপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবে না।

১০। প্রধান নগরের শাসনকর্ত্তাদের প্রতি আদেশ করা যাইতেছে, তাহারা যেন দুঃস্থ উপায়হীন পীড়িতগণের চিকিৎসার্থে নিজেদের শাসনাধীন স্থানে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন। পীড়িত ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐস্থানে থাকিয়া চিকিৎসিত হইবে, এবং তাহার যাবতীয় ব্যয়ভার রাজকীয় ধনভাণ্ডার হইতে নির্ব্বাহিত হইবে। রোগী আরোগ্যলাভ করিলে তাহার আবশ্যকীয় খরচপত্র দিয়া বিদায় করা হইবে। চিকিৎসার নিমিত্ত প্রত্যেক হাঁসপাতালে শাসনকর্ত্তাগণ কার্য্যক্ষম চিকিৎসক নিযুক্ত করিবেন।

১১। আমার জন্ম মাসে ( রেবিয়া মাস ) নগর এবং পল্লীগ্রামের প্রত্যেক

প্রজা মাংসাহার পরিত্যাগ করিবে এবং বৎসরের কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে কোনও ব্যক্তি জীব-হিংসা করিতে পারিবে না। প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে যে দিন আমি সিংহাসনে আরোহণ করি, এবং রবিবারে,—বিশ্ব-সৃষ্টি যেদিন সমাপ্ত হয়,—এই দুই দিন কোন ব্যক্তি যাহাতে মাংসাহার না করে, তজ্জন্ত বিশেষ ভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইতেছে। আমার পরলোকগত পিতা একাদশ বর্ষ—অতি কঠোর ভাবে এই নিয়ম পালন করেন এবং কোন কারণেই তিনি রবিবারে মাংস ভক্ষণ করেন নাই। তজ্জন্য ঐদিনে আমার রাজ্যের সর্ব্বত্র যাহাতে মাংসাহার নিষিদ্ধ হয়, তাহার বিধান করা আমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করি।

১২। সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহ, জায়গীরদার এবং মিত্র সর্দ্দারগণ আমার পিতার শাসনকালে যে যেমন পদমর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন, এখনও তাঁহারা তদ্রূপ জীবিতকালতক উপভোগ করিতে থাকিবেন। অধিকন্তু গুণানুসারে তাঁহাদের এই পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেও আমি প্রস্তুত আছি। যখনই কোন ব্যক্তির গুণের পরিচয় পাইব, তখনই তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি করিব। যথা দশ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতিকে পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি ইত্যাদিরূপে উন্নত হইবেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের এই অনুশাসনগুলি পাঠ করিলে তাঁহার সহৃদয়তা ও নীতিজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা মনে করেন যে, মোসলমান রাজত্বসময়ে গরীব দুঃখিগণের চিকিৎসার নিমিত্ত কোনরূপ দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল না, তাঁহারা যেন দশম অনুশাসনটী পাঠ করেন। পরন্তু সম্রাট হাতুড়ে বৈদ্যদিগকেও দমন করিতে চেষ্টা করেন। শেষোক্ত চিকিৎসকদিগের অপূর্ব্ব চিকিৎসা-জ্ঞান প্রভাবে দেশের কত স্থানে কত যে অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা তৎকালে ইহাদের প্রভাব আরও অধিক ছিল, তন্নিমিত্তই রাজদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

---

# চাঁচড়া রাজবংশ। *

ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গলার বিদ্রোহের সহিত সম্যক্ পরিচিত। মোগলকুলতিলক আকবর বাদশাহ তখন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় দিল্লীর সিংহাসনে দেদীপ্যমান। বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া তিনি তাহা দমনার্থে প্রথম রাজা টোডরমলকে প্রেরণ করেন, কিন্তু অন্য কার্য্যনিবন্ধন তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হওয়ায়, মির্জা আজিম খাঁর উপর সে ভার অর্পিত হয়। সম্রাটের আদেশে বিপুল বাহিনী সঙ্গে লইয়া ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আজিম খাঁ বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হয়েন। রাজা টোডরমল ২ বৎসরে যাহা করিতে পারেন নাই, নীতিকুশল আজিম হিন্দু ও মোগল সেনানায়কগণের বীরত্বে এক বৎসর মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিয়া সম্রাটের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। যে সকল সেনানায়কগণের যুদ্ধকৌশলে আজিম খাঁ বিদ্রোহদমনে সমর্থ হইয়াছিলেন, ভবেশ্বর রায় তন্মধ্যে অন্যতম। যুদ্ধান্তে কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ আজিম খাঁ ভবেশ্বর রায়কে সৈয়দপুর, আহম্মদপুর, মুড়াগাছা ও মল্লিকপুর নামক চারিটি পরগণা জায়গীর প্রদান করেন।

ভবেশ্বর উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ—তাঁহার নিবাস হুগলী জেলায় ছিল, কিন্তু সেখানে থাকিয়া যশোহরের অন্তর্গত জায়গীর রক্ষা করা অসুবিধাজনক বিবেচনায় পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া যশোহর নগরের ১ মাইল দক্ষিণে স্থিত চাঁচড়া গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তথায় থাকিয়া জায়গীর শাসন ও সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন। জায়গীর পাইয়া ভবেশ্বর পাঁচ বৎসর কাল মাত্র জীবিত

* Stewart's History of Bengal; Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. II; J. Westland's Report on the District of Jessore; Ram Sunker Sen Bahadur's Statistical Account of Jessore; ক্ষিতীশ বংশাবলী-চরিতম্ এবং যদু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রাজা সীতারাম রায়।

ছিলেন। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র মুতাব বা মহাতাব রায় উত্তরাধিকারীসূত্রে ঐ পরগণা চারিটি প্রাপ্ত হয়েন।

মুতাবের সময়েই বঙ্গের শেষ বীর মহারাজা প্রতাপাদিত্য মোগলপ্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার "সোণার যশোহর"—সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া স্বাধীন ভূপতিরূপে রাজ্যবিস্তার ও শাসন করিতে লাগিলেন। ক্রমে মুতাবের পরগণা কয়েকটীও যশোহর রাজ্যভুক্ত হইল। দুর্ব্বল মুতাব অনুপায়ে নীরব রহিলেন। প্রতাপাদিত্যকে বশে আনিবার জন্য সম্রাট আকবর একে একে অনেক সৈন্য, অনেক সেনানায়ক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু পুরুষসিংহ প্রতাপাদিত্যের বাঙ্গালী সৈন্য সেনাপতিদিগের সিংহবিক্রমের নিকট কেহই তিষ্টিতে পারিল না। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হইলে যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া আগ্রার রাজতক্তে সমাসীন হইলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জাহাঙ্গীর বাঙ্গালী বীর প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়া আকবরের ন্যায় অনেক সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই প্রতাপাদিত্যকে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া ক্ষত্রিয় বীর মহারাজ মানসিংহকে বিপুল সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া বাঙ্গলায় পাঠাইলেন। মানসিংহ সবেগে আসিয়া বাংলায় পৌঁছিলেন। মুতাব দেখিলেন এই উপযুক্ত সময়। তিনি শত্রুতার শোধ দিবার প্রকৃষ্ট অবসর দেখিয়া মানসিংহের সহিত যোগ দিয়া প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। মানসিংহের ভেদনীতিকৌশলে, কচুরায়ের স্বদেশ-দ্রোহিতায়, ভবানন্দের বিশ্বাসঘাতকতায় ও মুতাব রায়ের শত্রুতায় বাঙ্গালী বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন হইল। সহকারিতার পুরস্কারস্বরূপ কচুরায় যশোহরের করদ রাজা, ভবানন্দ বাগুয়ান পরগণা ও মুতাব রায় তাঁহার পূর্ব্ব সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। ভবেশ্বর জায়গীর পাইয়াছিলেন কিন্তু মুতাব রায় জায়গীর পাইলেন না—পুনঃপ্রাপ্ত পরগণা চারিটীর জন্য সম্রাট সরকারে তাঁহাকে কর দিতে হইত। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুতাব সম্পত্তি ভোগ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র কন্দর্প রায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা কন্দর্প রায় সম্পত্তি বৃদ্ধি

করেন। দাঁতিয়া, বাগমারা, খলিষাখালী. সেলিমাবাদ ও সাজিয়ালপুর প্রভৃতি পরগণায় কন্দর্প স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা কন্দর্পের অধিকৃত পরগণাগুলি সৈদপুর পরগণার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

রাজা কন্দর্পের পুত্রের নাম মনোহর রায়। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর মনোহর রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মনোহরই চাঁচড়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। চাঁচড়া রাজগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন কৌশলী ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। মনোহরের সময়ই চাঁচড়া রাজ্য উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে। সম্পত্তির অধিকারী হইয়াই মনোহর নিজ জমিদারীর কর কড়ায় গণ্ডায়হিসাব করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজকোষে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে অল্পদিন মধ্যেই রাজা মনোহর তদানীন্তন বাঙ্গলার নবাব সুলতান সুজার বিশেষ বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সুলতানের অনুগ্রহে মনোহর নিকটবর্ত্তী জমিদারগণের উপরও অনেকটা কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। এই সমস্ত জমিদারগণকে রাজা মনোহরের হস্ত দিয়াই বাৎসরিক কর দাখিল করিতে হইত। নিজেদের স্বাধীনভাবে নবাব সরকারে টাকা পাঠাইবার অধিকার ছিল না। জমিদারগণ যথাসময়ে রাজকর প্রদানে অসমর্থ হইলে যে কেহ সেই বাকী কর দাখিল করিতে পারিতেন; রাজপ্রতিনিধিগণ তাঁহার সহিতই বাকী-পড়া মহাল বা সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিতেন। এই ভাবে বাকী কর দাখিল করিয়া রাজা মনোহর নিম্নলিখিত পরগণাসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১। রামচন্দ্রপুর ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে, ২। হোসেনপুর ১৬৮৯ খৃঃ, ৩। বাংদিয়া ও রহিমাবাদ ১৬৯১ খৃঃ, ৪। চেঙ্গুটিয়া ১৬৯০ খৃঃ, ৫। ইযফপুর ১৬৯৬ খৃঃ, ৬। মলই, শোভনালি ও শোভনা ১৬৯৯ খৃঃ, ৭। মাহস ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে এইগুলি ব্যতীত তালা, ফলুয়া, শ্রীপদ কবিরাজ, ভাতলা ও কলিকাতা প্রভৃতি আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণাও মনোহরের শাসনাধীনে আইসে।

এত গুলি পরগণার মালিক হইয়াও মনোহরের রাজ্যবিস্তার আশা মিটিল না। সুযোগ পাইলেই তিনি পররাজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজ রাজ্য বৃদ্ধি

করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। বাঙ্গালীগৌরব রাজা সীতারাম রায় এই সময়ে মহম্মদপুরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া বীরপ্রতাপে চতুর্দ্দিক শাসন করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিতেছিলেন। তিনি সমুদ্রতীরবর্ত্তী রামপাল জয় করিতে গিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া অসমসাহসী মনোহর তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়েন। রাজা মনোহর ও তাঁহার বন্ধু যশোহর মির্জ্জানগরের ফৌজদার নূরউল্যা খাঁ বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া মহম্মদ পুরের অনতিদুরবর্ত্তী বুনাগাতি আসিয়া ছাউনি করিলেন। সীতারাম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজধানী অরক্ষিত ছিল না। তাঁহার উপযুক্ত ও কার্য্যকুশল দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের উপর রাজধানী রক্ষার ভার ছিল। মনোহর ও নূরউল্যা রাজধানী আক্রমণ করিবার অভিলাষে অগ্রসর হইতেছেন জানিতে পারিয়াই, দেওয়ান মহাশয় উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য ও কালে খাঁ, ঝুম ঝুম খাঁ নামক দুইটী বৃহৎ কামান ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র কামান সমভিব্যাহারে কুল্লে নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলেন, এবং স্থানের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফটকী নদী হইতে চিত্রা নদী পর্য্যন্ত এক বৃহৎ খাল কাটাইয়া উভয় সৈন্যের মধ্যে এক প্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী ব্যবধান করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। * সীতারামের অনুপস্থিতির সুযোগেই মনোহর ও নূরউল্যা মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এখন যদুনাথের ক্ষিপ্রকারিতা, কার্য্যকুশলতা ও সাহস সন্দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রামপাল জয় করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াই সীতারাম, মনোহর ও ন্যূরউল্যার ধৃষ্টতার কথা অবগত হইলেন, এবং প্রথমেই মনোহরকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিতে ধাবিত হন। সীতারাম সৈন্যসহ চাঁচড়ার অনতিদূরে ভৈরবনদের তীরবর্ত্তী নীলগঞ্জ পাড়ায়,

* দেওয়ান যদুনাথের খনিত খালকে সীতারাম "যদুখালি" নামে অভিহিত করিয়া দেওয়ানের সম্মান বৃদ্ধি করেন। "যদুখালি" ও বুনাগাতির "কেল্লার মাঠ" এখনও বিদ্যমান আছে।

উপস্থিত হইলে, মনোহর আসিয়া সীতারামের শরণাপন্ন হইলেন। এখানে সীতারামের সহিত মনোহরের সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে স্থিরীকৃত হয় যে, উভয়ে উভয়ের বিপদ আপদে সহায়তা করিবেন। কিন্তু সন্ধিতে কি হইবে? সীতারাম পূর্ব্বের ন্যায়ই মনোহরের হিংসার পাত্র রহিলেন—সীতারামের পতনের জন্য মনোহর আগ্রহের সহিতই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজ সমাজের উন্নতির জন্যও মনোহর সর্ব্বদাই বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তিনি নিজে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন, তাই নানাস্থান হইতে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ আনিয়া স্বসমাজের পুষ্টি সাধন করেন।

মনোহর বিদ্যোৎসাহী ও স্বজনপ্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার সভায় সর্ব্বদাই দেশবিদেশের অধ্যাপক পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনের সমাগম হইত। তিনি পণ্ডিত ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ গণকে ব্রহ্মোত্তর, দেবসেবার জন্য দেবোত্তর এবং অতিথিসেবার জন্য বহু সম্পত্তি দান করিয়া প্রকৃত 'রাজা' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন! ৫৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজা মনোহর মানবলীলা সংবরণ করেন।

মনোহরের পুত্র রাজা কৃষ্ণরাম রায় বাকী কর দাখিল করিয়া নবাব মুর্শিদ-কুলি খাঁর নিকট হইতে রায়মঙ্গল, মহেশ্বর পাশা ও অন্যান্য কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বাজিতপুর পরগণার কিয়দংশ তিনি কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট হইতে খরিদাসূত্রে প্রাপ্ত হয়েন। কৃষ্ণরামের দুই পুত্র শুকদেব ও শ্যামসুন্দর।

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরামের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শুকদেব রাজা হন। কৃষ্ণরামের কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর পিতামহীর বিশেষ প্রিয় ছিলেন, তাই রাজা মনোহরের বিধবা রাণী শ্যামসুন্দরকে সম্পত্তির।০ চারি আনা অংশ প্রদান করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পৌত্র রাজা শুকদেবকে অনুরোধ করেন। শুকদেব পিতামহীর আদেশে শ্যামসুন্দরকে সম্পত্তির।০ চারি আনা অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে চাঁচড়া রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হইয়া বার আনা

অংশ ইষফ্‌পুর তরফ ও চারি আনা অংশ সৈদপুর তরফ নামে অভিহিত হইতে থাকে।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজা শুকদেব রায়ের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র নীলকণ্ঠ বার আনার মালিক হইয়া বসিলেন। জমীদারী হাতে পাইয়াই নীলকণ্ঠ প্রথমেই পিতৃব্য শ্যামসুন্দরের বিষয় টুকু কাড়িয়া লইলেন। দুর্ব্বল শ্যামসুন্দর নীলকণ্ঠের সহিত না পারিয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া নবাব আলিবর্দ্দির শরণাপন্ন হন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্যামসুন্দর ও তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার সম্পত্তি মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন নবাব মীরজাফর আলি খাঁ সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। নবাব দরবারে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী আগা মহম্মদ খাঁ তাঁহার কন্যা মন্নুজান বিবিকে হুগলী নিবাসী শলাউদ্দীন খাঁর সহিত বিবাহ দেন। রাজা শ্যামসুন্দরের চারি আনা অংশ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইলে, আগা মহম্মদ উপযুক্ত সম্পত্তির বিনিময়ে নবাবের নিকট হইতে ঐ সম্পত্তি লইয়া কন্যা মন্নুজানকে যৌতুক দিলেন। মন্নুজানের কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর পর ফারাজ অনুসারে তাঁহার ভ্রাতা (মন্নুজানের মাতার পরবর্ত্তী স্বামীর ঔরষজাত পুত্র) হাজি মহম্মদ উত্তরাধিকারী সূত্রে ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। *

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে নীলকণ্ঠের পুত্র শ্রীকণ্ঠ চাঁচড়া রাজ্যের বার আনা তরফ ইষফ্‌পুরের রাজা হইলেন। দেশ তখন সম্পূর্ণরূপেই ইংরেজ শাসনাধীনে গিয়াছে। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্ণর জেনারল হইয়া ভারতে আগমন করেন। ইনি বাঙ্গলার রাজস্ব বিষয়ে দশশালা বন্দোবস্ত করিয়া জমীদারদিগকে ভূমি সম্পত্তির সত্বাধিকার প্রদান করিলেন। নির্দ্ধারিত বার্ষিক খাজনা নিয়মিত দিতে পারিলেই জমীদারগণ নিশ্চিন্তমনে চিরকাল ভূসম্পত্তি ভোগ দখল করিতে পারিবেন। জমীর কর কস্মিন কালেও বৃদ্ধি হইবে না। কর্ণওয়া-

* এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ ১৩:২ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "ঐতিহাসিক চিত্রে" আমাদের লিখিত 'হাজি মহম্মদ মহসিন" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

লিশের এই বন্দোবস্তই বাঙ্গলার জমীদার গণের শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা শ্রীকণ্ঠের পক্ষে ইহার ফল ভাল হয় নাই। এই বন্দোবস্তে তাঁহার জমীর খাজনা গভর্ণমেণ্ট এত বৃদ্ধি করেন যে, তত টাকা আদায় করিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িল। নির্দ্দিষ্ট দিনে উদয়াস্তের মধ্যে রাজস্ব জমা দিতে না পারায়, গভর্ণমেণ্ট শ্রীকণ্ঠের অনেকগুলি পরগণা খাস করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন প্রথমে কয়েক বৎসর অতিরিক্ত হারে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব সরবরাহ করায় শ্রীকণ্ঠের বিস্তর টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল। এই ঋণ-দায়ে তাঁহার অবশিষ্ট সম্পত্তি 'সেরিফ সেলে' বিক্রয় হইয়া গেল। শ্রীকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা গোপীকণ্ঠ বিষয় রক্ষা করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সম্পত্তি হারাইয়া রাজা শ্রীকণ্ঠ বিষম বিপদে পড়িলেন। শেষ বয়সে পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি ভোগী হইতে হইয়াছিল।

রাজা শ্রীকণ্ঠ ধার্ম্মিক, আশ্রিতপ্রতিপালক ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। মির্জ্জানগরের ফৌজদার নূরউল্যা খাঁর প্রপৌত্র হিদায়ৎউল্যা ও রহমৎউল্যা অর্থাভাবে বিপন্ন হইলে, রাজা শ্রীকণ্ঠ বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভরণ পোষণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া ভ্রাতৃযুগলকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার জমীদারী ইষফ্‌পুর পরগণার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামে শ্রীশ্রী৺ কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া বিগ্রহের সেবার জন্য বহু ভূমি সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্রীকণ্ঠের মৃত্যু হয়।

শ্রীকণ্ঠের পুত্র বাণীকণ্ঠ পিতার মৃত্যুর পর ৬ বৎসর কাল গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগীই ছিলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারমানসে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তদানীন্তন সুপ্রীমকোর্টে নালিশ করিয়া সৈদপুর পরগণার কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। জমীদারী হাতে পাওয়ার পর বাণীকণ্ঠ গভর্ণমেণ্টদত্ত বৃত্তি উপেক্ষা করিয়া আবার 'রাজা' বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

বাণীকণ্ঠের পুত্র বরদাকণ্ঠ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী হন।

পিতার মৃত্যুসময়ে বরদাকণ্ঠ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধারণে আইসে। চাঁচড়া রাজাদিগের অন্যতম সম্পত্তি সাহস পরগণা গবর্ণমেণ্টের ভ্রমবশতঃই রাজা শ্রীকণ্ঠের সময়ে বাকীকরের নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়, এত দিন পরে সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্রীকণ্ঠের পৌত্র বরদাকণ্ঠকে সাহস পরগণা প্রত্যর্পণ করিয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ড্যালহৌসির অকার্য্যের ফলস্বরূপ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ রূপ ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। চতুর্দ্দিকেই অত্যাচার পীড়িত ভারত-বাসীর শৌর্য্য বীর্য্য দেখিয়া বৃটিশ সিংহকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। তখন যদি ভারতবাসী স্বভাবসিদ্ধ পরদুঃখকাতরতা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে ধনপ্রাণ দিয়া গবর্ণমেণ্টকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে বৃটিশ সিংহকে যে ভারতের আশা জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া ফেরুবৃত্তি অবলম্বনে সাত সমুদ্র তের নদী পারে নিজ গহ্বরে ফিরিয়া যাইতে হইত, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজভক্ত জমিদারের ন্যায় চাঁচ-ড়ায় রাজা বরদাকণ্ঠও বিদ্রোহের সময় বিপন্ন গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ আনুকুল্য করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ থামিয়া গেলে সেই সাহায্যের প্রীতিচিহ্নস্বরূপ কৃতজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট বরদাকণ্ঠকে শূন্যগর্ভ "রাজা বাহাদুর" উপাধিভূষণে ভূষিত করেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টের এমনই কৃতজ্ঞতা বটে!

রাজা বরদাকণ্ঠ ধর্ম্মালোচনার সময়াতিপাত করিতেন। শেষ জীবনে তিনি বৈষয়িক ব্যাপার পুত্র-হস্তে ন্যস্ত করিয়া সর্ব্বদাই বনে, জঙ্গলে বা পর্ব্বতশিখরে বসিয়া জপ, তপ, হোম প্রভৃতি মহাসাধনায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর পরম ব্রহ্মের নাম জপ করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা বরদাকণ্ঠের তিন পুত্র। জ্ঞানদাকণ্ঠ, মানদাকণ্ঠ ও হেমদাকণ্ঠ প্রভৃতি কাহাকেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পৈতৃক ভূষণ রাজা বাহাদুর উপাধি ব্যবহারের অধিকার দেন নাই।

গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রে তাঁহারা 'কুমার' বলিয়া অভিহিত হইলেও দেশের লোকে তাঁহাদের রাজা বলিয়া জানিত। জ্ঞানদাকণ্ঠ প্রভৃতির সময়েই তাঁহাদের সম্পত্তির অধিকাংশই নানা কারণে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ভ্রাতৃত্রয় একে একে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। এখন তাঁহাদের বংশধর কুমার ক্ষীরোদকণ্ঠ প্রভৃতিই বহুসম্মানিত ও প্রাচীন চাঁচড়ার রাজবংশের চিহ্নরূপে বর্ত্তমান।

রাজবংশধরগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব সম্পত্তি হারাইয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও তাঁহারা বিনয়, গাম্ভীর্য্য, আশ্রিতবাৎসল্য, দানশীলতা ও আতিথেয়তা প্রভৃতি রাজোচিত সদ্‌গুণরাজীতে বিভূষিত। আমাদের সময় সেবক কার্য্যোদ্ধারের গুরু গবর্ণমেণ্টের নিকট বর্ত্তমানে তাঁহারা নগণ্য ও অবহেলিত হইতে পারেন, কিন্তু দেশের অপামরসাধারণ ভদ্র ইতরের হৃদয়ে তাঁহাদের জন্য যে পবিত্র সম্মানিত আসন প্রতিষ্ঠিত আছে, গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত রাজা ও "রাজা বাহাদুর" প্রভৃতি শূন্যগর্ভ উপাধি ব্যাধি হইতে তাহা কত অধিক আদরের, কত অধিক গৌরবের কুমার বাহাদুরগণ তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

## কৃষ্ণকুমারীর আত্মত্যাগ।

জড়াইয়া দিল সখী অলকের ভার
কাঁদিতে কাঁদিতে, কৃষ্ণা তনু আপনার
নীলাম্বরে সম্বরিয়া বিম্বাধর দিয়া
শেষ হলাহল-পাত্র দিল নিঃশেষিয়া।
মরণের তীরে কৃষ্ণা, পিতা মাতা ভাই
পরিজন দাস দাসী কেহ কাছে নাই—
কেবল একটি প্রাণী প্রহরীর অসি
উপেক্ষিয়া কাঁদিতেছে তাঁর কাছে বসি,
আর দূরে শুনা যায় রুদ্ধ অন্তঃপুরে
কৃষ্ণকুমারীর মাতা বুঝি ওই ঝুরে,—
'রে কৃষ্ণা, রে নন্দনের মন্দার-মঞ্জরী
তব তনু রুচি দিল তোরে ছিন্ন করি!

নীরব অবনী, ওই বৃক্ষ-বাটিকায়
কামিনী কুঞ্জের শাখে পাখী কভু গায়
উদ্দাম সঙ্গীত তার, জোনাকির দল
পল্লবের অবকাশে করে ঝল মল,
উদার নভসে জাগে রজত জোছনা
বিশ্ব-অনুরাগ মত, ঝরিছে ঝরণা

ত্রিদিব-সঙ্গীত গাহি, হায় হেন কালে,
নিরাময় নিরমল নিসর্গের কোলে,
হরিতে কৃষ্ণার প্রাণ করেছে মন্ত্রণা
নির্ম্মম পরুষাচারী পাপী কয়জনা ;
জলে স্থলে ব্যোমে জাগে বিচিত্র স্বপন,
জ্বলিছে পাপীর হিয়া শ্মশান যেমন !

৩

যথা যবে বৈশাখের দুরন্ত বৈকালে
বজ্র বিদ্যুদগ্নি-ভরা মেঘ দল বলে
আক্রমে সহসা আসি এ বিশ্ব সংসার,
তেমতি বিষের ক্রীড়া শরীর কৃষ্ণার
আক্রমিল ; শিহরিয়া কমল-লোচনা,
কহিলা সখীরে তাঁর "লো চারুদশনা
আজি এই চন্দ্রালোকে কুসুম-সৌরভে
পল্লবিত বল্লরীর মর্ম্মরিত রবে
ঘুমায়ে পড়িয়া সখি, আজি মোর কাণে
পশিতেছে অজানিত সুর লয় তানে
কোথাকার বংশীধ্বনি ; আজি মোর শেষ,
আসিবে দেবতা পরি পীতাম্বর বেশ।

৪

আজি মোরে যেতে হবে,—সহসা যেমতি
ভাঙ্গিলে জাঙ্গাল মাঠে অব্যাহত গতি
ছোটে বান-ডাকা নদী, শোকের প্রবাহ
তেমতি সখীর হৃদে ছুটিল দুঃসহ ;
কাঁদিয়া উঠিলা বালা, কামিনীর শাখে
যত গুলি ফুল ছিল থাকে থাকে থাকে

সহসা ঝরিল, শীর্ণা তটিনীর বুকে
যত গুলি ঢেউ ছিল কি জানি কি দুঃখে
চূর্ণিল নিজের পড়ি তটে আছাড়িয়া,
প্রদীপ্ত খদ্যোত-ব্রজ কি যেন ভাবিয়া
ছাড়ি উচ্চ বৃক্ষচূড় পড়িলা ভূতলে
নিমেষে, গর্জ্জিলা হরি দূর পশুশালে।

৫

আরম্ভিলা পুনঃ কৃষ্ণা, "পুরবাসী যত
শ্বাসে ছন্দে অশ্রুজলে বান্ধবের মত
দিয়াছে বিদায় মোরে, এবে তব কাছে
সে বিদায় সে উচ্ছ্বাস হিয়া নাহি যাচে ;
মনে হয় প্রভাদীপ্ত উষাটির মত
বিহসি উঠিবে তুমি, অস্তাচল-গত
আমি শুকতারা সম তোমার অঞ্চলে
লুটায়ে পড়িব ! তুমি মোর কর্ণমূলে
মরণ আসিবে যবে, যাঁরে ভালবাসি
তাঁহারি নামটি সখি শুনাইও হাসি ;
আমার মরণে হবে রাজ্যের মঙ্গল,
থেমে যাবে সর্ব্ব দ্বন্দ্ব, সর্ব্ব কোলাহল।"

৬

ব্যাধ-অপহৃত শূন্য নীড় পাশে বসি
আরম্ভে যেমতি পাখী অশ্রুজলে ভাসি
করুণ রাগিণী তার, সখী আরম্ভিলা :—
"নিশি সুখস্বপ্নসম জীবনের লীলা
শেষ হয়ে আসে তব, আর আমি একা—
এইখানে বসে বসে তব মৃত্যু দেখা !

পদতলে কুশাঙ্কুর বিঁধিলে যাহার
দেখা দিত যেইখানে জনতা অপার,
সেইখানে—হায় আজি একা আমি একা,
আর কিবা? বসে বসে তার মৃত্যু দেখা!
বাড়িয়াছি যার সনে বনে উপবনে
নদী-তীরে, প্রাসাদের রম্য নিকেতনে,

৭

যাহাদের প্রাণ এক বিভিন্ন শরীর
ইহাই ধারণা ছিল, একি অবনীর
দেখি রীতি, তাহাদের মধ্যে একজন
মরণের তট-প্রান্তে করিছে গমন—
আর আমি—অকম্পিত সুস্থ কলেবর—
কৃষ্ণা কহে, থাম ভগ্নী, ধর অন্য স্বর
কহ অন্য কথা, আর দণ্ড দুই চারি
সময় রয়েছে মোর; পারি কি না পারি
কহিতে মনের কথা: বসন্তে যখন
ভরিবে চম্পক-বাসে সারা উপবন,
মধুকর কোথা হতে আসি ঝাঁকে ঝাঁকে
রচিবেক মধুচক্র সহকার-শাখে,

৮

গান গুঞ্জরণে তরু হইয়া ব্যাকুল
কান্তে কান্তে ফুটাইবে সমধু মুকুল
গুঞ্জনের প্রতিদান, বাসন্তী কাকলি
জেগে যাবে তালী কুঞ্জে, 'গন্ধ দাও বলি'
ক্ষুদ্র নদী বক্ষে স্নাত মলয় সমীর
আসিবে চম্পক-তলে অতিথি সুধীর,

সে সময়ে চম্পকের যে কয়টি কলি
ঝরে যাবে বৃক্ষ হতে, সযতনে তুলি
মম দেবতার পদে করিও অর্পণ—
বিফলে না যায় যেন তাদের জীবন !

৯

হেন কালে অদূরের মাধোজী মন্দিরে
মঙ্গল আরতি-ধ্বনি ধ্বনিল গম্ভীরে,
শঙ্খ, ঘণ্টা. কাংস্যনাদ, জন-কলরোল
সিন্ধুর নির্ঘোষ সম তুলিল কল্লোল—
যত গুলি কুঁড়ি ছিল বনে উপবনে
সহসা ফুটিয়ে গেল, কুঞ্জ-সখী গানে
ভারাক্রান্ত হয়ে বায়ু জাগিল অমনি
পূর্ব্বাশায় আলো করি উষা সুহাসিনী
দিল দেখা—সেই সাথে কৃষ্ণার নয়নে
বহিল আনন্দ-ধারা ; রোমাঞ্চ বয়ানে
শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণা আরতির গান—
ব্রহ্মানন্দে ধীরে ধীরে ত্যজিল পরাণ !

শ্রীমোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

---


কলিকাতা, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্‌ প্রেসে মুদ্রিত।

৩য় বর্ষ	ভাদ্র ও আশ্বিন—১৩১৪।	৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সচিত্র

মাসিক পত্র।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি. এল.

সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা।]	[প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

প্রথম ভাগ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা। তৃতীয় পর্য্যায়। ১৩১৪, ভাদ্র ও আশ্বিন।

শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় বি, এল.,—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সহকারী সম্পাদক।

## সূচী।



# নিয়মাবলী।

ঐতিহাসিক চিত্রের জন্য প্রবন্ধাদি, বিনিময়ার্থে পত্রিকা প্রভৃতি ও সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে বহরমপুর খাগড়া পোঃ মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় এবং টাকা কড়ি, চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপনের হারও কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও গ্রাহক করা যায় না। গ্রাহকগণ মূল্যাদি পাঠাইবার সময় বা অপর কোন বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিবার সময় নম্বর দিয়া লিখিবেন। মোড়কের উপর যে নম্বর থাকে তাহাই গ্রাহক নম্বর।

নূতন গ্রাহক হইলে "নূতন" কথাটি এবং নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

প্রতি মাসের পত্রিকা তৎপর মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা না পাইলে ১৫ই তারিখের মধ্যে না জানাইলে আমরা পুনরায় দিতে বাধ্য নহি। নমুনার জন্য ৵০ তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট—কলিকাতা
মেট্‌কাফ্ প্রেস।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

# গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট নিবেদন।

আমাদের সহৃদয় গ্রাহকবর্গের নিকট বিনীত নিবেদন, পূজা উপলক্ষে আফিস বন্ধ থাকিবে বলিয়া আমরা ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের উভয় সংখ্যা একত্রই প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। বড়ই দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি ঐতিহাসিক চিত্রের নিয়মানুসারে রিপ্লাই কার্ড না পাইলে উত্তর দেওয়া হয় না। সুতরাং অনেকের পত্রেরই উত্তর দেওয়া হয় নাই। আশা করি, তাঁহারা প্রত্যুত্তর না পাওয়ার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন এবং এখন হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

**পুনশ্চ নিবেদন যাঁহাদের নিকট ঐতিহাসিক চিত্রের মূল্য এখনও বাকী আছে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক কার্ত্তিক সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব্বেই মূল্য প্রেরণ করেন। নচেৎ আমরা ভিঃ পিঃ প্রেরণ করিয়া উত্যক্ত করিতে বাধ্য হইব। ইতি—**

# ঐতিহাসিক চিত্র।

## দায়ুদ ও সিরাজ।

বাঙ্গালার স্বাধীন মুসল্‌মান মসনদে দুই সময়ে যে দুইজন শেষ নরপতি উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, ইতিহাস তাঁহাদিগকে প্রায়ই একই রূপে চিত্রিত করিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই দুই জন নরপতির পরিণাম বিধাতা সমভাবেই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। গৌড়ের স্বাধীন পাঠান-সিংহাসন তাহার যে শেষ নরপতিকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাঁহার সহিত মুর্শিদাবাদের শেষ স্বাধীন মুসল্‌মান ভূপতির অনেক পরিমাণে ঐক্য দেখা যায়। যাঁহারা দায়ুদ খাঁ ও সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয় জীবনচরিত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, উভয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত দেখিয়া এই সংসার-নাট্যশালায় অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, পরক্ষণেই প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া সেই আলোকমালাকে নির্ব্বাপিত করিয়া ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের জীবন দীপটিকে চিরদিনের জন্য নিভাইয়া দিবে।

বিধাতার আশীর্ব্বাদে দায়ুদ ও সিরাজ উভয়েই সৌন্দর্য্যময়ী দেহযষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, এবং উভয়েরই বাল্য জীবন আলোকময় ও আনন্দময়। তেজস্বী পাঠান নরপতি সুলেমানের দিগ্বিজয়ে তাঁহার পরিবারবর্গ যে বিপুল আনন্দ লাভ করিবে ও আপনাদের ভবিষ্যৎ আলোকময় দেখিবে, তাহাতে কে সংশয়

করিতে পারে? আবার মহারাষ্ট্রীয়বিজয়ী আফগান গর্ব্বখর্ব্বকারী আলিবর্দ্দীর প্রিয়তম দৌহিত্র মুর্শিদাবাদের মসনদকে যে ময়ূরাসন অপেক্ষাও উজ্জ্বল ও মসৃণ মনে করিবেন ইহাতেই বা সন্দেহ কি? সুলেমান নানাদেশ জয় করিয়া ধনরত্নের দ্বারা গৌড়ের রাজকোষ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন; মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত অবিরত যুদ্ধে অর্থ ব্যয় করিয়াও আলিবর্দ্দীর ভাণ্ডার কুবেরের ভাণ্ডারের ন্যায়ই অবস্থিত ছিল। যাহাদের জন্য বিধাতা এরূপ রত্নস্তূপ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের জীবনে আশার বহুরূপিণী লীলা দেখিবে বলিয়া যদি মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে একেবারে দোষ দেওয়া যায় না। দায়ুদ ও সিরাজ আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া সেইরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহাদের কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই। অধিকন্তু তাঁহাদের শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

বিজয়-লক্ষীর বরপুত্র সুলেমানের আদরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বাল্যজীবন যেরূপ ভাবে যাপন করিয়াছিলেন, মহাপরাক্রমশালী আলিবর্দ্দীর সোহাগে তাঁহার প্রিয় দৌহিত্রের বাল্যজীবনও সেইরূপে কাটিয়াছিল। উভয়েই অপরিমিত আদর পাইয়া বাল্যলীলাতেই শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নীতি শিক্ষা তাঁহাদের চরিত্রকে সুগঠিত করিতে পারে নাই। যদিও সুলেমান বিশেষতঃ আলিবর্দ্দী নীতিশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, ও আপনাদের প্রিয়পাত্র দুইটীকে সুশিক্ষিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের স্নেহপ্রাবল্যে দায়ুদ ও সিরাজ তাদৃশ শিক্ষালাভে সমর্থ হন নাই। তাহা হইলেও সুলেমান ও আলিবর্দ্দীর তেজস্বিতার ছায়া যে উভয়ের হৃদয়ফলকে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, দায়ুদ ও সিরাজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শেষে আপনাদের জীবন পর্য্যন্ত বলি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বাল্যে সুশিক্ষা লাভ না করিলে যৌবনে যেরূপ চাঞ্চল্য ও ঔদ্ধত্য জন্মে, উভয়ের জীবনে তাহাই ঘটিয়াছিল। যৌবনসুলভ চাপল্যে উভয়ে নিন্দনীয় ব্যাপার সমূহের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দায়ুদ যে লোদীখাঁর অনুগ্রহে গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহার প্রাণদণ্ডের

বিধান করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সিরাজও জগৎশেঠ, মীরজাফর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত অমাত্যবর্গের অবমাননা করিয়া আপনার ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিয়া তুলেন। তবে এস্থলে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে। দায়ুদ লোদীখাঁর পরাক্রম অসহনীয় মনে করিয়া কাহারও কাহারও পরামর্শে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন, কিন্তু সিরাজ বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারীদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অপমানিত করিতে প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ উভয়ে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া সম্ভ্রান্ত আমীরগণকে পীড়িত ও লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে তাঁহাদের বিচারশক্তি যে যৌবনের চাঞ্চল্যে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিচারশক্তির অভাবের জন্যই তাঁহাদিগকেও ভবিষ্যতে পদে পদে নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল।

সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয়ে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দীর সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করেন। কিন্তু এস্থলেও কিছু পার্থক্য আছে। দায়ুদ যে প্রতিদ্বন্দীর সহিত অস্ত্রবিনিময় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পরাক্রম বাস্তবিকই সমগ্র ভারতে ন্যায় বিস্তৃত হইতেছিল। সেই মোগলকেশরী 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' আকবর সাহের বিপুল বিক্রমে তখন আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য বিকম্পিত হইতেছিল। কিন্তু সিরাজ যাহাদের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের শক্তি বিদ্যুদগ্নির ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বিকসিত হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার গর্ভে যে বজ্র লুক্কায়িত ছিল, তাহা তখনও পর্য্যন্ত লোকের প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। সিরাজের সহিত সংঘর্ষে সেই বজ্র মহাশব্দে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে চূর্ণ করিয়া অবশেষে ভারতে হিন্দু ও মুসল্মান উভয় শক্তিকে বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। কিন্তু ইহাও যে প্রবল প্রতিদ্বন্দী তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

দায়ুদ স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিবার জন্য নিজেই কুঠারহস্তে মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, সিরাজও আপনার প্রভুত্ব দেখাইবার জন্য ক্রূর বিষধরের বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ফণায় আঘাত করিয়াছিলেন। দায়ুদ বাদসাহের জামনিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া আপনার রণকণ্ডূয়ণ নিবৃত্তি করার

জন্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, সিরাজও প্রথমে কাশীমবাজার, পরে কলিকাতা অধিকার করিয়া উদ্ধত ইংরেজ বণিকের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দায়ুদ আপনার অসংখ্য হয় হস্তী ও পরিপূর্ণ রাজকোষ দেখিয়া আপনাকে আকবর বাদসাহের সমকক্ষ মনে করিয়াছিলেন। সিরাজ মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিককে সামান্ত তৃণগুচ্ছ মনে করিয়া তাহাদিগকে ভাগীরথীজলে ভাসাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক উভয়েই প্রথমে আপন আপন প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু দায়ুদ ও সিরাজ উভয়ের অবস্থার পার্থক্য থাকায় এই প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল উভয়ের পক্ষে বিভিন্ন ভাবে ঘটিয়াছিল। অমিতপরাক্রম আকবর বাদসাহের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া দায়ুদ প্রথম হইতেই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মোগল সৈন্তের সহিত সংগ্রামে প্রথম হইতেই পশ্চাৎপদ হইতেছিলেন। কিন্তু সিরাজ কাশীমবাজারের ইংরেজদিগকে বন্দী করিয়া কলিকাতার ইংরেজদিগেরও অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। দায়ুদ প্রথম উত্তমে যেরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, সিরাজের পক্ষে বরঞ্চ তাহার বিপরীতই ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিম যে কয়েক জন ইংরেজ বণিকের ধৃষ্টতার উত্তম রূপ শিক্ষা দিবেন, ইহা তাদৃশ অসম্ভব নয়। কিন্তু "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবার বিরাট বাহিনীর" সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া যে অসম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই জন্ত দায়ুদও অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন নাই। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা উদ্ধত ইংরেজের উপযুক্ত শাস্তিই দিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উভয়ের অবস্থার পার্থক্য থাকায় ফলও বিভিন্নরূপ ঘটে। দায়ুদ ক্রমে পাটনা, তেলিয়াগুড়ি, টাঁড়া ছাড়িয়া উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করিলেন। পরে খারপুরে মোগল বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া যে রণক্রীড়া দেখাইলেন, তাহাতে মোগলসেনাপতিগণ চমকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী বিমুখ হওয়ায় দায়ুদকে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হয়। আর সিরাজউদ্দৌলা, মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিককে সামান্ত

তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাগীরথী জলে ভাসাইয়া আনন্দে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মুর্শিদাবাদে আসিলেন। কিন্তু সেই তৃণগুচ্ছ ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রে পড়িল, পরে মান্দ্রাজে পৌঁছিল। তথায় সেই গুচ্ছের সহিত আরও তৃণ যুক্ত হইয়া এক সুদৃঢ় রজ্জু প্রস্তুত হইল, ও মুর্শিদাবাদের মত্ত মাতঙ্গকে বদ্ধ করার জন্য তাহা কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং মাতঙ্গও সেই রজ্জু দেখিয়া আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

ধারপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দায়ুদ খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন; মোগল সুবেদার খানখানান মুনিম খাঁ তাহাতে সম্মত হইয়া দায়ুদকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রদান করিলেন। দায়ুদ তাহাই লইয়া বাদসাহকে বাঙ্গালা ও বিহার ছাড়িয়া দিলেন, ও তাঁহার অনুগত সামন্তের ন্যায় অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন। আর কলিকাতার দ্বিতীয় যুদ্ধে ভীত হইয়া সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজ বণিকের নিকট দন্তে তৃণ লইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ইংরেজদিগের সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিতে চাহিলেন, এবং তাহাদিগকে অবাধে বাণিজ্য করিতে দিতে স্বীকৃত হইলেন। দায়ুদের তেজস্বিতায় মোগলেরা তাহাকে পুরস্কার দিল, আর সিরাজউদ্দৌলার ভীরুতায় ইংরেজেরা তাঁহার নিকট হইতে আপনাদের সমস্ত সুযোগের উপায় করিয়া লইল।

ইহার পর আবার সন্ধিভঙ্গের পালা আরম্ভ হইল। গৌড়ের লোকধ্বংসকর মহামারীতে মোগল সুবেদার মুনিম খাঁ জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। গৌড়ে আর মোগলপ্রভুত্ব রহিল না। দায়ুদ খাঁ সেই সুযোগে সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পুনর্ব্বার বাঙ্গালাবিহার অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু সিরাজ-ইংরেজের সন্ধিভঙ্গের রহস্য অন্যরূপ। কলিকাতা যুদ্ধের পর ইংরেজ সেনাপতি সিরাজ উদ্দৌলার ভীরুতার পরিচয় পাইয়া আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া ইংরেজেরা নবাবের রাজ্যে নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করায়, আবার উভয় পক্ষের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। দায়ুদ খাঁ ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া যে সন্ধি করিয়াছিলেন, কেবল স্বাধীনতার আশায় তাহা ভঙ্গ করেন; কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা ঈশ্বরের নামে

যে শপথ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা ভঙ্গ করেন নাই। তাঁহার প্রতিপক্ষ ইংরেজ বণিকই তাহা ভঙ্গ করিয়া বাঙ্গালায় অশান্তি আনয়ন করিয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলা কখন ঈশ্বর, মহম্মদ বা কোরাণকে অমান্য করেন নাই।

এইবার রাজমহাল ও পলাশী। দায়ুদের বাঙ্গালাবিহার অধিকারের কথা শুনিয়া আকবর বাদসাহ খাঁ জাহানকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। দায়ুদ অবশেষে রাজমহালে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। গঙ্গা ও পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা রাজমহাল দুর্ভেদ্য। দায়ুদ পরিখা খনন করিয়া আপনাকে অজেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। মোগলেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রথমে দায়ুদের শিবির আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। পরে তাহাদের নূতন সৈন্য আসিয়া যোগ দেওয়ায় তাহারা দায়ুদকে আক্রমণ করিয়াছিল। দায়ুদের পিতৃব্যপুত্র জুনৈদ অসীম বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়া মোগলদিগকে বিত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলপক্ষ হইতে এক রক্তবর্ণ গোলা আসিয়া তাঁহার এক পদ ভঙ্গ করিয়া দেয়। দায়ুদের অন্যান্য অমাত্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অগত্যা দায়ুদ একাকী যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মোগলহস্তে বন্দী হন। তাহার পর তাঁহার যে শোকাবহ পরিণাম ঘটিয়াছিল আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

পলাশীর যুদ্ধব্যাপারও কতকাংশে ইহারই অনুরূপ। তবে রাজমহালে প্রকৃত যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না। সে যাহা হউক, তাহাতেও যে যুদ্ধাভাস হইয়াছিল, তাহার সহিত রাজমহাল যুদ্ধের অনেক পরিমাণে ঐক্য আছে। এখানেও ভাগীরথী বিদ্যমান, তবে পর্ব্বতশ্রেণী নাই। তাহার পরিবর্ত্তে বিশাল প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। তাহাতে পরিখা খনন করিয়া নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার শিবিরকে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। নবাবশিবির ও নবাব-সৈন্যের অবস্থান দেখিয়া আম্রকুঞ্জ হইতে বহির্গত শ্বেতাঙ্গের দল বিচলিত হইয়া পুনর্ব্বার গহ্বরে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য প্রবৃত্ত হয়। এমন সময়ে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরমদন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হন।

জুনৈদের ন্যায় ইংরেজের এক রক্তবর্ণ গোলা ক য়া তাঁহার পদ ভঙ্গ করিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া যায়। যদিও মোহন-লালের অসীম বীরত্বে ইংরেজ সৈন্য বিচলিত হইয়াছিল, তথাপি সিরাজের অন্যান্য সেনাপতিবর্গের পরামর্শে যুদ্ধনিবৃত্ত হওয়ায়, ইংরেজেরা জয়লাভ করে; ও নবাব পলাশীপ্রান্তর হইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে মুর্শিদাবাদে পরে তথা হইতে রাজমহালের দিকে গমন করেন। তাহার পর তাঁহার যে পরিণাম ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

আমরা দেখাইলাম যে, রাজমহাল ও পলাশী উভয় যুদ্ধই একরূপেই সংঘটিত হইয়াছিল। রহস্যের বিষয় এই যে, এই দুই যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পূর্ণরূপে ক্রীড়া করিয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, দায়ুদের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ কতলু খাঁ মোগলদিগের নিকট হইতে কতকগুলি পরগণার লোভে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায়, দায়ুদ একাকী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি বীরের ন্যায় যুদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁহার অশ্বের পদ কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া যাওয়ায়, তাঁহাকে মোগলহস্তে বন্দী হইতে হয়। আর পলাশীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা কে না অবগত আছে? বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবীলাভের আশায় মীরজাফর যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। তাই রাজমহাল ও পলাশীর যুদ্ধের সহিত কতলু ও মীরজাফরের নাম চিরবিজড়িত রহিয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতা তাহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া দায়ুদ ও সিরাজের যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া-ছিল, ইতিহাস তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া থাকে।

রাজমহাল ও পলাশী যুদ্ধের পর দায়ুদ ও সিরাজের পরিণাম একই ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। দায়ুদ বন্দী হইয়া খাঁ জাহানের নিকট নীত হইলে, তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যময়ী দেহযষ্টি দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পর-ক্ষণেই তাঁহার শিরশ্ছেদনের আদেশ প্রদান করেন। ঘাতক প্রথম আঘাতে দায়ুদের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। উপর্য্যুপরি

কয়েক আঘাতের পর তাঁহার মুণ্ড ভূতলে পতিত হয়। পরে সেই মুণ্ড বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সিরাজ রাজমহালের নিকট হইতে বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইলে, মীরজাফরের পুত্র মীরণ মহম্মদী বেগকে তাঁহার হত্যার জন্য আদেশ দেয়। খাঁ জাহানের ন্যায় মীরণ বা মহম্মদীবেগের সিরাজের লাবণ্যময়ী দেহকান্তি দেখিয়া করুণার উদয় হয় নাই। মহম্মদীবেগও আঘাতের পর আঘাত করিয়া সিরাজের হত্যা সম্পাদন করিয়াছিল। পরে সেই শতখণ্ডে বিভক্ত দেহ মুর্শিদাবাদের সমস্ত রাজপথে ঘুরাইয়া খোসবাগে সমাহিত করা হয়। সুতরাং উভয়ের পরিণাম যে একই প্রকারে সংঘটিত হইয়াছিল তাহাও সুস্পষ্ট রূপেই প্রতীত হইতেছে।

উপসংহারকালে আমরা আর একটি কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইতেছি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দায়ুদ ও সিরাজ উভয়ে বিপুল ধনরত্নের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তাহা ভোগ করিতে পারেন নাই। দায়ুদের ধনরত্ন সমস্ত বিক্রমাদিত্যের হস্তে পতিত হওয়ায় যশোর রাজবংশ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। আর সিরাজের ধনরত্ন মণিবেগম এবং রাজা নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদের হস্তে পতিত হওয়ায় শোভাবাজার রাজবংশপ্রভৃতি ধনকুবের বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এবিষয়েও বেশ ঐক্য দেখা যায়।

দায়ুদ ও সিরাজের জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে সকলেরই প্রতীতি হইবে যে, উভয়ে যেন একই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। দুই জনে দুই স্বাধীন সিংহাসনের শেষ নরপতি, এবং দুই জনেরই পরিণাম শেষে একই রূপে সংঘটিত হইয়াছিল। অবশ্য উভয়ের মধ্যে চরিত্রের অনেক পার্থক্য আছে, আমাদের তাহা প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নহে। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, বিধাতার বিচিত্র লীলায় উভয়ে কেমন একই অবস্থায় পড়িয়া, একই ভাবে গঠিত হইয়া জীবনে প্রায় একই রূপ লীলা করিয়া গিয়াছেন ; এবং ইতিহাসে উভয়ের পরিণাম একইরূপে চিত্রিত হইয়া উভয়কে পরস্পরের তুলনীয় করিয়া রাখিয়াছে।

---

# গৌড়ের প্রাচীন ধ্বংশাবশেষ

বখ্‌তিয়ার খিলিজির বঙ্গদেশে আগমনের সময় হইতে,—বঙ্গদেশ মোসলমানগণের হস্তে পতিত হইবার পর হইতেই গৌড়ের প্রকৃত প্রামাণিক ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বের—হিন্দুরাজত্ব সময়ের গৌড়-ইতিহাস একবারে অপরিস্ফুট না হইলেও সন্দেহ সংশয় হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত নহে। মোসলমানগণ গৌড় নগর অধিকার করিয়াই উহার হিন্দু-কীর্ত্তি সমূহ বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। হিন্দু-দেবালয়, হিন্দু মঠ প্রভৃতির প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড স্থানান্তরিত করিয়া মোসলমানগণ তদ্দ্বারা নিজেদের বিজয় কীর্ত্তির নিদর্শন ধরণীর মূকবক্ষের উপর প্রোথিত করিতে ব্যস্ত হন। তাঁহাদের সেই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি—সেই সমাধি, সেই মস্‌জিদ প্রভৃতির ইষ্টকের বিপরীত দিক্ অবলোকন করিলেই কোন না কোন হিন্দুদেব-দেবীর বিকৃত প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মোসলমানগণ এবম্প্রকারে গৌড়ের

সমস্ত হিন্দু-নিদর্শন ভগ্ন করিয়া উহাকে একবারে মোসলমান-রাজ্যে পরিণত করেন। সেই সময়ের যে সকল মস্‌জিদ, সমাধি-মন্দির প্রভৃতি এখনও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে, তাহার অধিকাংশেই হিন্দু-মন্দিরের আকৃতি ও নির্ম্মাণ-প্রণালী এবং হিন্দু উৎপত্তির বিষয়ে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মোসলমানগণ এত যত্ন, এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয় করিয়া যাহাকে নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত করিলেন। তাহাকে কি চিরকাল নিজের জিনিষ বলিয়া অধিকার করিতে পারিলেন? কালের কি বিচিত্র গতি! আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে গৌড়ের সেই সকল প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষের পরিচয় যাহা এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা র‍্যাভেনসোর গ্রন্থাবলম্বনে ঐতিহাসিক চিত্রে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিলাম।

গৌড়ের সমস্ত ধ্বংসাবশেষ দেখিতে হইলে মালদহ ইংরেজ-বাজার হইতে যাত্রারম্ভ করিতে হয়। মালদহ ত্যাগ করিলেই চতুর্দ্দিকেই প্রাচীন নিদর্শন সমূহ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। আংরেজাবাদে এমন একখানি বাড়ী নাই, যাহার ইষ্টকখণ্ডে কি কার্ণিশে প্রাচীন গৌড়ের পরিচয়ের অভাব আছে।

রাজমহালের রাস্তা ধরিয়া এক মাইল অতিক্রম করিলেই একটী উচ্চ রাস্তা পাওয়া যায়; উহার চতুঃপার্শ্বে আম্রবৃক্ষে সমাকীর্ণ থাকায়, স্থানটীকে অতি মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। উহা গিয়াসউদ্দীন-নির্ম্মিত একটী বাঁধা রাজবর্ত্ম; দক্ষিণ দিকে এইরূপ আরও উচ্চ বাঁধ বিদ্যমান আছে, কিন্তু এক্ষণে বন্যবৃক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন। এই সকল বাঁধ দ্বারা নাকি বল্লাল সেনের প্রাসাদ পরিবেষ্টিত ছিল। বাম ভাগে আর একটী উচ্চ বাঁধা রাস্তা এক সোঁতা ভূমি অতিক্রম করতঃ গৌড়ের উত্তরদিকাভিমুখে ভাগীরথী তীরবর্ত্তী-'দরবাসিনী দরওয়াজা' (Durbasini gate) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সকল উচ্চ রাস্তার মিলন স্থল হইতে পূর্ব্বদিকে দুই মাইল অগ্রসর হইয়া, এক বক্রপথে আরও চারি মাইল অতিক্রম করিলে একটী প্রকাণ্ড জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই জলাশয়টী পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্য কর্ত্তৃক খনিত সমস্ত জলাশয় অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার নাম—

## সাগর দীঘি।

সাগর দীঘি একটী জলাশয়, দীর্ঘে এক মাইল এবং প্রস্থে অৰ্দ্ধমাইল; ইহার জলস্থানের পরিমাণ—দীর্ঘে ১৬০০ গজ ও প্রস্থে ৮০০ গজ। ইহা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ,—তাহাতেই ইহা হিন্দু-কীৰ্ত্তি রূপে প্রমাণিত হইতেছে। গৌড় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের বৃহৎ জলাশয় গুলি যে হিন্দু কর্ত্তৃক খনিত, এবম্প্রকারে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাগর দীঘির ছয়টী অবতরণ সোপান (ঘাট) আছে, তাহার প্রত্যেকটী ৬০ গজ প্রশস্ত। চারিটী সোপান পূর্ব্ব পশ্চিম তীরে মুখোমুখী ভাবে অবস্থিত, অপর দুইটী উত্তর দক্ষিণ তীরে। এই ঘাট গুলি কিন্তু এখন আর বিদ্যমান নাই, ভূগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কেবল স্তূপীকৃত ইষ্টক ও প্রস্তর রাশি একত্র পড়িয়া থাকায় এবং তীর ভূমি হইতে জলের ধার পর্য্যন্ত ক্রমশ নীচু হইয়া আসায়, ইহার পূর্ব্ব পরিচয় পরিব্যক্ত হইতেছে।

এই বৃহৎ জলাশয়টী রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কালে ৫২০ হিজরীতে (১১২৬ খৃষ্টাব্দ) খনিত হইতে আরম্ভ হয় বলিয়া জানা যায়।

সাগর দীঘির পশ্চিম তীরের দৃশ্য অতি মনোজ্ঞ। জলাশয়ের খনিত মৃত্তিকা-রাশি তীরের উপর নিক্ষিপ্ত হয়; তীরের সেই সু উচ্চ স্থান হইতে জলাশয়ের নিম্ন-ধার পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান এখন লতা গুল্ম ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

## মুকৃদুম আখি শিরাজুদ্দীনের সমাধি।

সাগর দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে মুকৃদুম সাহ নামক এক মোসলমান সাধু ফকিরের সমাধি বিদ্যমান আছে; উহার নিকটস্থ হইতে হইলে, বাঁশ-বনের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে হয়। এই সমাধি মন্দিরের দুইটী ক্ষুদ্র অথচ সুদৃশ্য খিলান,—দূর হইতেও দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের উত্তর দ্বারে একটী লিপি খোদিত আছে, তাহার অর্থ—

"সুপ্রসিদ্ধ সাধু মুকৃদুম সেখ আখি শিরাজ-উদ্দীনের সমাধির দ্বার, সৈয়দ

আসরফ্ উলহোসেনীর পুত্র মহাপ্রতাপশালী ও সদাশয় নরপতি আলাউদ্দীন-উদ্দীন ( Alauddinyawddin ) আবুল মোজাফর হোসেন শাহ্ কর্ত্তৃক ৯১৬ হিজরীতে ( ১৫১০ অব্দে ) নির্ম্মিত হয়। ভগবান তাঁহার রাজ্য ও শাসন-চিরস্থায়ী করুন।" (১)

## জান্ জান্ মিয়ান্ মস্‌জিদ্।

পূর্ব্বোক্ত সমাধির নিকটে জাড়াউ ইষ্টকে ( Embossed brick ) নির্ম্মিত একটী সুন্দর মস্‌জিদ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা জান্ জান্ মিয়ান্ নাম্নী এক রমণীর নামানুসারে জান্ জান্ মিয়ান্ মস্‌জিদ নামে পরিচিত; মস্‌জিদের অভ্যন্তর ভাগে সুন্দর সুন্দর স্তম্ভ শ্রেণী বিদ্যমান আছে। ইহার ছাদটীর অবস্থা মন্দ নহে এবং ছাদের চারিদিক বৃক্ষাদিতে ছাইয়া ফেলিলেও গম্বুজ গুলি এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্য-দ্বারে যে লিপিটী আছে, তাহার ভাবার্থ যথা,—

"মহাপুরুষ বলিয়াছেন,—'যে ভগবানের একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে, সে স্বর্গে তদনুরূপ গৃহ প্রাপ্ত হয়।' এই জামি মস্‌জিদ সম্রাট হোসেন শাহের পুত্র সম্রাট গিয়াসুদ্দীন আবুল মোজাফার মহম্মদ শাহের রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহার রাজত্ব জয়যুক্ত করুন। ইহার নির্ম্মাতা একজন রমণী;—ভগবান তাহাকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তাহার অবস্থা চিরস্থায়ী-ভাবে সমান রাখুন। হিজরী ৯৪১ সাল ( ১৬৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দ )।

(১) মেজর ফ্রাঙ্কলীন বলেন যে, দরগার দ্বারে 'তোগ্‌রা' অক্ষরে দুইটী লিপি আছে, তাহার একটীর ইংরেজি অর্থ—

"Assistance is from God and victory at hand, and God is the guardian and protector of the faithful, and he is the most merciful, the most compassionate."

অপরটীর অর্থ,—"This gateway was erected by the most illustrious sovereign Sultan the Husaini Ala Uddinnya-o-uddin bin Ashraf-ul-Husaini, whose dominion may God purpetuate, A. H. 910."

## সাদুল্যাপুরের ঘাট।

মসজিদ হইতে কিঞ্চিৎ অধিক এক মাইল দূরে—একটী ক্ষুদ্র সরুপথ দিয়া ভাগীরথীর সাদুল্যাপুর ঘাটে উপনীত হওয়া যায়; ইহা হিন্দুদিগের একটী পবিত্র ঘাট বলিয়া বিবেচিত। গৌড়ের মুসলমান শাসন সময়ে কেবল এই স্থানটীতেই হিন্দুদের পবিত্র ক্রিয়া কর্ম্ম ও উৎসবাদি নির্ব্বাহিত এবং মৃত সৎকার হইত। গঙ্গার তীরে এ ঘাটটী এখনও বিগুমান আছে এবং প্রতি বৎসর বহুতর দূ-যাত্রী স্থানীয় দেবতার পূজা দিতে তথায় যাইয়া থাকে। তীরের উপরেই অতি প্রাচীন বৃক্ষাদি সমন্বিত একটী কুঞ্জ,—তাহা তীর্থযাত্রীদিগকে আতপ তাপ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইতেছে। এই স্থান হইতে নগরের বহিঃপ্রাচীর আরম্ভ হইয়া নদীতীর হইতে পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

এই বহিঃপ্রাচীরের অনুসরণ করিয়া সদর রাস্তায় উপনীত হইতে পারা যায় এবং তথা হইতে দক্ষিণ দিকে দুই মাইল অগ্রসর হইলে প্রাচীরের দ্বিতীয় রেখা ( line ) প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারাই নগরটী পরিবেষ্টিত। এই উত্তরাংশ কতকটা নিম্নভূমি এবং নগরের অপরাংশের ন্যায় লোকের ঘনসন্নিবেশ নাই। উত্তরের যেস্থান হইতে নগরে প্রবেশ করিতে হয়, সেই স্থানেই 'উত্তর দরজা' বিগুমান ছিল, কিন্তু এখন তাহার আর চিহ্ন মাত্র নাই। এই দ্বার-মধ্যস্থিত পথে প্রাচীরের অভ্যন্তর ভাগে প্রবিষ্ট হইয়াই নানা আকারের পুষ্করিণী ও জলাশয়াদির স্মৃতি চিহ্ন নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হয়। ঐ সকল জলাশয় এখন তৃণ গুল্মাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুন্দর hornblende স্তম্ভ, যাহা একদা গৃহের সদর দ্বার রূপে শোভিত হইত, কালের কঠোর অঙ্কুশাঘাতে তাহা এখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত;—কেবল পূর্ব্ব সমৃদ্ধি জ্ঞাপনের নিমিত্ত বামদিকে শেষ অস্তিত্বটুকু রক্ষা করিয়া আছে। উহা বিপুল আয়তন ও গুরুত্বের জন্যই স্থানান্তরিত হইতে পারে নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, এতৎ সমুদয় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর ('দেওয়ানজীর) গৃহের ভগ্নাবশেষ। এই স্থান হইতে কিয়দ্দূরে—

## পিয়াসবারি-পুষ্করিণী।

'পিয়াস বারি' ( পানীয় জল ) পুষ্করিণী অবস্থিত। ইহার জল নাকি এরূপ বিষাক্ত যে, দুই একদিন পান করিলেই জীবনান্ত হইতে হয়। আবুল ফজল বলেন,—'যে সকল অপরাধী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত, তাহাদিগকে এই পুষ্করিণীর জল ভিন্ন অন্য কোন রূপ পানীয় প্রদত্ত হইত না।' সম্রাট আকবর এই প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। (১)

ইহার কিছু ব্যবধানে আর একটী পুষ্করিণী,—যাহার তীরভূমি সুন্দর বনানী সমাকীর্ণ এবং প্রচুর ভগ্নাবশেষের আশ্রয়স্থল। ইহা সেই কথিত শান্ত পোষা কুম্ভীরগুলিকে আশ্রয় দিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত স্থানীয় সুখ্যাতি অর্জ্জন করে; এই সকল কুম্ভীর নাকি মৌলাইর (Maulaior) আহ্বানে আহারার্থে আগমন করিত।

## রাম কেলী।

পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে সদর রাস্তা ত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে রামকেলী (Ramke'l) নামক পল্লী প্রাপ্ত হওয়া যায়; তথায় প্রতি বৎসর ১২ই জুন হইতে একটী প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। এই স্থানে বরিন্দি (মালদহের পূর্ব্ব বরিন্দ নামক গ্রামের অধিবাসী) দিগের প্রভূত সমাগম হইয়া থাকে। এই বরিন্দিগণ এক স্বতন্ত্র জাতি,—হিন্দুও নহে, মুসলমানও নহে। তাহারা শান্ত এবং নির্ব্বিবাদী লোক, কদাচিৎ তাহাদের বন্য আবাস ত্যাগ করিয়া জেলার অন্যান্য অধিবাসীদিগের সহিত মেলা মেশা করিয়া থাকে। ইহারা দেখিতে কতকটা আসামীদিগের ন্যায়।

(১) See Gladuin's translation of Ain-Akbari vol. ii p. 8, whence Montgomery Martin has probably borrowed the same tradition, It is quite possible that the noxious property of this water was a fable even in Abul Fazal's time, but had it been suppressed as such in the Ain, the courtly historian would have lost the opportunity of ascribing to Akbar the discontinuance of an inhuman practice. At all events the water is described in Major Francklin's report as 'excellent.'—A Grote.

## সোণা মসজিদ।

রামকেলী গ্রামের অব্যবহিত দক্ষিণে এক উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপরে 'বারদ্বিয়ারী' (Baradiwari) বা বৃহৎ স্বর্ণ-মসজিদ অবস্থিত;—ইহাই সম্ভবতঃ গৌড়ের সুন্দরতম স্মৃতি-নিদর্শন। মূল মসজিদের সমগ্র সম্মুখভাগ একটী খিলান-বারান্দা;—তাহাই এখন দণ্ডায়মান আছে। মসজিদের সম্মুখ দিকে কৃষ্ণবর্ণের hornblendeএর বৃহৎ ব্লকখণ্ড দীর্ঘে ১৮০ ফিট ও প্রস্থে ৮০ ফিট। বারান্দার উভয় পার্শ্বে সারি সারি এগারটী খিলান, তাহা হইতেই সম্ভবতঃ মসজিদের নাম বারদ্বিয়ারী' (বা দ্বাদশ দ্বার বিশিষ্ট) হইয়াছে। খিলানগুলি এগারটী গম্বুজ (ডোম) দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহা একরূপ অক্ষত অবস্থাতেই আছে। মসজিদের অন্যান্য অংশের মধ্যে এক্ষণে কেবল বাহিরের দেওয়ালটী বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্ব দিকে তিনটী দ্বার বিশিষ্ট একখানি প্রাঙ্গন,—ভগ্নদশায় পতিত; পূর্ব্ব দ্বারের সম্মুখে একটী সুন্দর পুষ্করিণী। মসজিদের প্রত্যেক রন্ধ্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিপ্পলী বৃক্ষ শিরোত্তোলন করতঃ দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং অপর কতিপয় তেঁতুল বৃক্ষ উহাকে এমনি ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছে যে, কিছুতেই আর উহার বাহিরের দৃশ্য ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করা বা চিত্রে প্রতিফলিত করা যাইতে পারে না। মসজিদের গাত্রে কোনরূপ লিপি খোদিত নাই; ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য হোসেন শাহের রাজত্ব সময়ে আরম্ভ হইয়া তৎপুত্র নছরত শাহের সময়ে সমাপ্ত হয়। (১)

(১) মেজর ফ্রাঙ্কলীন এই মসজিদের গাত্রে লিপি-ফলক দেখিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা র‍্যাভেন্সর পরিদর্শনের পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ফ্রাঙ্কলীন মসজিদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"It is a building of a very extraordinary construction. You enter by an arched gateway of stone twenty six feet in height and six in breadth. After passing through some very thick jungle, you approach the building.

'The Mosque in form resembles an oblong square, and originally consisted of four separate colounades, arched and roofed over, and covered by handsome domes, in all forty four in number. The front of this Mosque is one hundred and eighty feet in length and forty feet in height;

## দাখিল-দরওয়াজা।

সোণা মসজিদের বারান্দায় মধ্যদিয়া পশ্চিমে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই 'দাখিল' বা 'সালামী-দরওয়াজা' পাওয়া যায়,—তাহাই দুর্গ-প্রবেশের উত্তর দ্বার। উহার চতুর্দ্দিকস্থ গড়খাই গ্রীষ্মকালে হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। যে ক্ষুদ্র লোহিত ইষ্টক দ্বারা গৌড়ের অধিকাংশ সৌধ নির্ম্মিত হয়, তদ্দারাই উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার চারি কোণে চারিটি গম্বুজ ছিল, তাহা এখন নিতান্ত শোচনীয় ভগ্নদশায় উপনীত হইলেও তাহা হইতে কড়াও ( embossed ) ইষ্টকের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। খিলানটী সুউচ্চ, তাহাতে ১১২ ফিট দীর্ঘ

eleven arched doorways of solid stone, ten feet high by six broad, afford a noble entrance; six minares't or columns of brown stone faced with black marble, adorn the building; bands of blue marble about twelve inches in breadth embrace the column from the base of the capital, and are adorned with a profusion of flower-work covered in the marble. The four aisles or cloisters which compose this magnificent building are of unequal dimensions,—that on entering is the largest. The arched doorways, both within and on the outside, are faced with marble, but above them the domes are built of brick.

"The plinthes of the outer doorways are each ornamented with three roses carved in stone.

"The arches are pointed and may be defined to be of the Saracenic style of architecture—they resemble those of many of the mosques at old Delhi, erected by Patan sovereigns of the Ghor and Lodi dynasties.

"The whole appearance of this building is strikingly grand, exhibiting the taste and munificence of the Prince who erected it. To me it appeared extraordinary that more notice had not been taken of it by travellers who have visited the spot.

র‍্যাভেনস সাহেবের গ্রন্থের সম্পাদক ষ্ট্রোট্ মহোদয় বলেন,—"This inscription will be seen to bear date in the year previous to that of the Nucrat Shah inscription, No. 17, published by Mr. Blochman. 7. B. J. S. vol. xliii, pt. i. p. 307. The latter seems to have been found in private hands at Serampur, and also records the foundation of a Jami Mosque.

একটী দ্বার বসান আছে। এই প্রকাণ্ড দ্বারের উভয় পার্শ্বে ছোট ছোট চারিটী দ্বার আছে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বের প্রহরিগণের ব্যবহৃত কক্ষে প্রবেশ করা যায়। ইহাতে কোন লিপি দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে শুনিতে পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বারক শাহ কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

দুর্গ-প্রায় একমাইল দীর্ঘে এবং ৬০০ হইতে আটশত গজ প্রশস্তে। যে প্রাচীরে ইহা পরিবেষ্টিত তাহার বুনিয়াদ ১৮০ ফিট চওড়া। ইহা এখন সম্পূর্ণ পতিত; উচ্চ প্রাচীরের উপর সম্ভবতঃ গৃহাদি ছিল কিন্তু তাহা এখন এমনি নিবিড় বন জঙ্গলে সমাকীর্ণ যে, তাহা ভেদ করিয়া কোনরূপ নিদর্শন বাহির করা যায় না।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

এই মস্‌জিদের নাম সোণা মস্‌জিদ হইলেও ইহাতে একটুও সুবর্ণ চিহ্ন নাই। তজ্জন্য ফ্রাঙ্কলীন মনে করেন যে, যে প্রচুর উপাদানে ইহা নির্ম্মিত এবং তদর্থে যে বিপুল অর্থরাশি ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাই বিবেচনা করিয়া মস্‌জিদের নাম 'সোণা মস্‌জিদ' রাখা হইয়াছে। ইহাতে যে সকল প্রস্তর এবং মার্ব্বেল আছে, তাহা অতি মজবুত এবং বহুকালস্থায়ী পরন্তু তাহা বহু দূরদেশ হইতে আনীত হয়। পূর্ব্বে যে চারিটী স্তম্ভ শ্রেণীর ( Colonnades ) কথা উল্লিখিত হইল, তাহার তিনটীরই এখন ভগ্ন দশা। ফ্রাঙ্কলীন 'তোগরা' অক্ষরে খোদিত যে লিপি দেখিতে পান, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ,—

"মহাপুরুষ ( পরমেশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন ) বলিয়াছেন,—যে ভগবানের নিমিত্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে, সে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। এই জামি মস্‌জিদ ৯৩২হিজরীতে ( ১৫২৬ খৃঃ ) সুলতান হোসেন শাহের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ সুলতান নাছিরুদ্দীন-উদ্দীন আবুল মোজাফার নছরত শাহ সুলতান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। হোসেন শাহ সুলতান, সৈয়দ আমরফ হোসেনীর পুত্র।"

# সিপাহীবিদ্রোহে ভেতো বাঙ্গালী।

স্বনামখ্যাত বাঙ্গালীবিদ্বেষী মেকলে সাহেবের মতে গোটা নিম্ন বাঙ্গালাটা কাপুরুষের দেশ। অবস্থা বিবেচনায় বর্ত্তমানে বাস্তবিক একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। সহানুভূতিবিবর্জ্জিত, বিধর্ম্মী, বিদেশী রাজার নীতি বিগর্হিত শাসনগুণে এখন বাঙ্গালী—শুধু বাঙ্গালী কেন—ভারতবাসীমাত্রেই দুর্ব্বল, হীনবীর্য্য, নির্ব্বিষ ঢোড়ায় পরিণত। ইংরাজের বিচারে এখন গুপ্তি ব্যবহারেও কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হয়—তাহারা বংশ যষ্টিতেও বিদ্রোহের ভীষণ বিভীষিকা দেখিয়া আইনবলে তাহারও খর্ব্বতা সাধন করিতে ব্যতিব্যস্ত। বর্ত্তমান সময়ে নরমের যম ব্রিটিশ-সিংহের সাহসের মাত্রা দিন দিন যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে দা, কুড়ুল, খন্তা, কোদালী ত দূরের কথা দু'চারি বৎসরের মধ্যে ক্ষৌরকারের নরুণ, দরজির ছুঁচ, রাখালের পাচন বাড়ি, ঝাড়ু-দারের ঝাঁটা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া নিরীহ প্রজার নখদন্ত পর্য্যন্তও যে অস্ত্র আইনের আমলে পড়িয়া ক্রমে এদেশবাসী জনগণকে কিম্ভূতকিমাকার অকর্ম্মণ্য জীব করিয়া তুলিবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এখন আমরা ইংরাজের চক্ষে কাপুরুষ বলিয়া প্রতিভাত হইব না ত কি? কিন্তু চিরদিনই কি আমরা এমনি ছিলাম? না, কখনই না। প্রাগৈতিহাসিক দিনের আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই শৌর্য্য, বীর্য্য, যশঃ গৌরবের দিনের কথা না হয় নাই বলিলাম, কিন্তু স্মরণীয় যুগেও কি আমাদের গৌরবের দিন ছিল না? ছিল; নিশ্চয়ই ছিল—দিন ছিল যখন নিম্ন বাঙ্গালার ধীসেন, বিজয়সেন, লক্ষ্মণ-সেন প্রভৃতি বৈদ্যজাতীয় স্বাধীন নৃপতি বৃন্দ শুধু বাঙ্গালী সৈন্যের সাহায্যেই মিথিলা, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে বিজয় বৈজয়ন্তী দোলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন —দিন ছিল, যখন বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ "বারভূঁইয়া"-গণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পর্ত্তুগীজ, আরাকান, মগ প্রভৃতি জলদস্যুগণকেও বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হইতে হইয়াছিল—দিন ছিল যখন এই নিম্ন বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন রাজা প্রতাপাদিত্য,

সীতারাম প্রভৃতি বীরগণের শৌর্য্যে-বীর্য্যে দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল—সে দিন আর নাই!

স্বার্থপর, বাঙ্গালীবিদ্বেষী ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের কৃপায় এবং কতকটা বা মুখসর্ব্বস্ব, আলস্য ও ঔদাস্য পরায়ণ বাঙ্গালী জাতির অনুসন্ধান তৎপরতার অভাবে বাঙ্গালীর সে শূরত্ব, সে বীরত্ব কাহিনীও আজ সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে—আর দু'দশ বৎসর পরে হয়ত সে কাহিনীও শুধু কিম্বদন্তীর অঙ্গীভূত উপকথায় পরিণত হইবে। সুখের বিষয় কতিপয় স্বদেশ হিতৈষী কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের যত্নে ও দৃষ্টান্তে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশের ইতিহাস আলোচনায় সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন—তাই আজ আমরা 'ঐতিহাসিকচিত্রের' পাঠক পাঠিকাগণের সম্মুখে একজন মসীজীবি ভেতো বাঙ্গালীর বীরচিত্র স্থাপন করিতে সাহসী হইলাম।

প্রবন্ধের বিষয়ীভূত বাঙ্গালীবীরের নাম প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রথমভাগে হুগলী জেলার উত্তরপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। প্যারীমোহনের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য স্কুলেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল—তৎপরে তিনি কলিকাতা হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। কি স্কুলে, কি কলেজে সর্ব্বত্রই ভাল ছেলে বলিয়া ইঁহার সুনাম ছিল। কলেজের পাঠ সমাপন করিয়াই প্যারী-মোহন গভর্ণমেন্টের অধীনে মুনসেফী কার্য্য লইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশের (বর্ত্তমানে যুক্ত প্রদেশ) রাজধানী এলাহাবাদে চলিয়া যান।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী গভর্ণরজেনেরাল রূপে সংহার মূর্ত্তিতে ভারতের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইয়া কুটিল রাজনীতির আবরণে, ছলে, বলে, কৌশলে একে একে অযোধ্যা, সেতারা, ঝান্সী, পুনা ও বেরার প্রভৃতি রাজ্য বিপুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত করিয়া লওয়ায় ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজা সাধারণ ভীত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। উৎপীড়িত ও অসন্তুষ্ট রাজন্যবর্গ অনন্যোপায় হইয়া প্রতীকার জন্য সুযোগ ও উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—আবার অন্য দিকে ধর্ম্মান্ধ হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ শূকরচর্ব্বিচর্ব্বিত টোটা

ব্যবহারে স্ব স্ব ধর্ম্ম নাশাশঙ্কায় কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া অসন্তুষ্ট রাজন্যবর্গের সহিত মিলিত হইল—এই মিলনে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে এক ভয়াবহ বিদ্রোহের অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ভারতেতিহাসে তাহাই 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে বীরদর্পী ব্রিটিশ সিংহকে কিরূপ বিপন্ন ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল. ইতিহাস পাঠক মাত্রই তাহা জ্ঞাত আছেন।

এই সময়ে প্যারীমোহন এলাহাবাদের অন্তর্গত মুঞ্জানপুরের মুনসেফ্ ছিলেন। বিদ্রোহের প্রারম্ভ হইতেই কিরূপে এই মসীজীবি ভেতো বাঙ্গালী নিজ শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহস প্রদর্শনে দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহিগণের হস্ত হইতে তৎস্থানীয় ব্রিটিশ বীরগণের জাতি, ধন, মান ও প্রাণ রক্ষা করিয়া বিশ্বনিন্দুক মেকলে সাহেবের কৃতজ্ঞতাপ্লুত জাতভায়াদের দ্বারাই "রণবীর মুনসেফ্" (Fighting Munsiff.) বলিয়া অভিনন্দিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। এলাহাবাদের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি উচ্চ রাজপুরুষগণের লিখিত বাষিক রিপোর্ট এবং ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদ পত্র সমূহ হইতে আমরা তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

এলাহাবাদের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টমসন লিখিত সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—"গত নভেম্বর মাসে প্যারীমোহন এই জেলার মুঞ্জানপুরে মুনসেফ্ নিযুক্ত হয়েন। সেই সময় হইতেই তৎপ্রদেশ সমূহ হইতে বিদ্রোহীদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। দেওয়ানী বিভাগের কর্ম্মচারী হইলেও প্যারিমোহন মিঃ কোর্টের সহিত যোগদিয়া লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক এক সৈন্যদল গঠনকরতঃ বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়েন। তাঁহার গঠিত সৈন্যদল এরূপ সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইহার সাহায্যে অতি অল্পদিন মধ্যেই তিনি বিদ্রোহী অধ্যুষিত দেশসমূহে পুলিশ শাসন ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একবার বিদ্রোহীদিগের সহিত এই সৈন্যদলের এক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহাতে প্যারীমোহনই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন।"

এই সময় গভর্ণমেণ্ট হইতে প্যারীমোহনকে স্থানান্তরে বদলী করিবার প্রস্তাব করায় কমিশনর মিঃ থর্ণহিল ( Thornhill ) তাহাতে আপত্তি করিয়া লিখিয়াছিলেন :—"প্যারীমোহনের শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহস দেখিয়া বিদ্রোহী-দিগের হৃদয়ে এরূপ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার উপস্থিতি সময়ে বিদ্রোহিগণ যমুনার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী দেশসমূহে প্রবেশ করিতেও সাহসী হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলেন এ সময়ে প্যারিমোহনকে এ জেলা হইতে স্থানা-ন্তরিত করিলে তাঁহার পক্ষে এ জেলা শাসনে রাখা অসাধ্য হইবে।"

তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্র "কলিকাতা রিভিউ" বলেন :—"দেওয়ানী আদালতের একজন বাঙ্গালী বিচারপতি বিদ্রোহ সময়ে স্বীয় বীরত্ব ও কার্য্যকুশলতা প্রদর্শনে এরূপ যশস্বী হইয়াছেন যে, লোকের নিকট বর্ত্তমান সময়ে তিনি সাধারণতঃ "রণকুশল মুনসেফ" ( Fighting Munsiff ) নামে পরিচিত। প্যারীমোহন যে শুধু বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে নিজ এলাকাধীন দেশ রক্ষা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে—তিনি বিদ্রোহীদিগকে আক্র-মণ, তাহাদের অধ্যুষিত স্থানগুলিকে অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত এবং চিঠি পত্র লিখিয়া অধঃস্তন কর্ম্মচারিবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য সমাধা করতঃ অদ্ভুত কার্য্যকুশলতা, ক্ষিপ্রকারিতা ও শাসনক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া নিজ জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।"

প্যারীমোহনের পত্রোত্তরে মিঃ কোর্ট লিখিয়াছিলেন :—"আপনার কার্য্য-দক্ষতা ও বীরত্ব দেখিয়া আমি আশাতিরিক্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি আরও কিছুদিন এদেশে থাকিতে পারিতাম তবে আমি নিজেই আপনাকে সঙ্গে লইয়া লর্ড ক্যানিংএর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতাম। সময়, সুযোগ ও স্বাধীনতা পাইলে এদেশের লোকেও কিরূপে নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারে, ইংলণ্ডবাসীদিগকে তাহা বুঝাইবার জন্যই আমি আপনার চিঠির একপ্রস্ত নকল দেশে লইয়া যাইতেছি। এ প্রদেশে শান্তি স্থাপন হইলে সে সংবাদ আমাকে লিখিবেন। বিদ্রোহের সময় যাহারা গভর্ণ-

মেণ্টকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ নিজ ধন, মান,প্রাণ বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহারা কে কিরূপ পুরস্কার লাভ করে আমাকে তাহা জানাইলে সুখী হইব।"

সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্যারীমোহন যে বীরত্ব, ধীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ যুক্তপ্রদেশের তদানীন্তন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে সহস্রমুদ্রা খিলাত ও বার্ষিক পাঁচশত টাকা আয়ের এক জায়গীর প্রদান করতঃ সরকারী গেজেটে তাহা ঘোষণা করিয়া গবর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলন।* এই পুরস্কারে শুধু প্যারীমোহন নহেন—তাঁহার স্বজাতিমাত্রই গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী যে শূরত্ব, যে বীরত্ব দেখাইয়া রাজা, প্রজা উভয়ের নিকট হইতেই বীর পূজা ও বীর সম্মান পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন, ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে আজ শত শত সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যে সেই সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারে—মেকলের জাত ভায়াগণ মুখে না হউক—অন্ততঃ মনে একথা স্বীকার করেন, ইহা আমরা স্পর্দ্ধাসহকারে বলিতে পারি।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

---

* বিদ্রোহের পরে গভর্ণমেণ্ট প্যারীমোহনকে বান্দার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

# মহারাজা রাজবল্লভ সেন।

## ( সমালোচনা )

### জন্ম সন নির্ণয় ও শিক্ষা।

মহারাজার জন্ম সন ও বয়স লইয়া নানারূপ মতদ্বৈধ চলিয়াছে। এইরূপ একজন প্রসিদ্ধ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বয়স নির্দ্ধারণ ব্যাপারটা যদ্যপি শুদ্ধভাবে সম্পন্ন না হয়, তবে তাঁহার জীবনচরিতের প্রধানাংশ যে তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিল, তৎবিষয়ে সংশয় স্থাপন করা কদাচ অনুচিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ রাজার যখন একটা প্রকাণ্ড বংশ বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন এইরূপ একটা সামান্য ঘটনা নিরূপণ করা কি বড়ই আশ্চর্য্য বা কঠিন ব্যাপার মধ্যে পরিগণিত হইতে পরে? যিনি এতং বিষয়ে ভ্রান্ত, তাহার জীবনচরিত লিখিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৺উমাচরণ রায় মহাশয়ের লিখিত জীবনচরিত পাঠে জানা যায় রাজবল্লভ ৪৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন; যথা—

"গুরুদাস গুপ্ত লিখেন রাজবল্লভের ১৯ বর্ষ বয়োগতে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নবাবের অধীনে তিনি স্বীয় পিতার পদে নিযুক্ত হন। এতাবতা ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বিপরীত ক্রমে ১৯ বর্ষের আদি গণনা করিলে ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ হয়, অতএব ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাজবল্লভের জন্মাব্দ স্বীকার করা হইল" (১)।

(১) বঙ্গদূর ১৩১১ সন পৌষ ৩০৪ পৃষ্ঠা।

৺চন্দ্রকুমার রায় মহাশয় বলেন, "রাজবল্লভ ১১০৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ ও ১১৭০ বঙ্গাব্দে প্রাণত্যাগ করেন" (১)।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত মহাশয় ১৩১১ সনের ভারতী পত্রিকার ভাদ্রের সংখ্যায়, এক প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে জানান ১৭৭৬ সংবৎ বা ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজবল্লভের বয়স ৪৭ বৎসর হইয়াছিল, পরে তৎবিরচিত বর্ত্তমান গ্রন্থে বলেন "চন্দ্রকুমার রায় মহাশয় ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজবল্লভের জন্ম সন বলেন, মহারাজার অনন্তর বংশ পালং নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন জানাইয়াছেন যে, মীরকাসেম কর্ত্তৃক ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন তৎকালে তাঁহার বয়ক্রম ছিল ৫৬ বৎসর" (২)।

আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে চন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নির্দ্ধারণই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। কারণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টে ঢাকা নেয়াবতীর যে সদর রাজস্বের তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, উহার ২য় মহালটীর নাম রাজনগর, মালিক লক্ষ্মীনারায়ণ। বোধ হয় বিক্রমপুর নিবাসী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, রাজা রাজবল্লভের সময়েই, বিক্রমপুর ও হাবেলী প্রভৃতি পরগণার কতক স্থান লইয়া রাজনগর পরগণার সূত্রপাত এবং রাজবল্লভের বাস স্থান ও এই সময়ে রাজনগর নামে পরিচিত হয়। উহার পূর্ব্বে নাম ছিল বিল দামুনীয়া। লক্ষ্মীনারায়ণ রাজবল্লভের গৃহ-দেবতা শিলাচক্র ; তাঁহার নামেই জমিদারীর সৃষ্টি, রাজা স্বীয় নামে কোন জমিদারী করিয়া যান কিনা তাহা জানা যায় না। বাসুদেব প্রভৃতি বিগ্রহ নামেও কতক ভূসম্পত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। (৩)

(১) চন্দ্র কুমার রায়-প্রণীত মহারাজা রাজবল্লভের জীবন চরিত, ৩ ও ৫০ পৃষ্ঠা।

(২) জীবনচরিত ৫০ পৃষ্ঠা।

(৩) পরগণে উত্তর সাহারাজপুরের /১০ দেড় আনা এবং লক্ষ্মীদিয়ার কথকাংশ লইয়া এই তালুকের পরিচয়। পূর্ব্বসংখ্যায় সাহারাজপুর নগর এবং আশরীরাম দত্ত লেখা ভুল হইয়াছে, এই স্থানে সাহাবাজপুর পরগণা ও আনন্দিরাম দত্ত হইবে।

রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস এক দিবসে নিহত হন, সেই সময়ে কৃষ্ণদাসের চারিপুত্র ও

১১৩৫ বঙ্গাব্দে নবাব সুজাউদ্দীনের শাসনকালে রাজবল্লভের এই জমিদারীর প্রথম সূত্রপাত। পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা নবাব মীরকাসেম আলাখাঁর সময়ে ১১৭০ বঙ্গাব্দেও এই জমিদারীর উল্লেখ আছে। প্রথম বন্দোবস্তের সময় উহার রাজস্ব ছিল ৮৫২৯৮ টাকা। মহালের নম্বর ৩৮ জমিদারীর নং ছিল ১৭। পরে মহালের ও জমিদারীর নম্বর ঠিক থাকিয়া রাজস্ব বর্দ্ধিত হইয়া হয় ৮৮৩৮৯ টাকা (১)! এখন আর একটি কথা বলা সঙ্গত, ১১৩৫ বঙ্গাব্দ হয় ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ। রাজবল্লভের প্রথম জমিদারীর কথা এই সময় জানা যায়। যদ্যপি ৺ উমাচরণ রায় মহাশয়ের কথা ঠিক ধরা যায় তবে এই ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজার বয়স হয় ১৪ বৎসর এবং শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত মহাশয়ের কথার উপর নির্ভর করিলে এই সময়ে রাজার বয়স হয় ২০।২১ বৎসর মাত্র। চন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের মতানুসরণ করিলে দেখা যায় রাজবল্লভ এই সময়ে ২৯।৩০ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত যে রাজবল্লভের লেখা পড়ার সময় ও উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহা বিবেচক পাঠক মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন। তৎপর একুশ বৎসরের কথা, তাহাও সম্ভবপর নয়, কারণ গুরুদাস গুপ্তের মতাবলম্বী ও গঙ্গা প্রসাদ বাবু হইতে উপদেশ প্রাপ্ত উমাচরণ রায়ের লেখা হইতেই উপলব্ধি হয় যে রাজবল্লভ ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমে প্রথম রাজকার্য্যে প্রবেশ লাভ করেন, যথা—

"ক্রমে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা লাভ করিয়া ১৯ বর্ষ বয়সে ঢাকার নায়েব নাজীমের অধীনে রাজবল্লভ স্বীয় পিতার পরিত্যক্ত পদলাভের বাসনায় ঢাকা গমন করেন। তথায় যাইয়া ঢাকার কাননগো বিক্রমপুর মালখানগর নিবাসী কায়স্থ কুলনিধি রামনিধি বসু মহাশয়ের সাহায্যে অভীষ্ট পদলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, (২)

দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ছয় সন্তানের পিতার অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর বয়স হওয়া সম্ভবপর। রাজবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাস, অতএব রাজার এই সময়ে ৬৪।৬৫ বৎসর হওয়া বিবেচনা করিলে অন্যায় হয় না।

(১) ফিফ্‌থ রিপোর্ট ৩৬৭।৩৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) নব্যভারত ১৩১১ সন পৌষ ৪০৪ পৃষ্ঠা।

সাধারণ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইলেও একবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজবল্লভ যে বিলদায়ুনীয়াকে রাজনগর নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া একটা প্রকাণ্ড জমিদারিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উহা অনুমানেও আইসে না। তবে ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে সুজাউদ্দীনের নায়েব নাজিমি পদারূঢ় থাকিবার সময়ে এই জমিদারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে কানুনগোর সেরেস্তা অতিক্রম করিয়া রাজবল্লভ নাওরার কার্য্যে প্রবেশ লাভ করেন। মোরদ আলী এই সময়ে নাওরার প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি রাজবল্লভকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেন। মিঃ ষ্টুয়ার্টের মতে নাওরার কার্য্যে প্রবেশ লাভ করিয়াই রাজবল্লভ বিশেষ সম্পত্তিশালী হন (১) রাজবল্লভ প্রথম কানুনগো সেরেস্তায় যে প্রবেশ লাভ করেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পরে অন্ততঃ ২।৩ বৎসর অতিক্রমে নাওরায় প্রবেশ লাভ করা সম্ভব। দুই বৎসর কার্য্য করিয়া যে তাহার জমিদারী লাভ হয় নাই, এইটী নিশ্চয় কথা। অন্ততঃ কার্য্যপ্রাপ্তির ১০।১১ বৎসর পর ত্রিংশৎ বৎসরেই রাজবল্লভের রাজনগর পরগণা লাভ হইবার সম্ভাবনা। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা ১১০৫ বঙ্গাব্দ বা ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দই রাজবল্লভের জন্ম সন ধরিয়া লওয়া সঙ্গত বিবেচনা করি। শ্রীযুক্ত প্রতাপ বাবুর কথায় লেখক যে প্রতারিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে গোকুলচাঁদের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে রাজবল্লভ রাজনগরের পত্তন করেন বলিয়া শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল। উহা আমাদের পূর্ব্ব লিখিত বিবরণ হইতেই প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "রঘুনন্দন ও নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন। কোন কারণে নবাবের বিরাগভাজন হইলে, তাহার শিরশ্ছেদের অনুজ্ঞা প্রচারিত হয়। এই সময়ে তিনি পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর তাহাকে দরবারে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত নবাব সরকার হইতে কৃষ্ণরাম ও রামমোহনের প্রতি আদেশলিপি প্রচারিত হইলে তাহারা ভ্রাতার জীবন রক্ষার উপায়ান্তর অভাবে "রঘুনন্দন" কালগ্রাসে পতিত

(১) ষ্টুয়ার্ট হিষ্ট্রী বঙ্গবাসী এডিসন ৫৩৩ পৃষ্ঠা।

হইয়াছেন, এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, তাহাতেই রঘুনন্দন পরিত্রাণ পাইলেন" (১) "জপসাবাসী গোপীরমণ সেনের আবাস স্থানে "পঞ্চরত্ন" নামক অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল, রঘুনন্দন এই গৃহে পারসি ভাষা অধ্যাপনা করিতেন, "আনন্দময়ী দেবীর প্রপিতামহ কৃষ্ণরাম দেওয়ানের জীবদ্দশায় যে রাজবল্লভ জপসা গ্রামে অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন করিতেন, একথা অনেকে বলেন, (২) অতঃপর লেখক বলেন, রাজবল্লভ এই রঘুনন্দনের পদতলে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন, ইত্যাদি।

প্রথমতঃ রঘুনন্দনের কথা বলা যাইতেছে। এই মহাত্মা জপসাবাসী গোপীরমণ সেন খাসনীস মহাশয়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। ২য় পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায় ও ৪র্থ পুত্র রামমোহন ক্রোড়ীর বিষয়ী ইতিপূর্ব্বে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রবাদ কথা হইতে অবগত হওয়া যায়, রঘুনন্দন কোন সময়ে একটি অবলার স্তন কর্ত্তন করায়, তাহার কারাবাসের আজ্ঞা প্রচার হয়, এজন্য তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হন ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণরাম ও রামমোহনের অনুগ্রহে অব্যাহতি লাভ করেন।

এই সময়ে কৃষ্ণরাম ও রামমোহন বিশেষ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি মধ্যে পরিগণিত। জন্মভূমির হিতকল্পে এই ভ্রাতৃযুগল দুইটি সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া কৃষ্ণরাম একটি পারস্য ভাষাশিক্ষার "মখতবের" ও রামমোহন একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ভার গ্রহণ করেন। কৃষ্ণরামের স্বীয় অর্থে নির্ম্মিত পঞ্চরত্ন নামক সৌধের নিম্নতলে, "মখতব" ও রামমোহনের ব্যয়ে নির্ম্মিত আটচালা গৃহে টোল বা চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হয়। উপযুক্ত মৌলবী ও ভট্টাচার্য্যগণ অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত হন। শৈশবে পিতৃহীন নিবন্ধন (৩) রাজ-

(১) শ্রীযুত গুপ্ত মহাশয়-প্রণীত জীবনী ৫১ পৃষ্ঠা।

(২) গুপ্ত মহাশয়-প্রণীত জীবনী ১২৫ পৃষ্ঠা।

এই লেখকের স্বহস্ত লিখিত কোন একখানা চিঠী যাহা, সমালোচকের নিকট বহুপূর্ব্বে লেখা হয় তাহাতে জানাইয়াছেন, "জপসার অনেকের নিকট শুনিয়াছি আপনাদের বাড়ীতে মখতব ছিল"।

(৩) 'তৃতীয় পুত্র রাজবল্লভের বাল্যকালাবধিই বুদ্ধির প্রাখর্য্য, ধারণাশক্তির গাম্ভীর্য্য, অর্জ্জন-স্পৃহা ও বিলক্ষণ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ছিল। যদিও শৈশবাবস্থাতে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল,

বল্লভ দূরদেশে অধ্যয়ন করিতে না যাইয়া মাতৃ আজ্ঞাক্রমে, জ্ঞাতি ভ্রাতা কৃষ্ণরামের প্রতিষ্ঠিত এই "মখতবে" পারস্য ভাষা শিক্ষা জন্য প্রবেশ লাভ করেন। তবে প্রয়োজনীয় বিষয় যাহা বুঝিতে বা জানিতে ইচ্ছা হইত, উহা পারস্য ভাষাবিৎ জ্ঞাতি ভ্রাতা রঘুনন্দনের নিকট সম্পন্ন হইবার খুব সম্ভাবনা।

শ্রীযুক্ত গুপ্তমহাশয়ের মতে, রঘুনন্দন এইরূপে প্রাণলাভ করিয়া আর কি করিবেন একটা "মখতব" খুলিয়া, ছেলে পড়াইতে আরম্ভ করেন। উহা সময় ক্ষেপণ কি জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য তাহা স্পষ্ট কিছু বলেন না। তবে রাজবল্লভ ঐ "পঞ্চরত্ন" নামক অট্টালিকার নিম্নপ্রকোষ্ঠে রঘুনন্দনের পদমূলে বসিয়া যে শিক্ষালাভ করিতেন, তিনি উহা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আশে পাশে বসিবার তাহার কোন অধিকার ছিল কিনা তাহা নির্দ্দেশ নাই।

এস্থলে আর এক কথা বলিয়া রাখা সঙ্গত, রসিক গুপ্ত মহাশয় পঞ্চরত্নটি গোপীরমণের বাড়ীতে সংস্থাপিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাণ খুলিয়া কৃষ্ণরামের বলিতে সাহস পান নাই বা ইচ্ছা করেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে এই কথাটি এমন কৌশলে সম্পন্ন হইয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি লিখেন যে, আকবরের রাজধানী আগ্রাতে তাজমহল নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট সৌধ বর্ত্তমান আছে, যেমন তাহার ভুল ধরিবার কোন উপায় নাই, এই স্থলেও তাহাই ঘটিয়াছে। যে স্থানে পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা গোপীরমণের নিজ ভদ্রাসনেই, তবে স্থাপয়িতা কিন্তু তিনি নন তাহার পুত্র কৃষ্ণরাম।

গোপীরমণ জীবিতাবস্থায় স্বীয় ভদ্রাসন আপন ছয় পুত্রকে সমান ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়া যান (১)। গোপীরমণের স্বীয় গৃহটির স্থান সমুদয় দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরামের অংশে পতিত হয়, আবার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দনের

তথাচ তিনি কোন বিষয়ে কোন প্রকারে ক্ষুব্ধ চিত্ত বা ভগ্নোৎসাহী না হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও পরিশ্রম সহকারে পারস্য ও তাৎকালিনী বাঙ্গলা বিদ্যায় বিলক্ষণ পটুতা লাভ করেন। ৺ ৺ উমাচরণ রায়-প্রণীত জীবনী ( নব্যভূত ১৩১১ সন পৌষ ৪০৪ পৃষ্ঠা। )

(১) ৪৯৭ সনে এই বাটোয়ারা কার্য্য সম্পন্ন হয়। এইটা পরগণা রতিসন। রঘুনন্দনের পৌত্র সদাশিব সেন ও হরেকৃষ্ণ সেন, রতন কৃষ্ণ সেন বরাবর ভূমি বিক্রয়ের যে কবলা লিখিয়া দেন তাহা ১১৭৫ বাপরগণরতি ৫৬৬ সনে সম্পন্ন হয়, এইরূপ আরও বহু দলীল আমাদের

বাস স্থান এক প্রান্তভাগে, সদর রাস্তার পাড়ে নির্দ্দেশ হয়, এজন্য রঘু মর্ম্মাহত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় জননী হরিপ্রিয়া দেবীকে জ্ঞাপন করিলে; স্নেহময়ী মাতা পুত্রের বণ্টনের ফল শুভকর নয় ভাবিয়া মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে তাহার বাস নির্ণয় জন্য অন্যান্য পুত্র সমূহকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না। এজন্য তিনি অশ্রুপাত করিতে থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণ রামের সহধর্ম্মিণী কমলাদেবী, শ্বশ্রুর এইরূপ দুর্লক্ষণ ও শোকভার সন্দর্শনে মর্ম্মহত হইয়া, তৎসমিপবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন "দেবী! আপনি স্থির হউন। আমি যেরূপে পারি আপনার মনন অবশ্য সম্পন্ন করিব, বলাবাহুল্য পরে কমলা আপনার স্বামীর অংশ হইতে রঘুনন্দনকে অর্দ্ধেক বিভাগ করিয়া দিলেন। এই কারণ-প্রযুক্ত হরিপ্রিয়া পুত্রবধু কমলার প্রতি এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন বৎসে তুমি যেমন অদ্য আমার সম্মান রক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট করিলে তদ্রুপ আমার এই বিপুল বংশ মধ্যে তোমার সন্তানগণ চিরশ্রেষ্ঠ সম্মনিত থাকিবে। বাস্তবিক অপসা বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত সতীর এই আশীষবাণী কখনও মিথ্যাতে পরিণত হয় নাই। কৃষ্ণরাম গোপীরমণ সেনের প্রতিষ্ঠিত, দুর্গাদালান (ঝিকুটী) প্রাপ্ত হন, পরে ঐ দালান পূর্ব্ব ভিটায় রাখিয়া উহার দক্ষিণের ভিটায় পঞ্চরত্ন নির্ম্মাণ করান। লেখক গুপ্তমহাশয় উদারতা গুণে উহা কৃষ্ণরামের প্রতিষ্ঠিত বলিতে প্রস্তুত হন নাই। কারণ কৃষ্ণরামের প্রতি-ষ্ঠিত "পঞ্চরত্ন" "মখতব" বলিলে পাছে, তদবংশধর রামপ্রসাদের কোন প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয় উহাই তাঁহার জল্পনা, কল্পনা।

৺চন্দ্রকুমার রায় মহাশয় রাজবল্লভের শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন "রাজ বল্লভ ভ্রাতার (রাজারামের) (১) নিকট থাকিয়া তৎকাল প্রচলিত প্রথানুযায়ী.

নিকট বর্ত্তমান আছে। ৪৯৭ পরগণাতি সন হয় বাঙ্গলা ১১০৬ সন। রুক্মিণীকান্ত ও বরদাকান্ত রায় বাদী হরনাথ রায় প্রতিবাদী জেলা ঢাকার অন্তর্গত বহরের মুন্‌সেফীতে যে মকর্দ্দমা হয়, তাহাতে নবকুমার রায় প্রার্থিত বিবাদী কর্ত্তৃক ১২৭৪ সনের ৩১ শ্রাবণ তারিখে এই দলীল আদালতে দাখিল হয়। ১৮৩২নং। ১১৩নং প্রাচীন কাগজ সমূদয় আমাদের নিকট যাহা আছে, প্রয়োজন মত পরে প্রকাশ করা যাইবে। পরগণায় তি সনের প্রথম আবিষ্কার বোধহয় এই হইল।

রাজকীয় পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন।” এটাও মিথ্যা কথা নয়, জপসার পাঠ সমাপন করিয়া রাজবল্লভের ভ্রাতার নিকট ঢাকা অবস্থান করিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষা করাও অসম্ভব নয়। কারণ গ্রাম্য মখতব হইতে নগরের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসাতে যে বিদ্যাচর্চ্চা অধিক হইত তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। (১) অতঃপর দিল্লী যাইয়া শিক্ষার কথা যাহা শুনা যায় তাহার কোন প্রমাণ নাই।

অতঃপর লেখক বলেন, “রাজবল্লভ উচ্চ রাজকার্য্য লাভ করিয়া প্রতি বর্ষে গোপীরমণ সেনের গৃহে “ভেট” প্রেরণ করিতেন, এই ভেট শিক্ষা-লাভের প্রতি দান স্বরূপ ভক্তির উপহার বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

* * * * * * * *

রঘুনন্দন সেনের উত্তর পুরুষগণ বলেন যে, বৃদ্ধ বয়সে তিনি বারাণসীধামে অবস্থান করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, রাজবল্লভ সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়া রঘুনন্দনের কাশীবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন” ( ৫২ পৃষ্ঠা )

রাজবল্লভ গোপীরমণের জীবদ্দশায় জপসা থাকিয়া অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি কৃষ্ণরামের গৃহে অবস্থান করিতেন পড়িতেন; তৎ প্রতিষ্ঠিত “মখতবে,, মৌলবী সাহেব পড়াইতেন, রঘুনন্দনের নিকট ঘরে পাঠ বুঝিয়া লইতেন এইরূপ অবস্থায় কাহার উদ্দেশে এই, “ভেটের ডালী” প্রেরিত হইত? কৃষ্ণরামের বংশধর বা মৌলবী সাহেবের নিকট না প্রাইবেট মাষ্টারের উদ্দেশে? তিন জনই ত গোপীরমণের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন, তবে এই কথার যে কোন মূল নাই তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। জ্ঞাতিসন্তান জ্ঞাতি বাড়ীতে অবস্থান করিয়া যদি আবার তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ কোন কিছু দান দ্বারা তাহার ক্ষতি পূরণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে কোন বিবেচক

(১) জেমস্ টেইলর কৃত টপোগ্রাফী অফ্ ঢাকা পুস্তকের ২৭৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, আসাদুল্লা নামে একজন মৌলবী ঢাকার মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিল, তাহার বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট প্রশংসা ছিল এজন্য মোগলগবর্ণমেণ্ট তাহাকে মাসিক ৬০ ষাটি টাকা বেতন প্রদান করিতেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। তৎকালের ৬০ টাকার মূল্য বর্ত্তমান সময়ের তিনশত টাকার তুল্য হইবে। মোসলমান রাজত্বেও সাধারণের জন্য বিদ্যাশিক্ষার যে ভাল বন্দোবস্ত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বা কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয়? বিশেষ ভেট কথাটা এস্থলে প্রযুক্ত হওয়া উভয়ের পক্ষেই লজ্জার কথা হইয়াছে।

যাহারা হিন্দুসমাজ সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন, তাঁহারা অবশ্য পরিজ্ঞাত আছেন যে, প্রতিগ্রহ লইয়া পারত পক্ষে কোন সম্পন্ন ব্যক্তিই তীর্থ ভ্রমণ বা বাস করিতে সম্মত হন না। নিঃস্বলোকের পক্ষেই এই বিধান। এইরূপ অবস্থায় রঘুনন্দন জমিদার পুত্র হইয়া পরের সাহায্যে কাশীবাসী হইয়া ছিলেন, এ কথাটা কি অস্বাভাবিক নয়? যদি তাঁহার অর্থকৃচ্ছ্রতাই ঘটিয়া ছিল তবে তাহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র রামপ্রসাদ, রামগঙ্গা রামেশ্বর প্রভৃতির নিকট সাহায্য গ্রহণ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইত। তাহা না করিয়া জ্ঞানবান রঘুনন্দন রাজবল্লভের গলগ্রহ হইলেন; তবে রঘুর কৃপণতা দোষ ছিল বটে, তাহা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যে নয়। তিনি যখন কাশীবাসী হন তৎকালে রামানন্দ সরকারসহ এক খণ্ড ভূমি পরিবর্ত্তন করিয়া, তদধিকৃত কাশীর এক খণ্ড ভূমি গ্রহণান্তে তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। যিনি এতদুর সমর্থ, তিনি যে পরের অর্থ গ্রহণ করিয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন মতেও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় কি?

প্রাচীন কিম্বদন্তী হইতে অবগত হওয়া যায় একদা কৃষ্ণরামের পৌত্র লালা রামপ্রসাদের পুত্র রামগতি রঘুনন্দনের বাগান হইতে কতকটী লেবু লইয়া আসেন, এজন্য তিনি খুল্ল পিতামহ রঘুনন্দন কর্তৃক তিরস্কৃত হন। তদুত্তরে রামগতি বলেন, দাদামহাশয় এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন কাশীধাম গমন করুন না কেন, এখন লেবুর চিন্তায় দিন কাটাইলে আর কত লভ্য হইবে? এই কথা গুলি দৈববাণীবৎ রঘুর কর্ণে প্রবেশ লাভ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ইষ্ট-কবচাধার লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পরে স্বপ্রতিষ্ঠিত "ভূতাবালাখানা" মন্দিরে কিছুকাল অবস্থান করিয়া নিজ বিষয়াদির বন্দোবস্ত করিয়া কাশী অভিমুখে প্রস্থান করেন।

পূর্ব্বাঞ্চল হইতে নৌকাযানে বারাণসী গমন করিলে, পদ্মা অতিক্রম করিয়া পরে গঙ্গা নদীতে পতিত হইতে হয়; অদূরে মুর্শিদাবাদ থাকিয়া যায়। রঘু-

নন্দনের তথায় গমন করিবার ইচ্ছা হওয়ায়, তিনি তদভিমুখে চলিয়া মুর্শিদাবাদ উপস্থিত হন। এই সময়ে তাহার সহিত রাজবল্লভের সাক্ষাৎ হয়, তখন জানাইলেন, আমি কাশী বাস করিব মনস্থ করিয়া বাহির হইয়াছি; কিন্তু অর্থের প্রয়োজন, দান গ্রহণ করিব না খাটিয়া অর্থ সংগ্রহ করিব। রাজবল্লভ মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, আপাততঃ এমন কোন কার্য্য খালি নাই, যাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে; তবে যদি রাজমহলের (১) পেস্কারী পদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তথায় কার্য্য লইয়া যাইতে পারেন। রঘুনন্দন উহা স্বীকার করিয়া কার্য্য গ্রহণান্তর তথায় প্রস্থান করেন; পরে অভীপ্সিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাশীবাসী হন। ইহাই ত তাঁহার কাশীবাসের বিবরণ

## রামপ্রসাদ ও কীর্ত্তিনারায়ণ।

এখন লালা রামপ্রসাদ ও লালা কীর্ত্তিনারায়ণের বয়স নির্ণয় করা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গোপীরমণ সেন তদীয় পুত্রগণকে পৃথক বাড়ী করিয়া দেন, এই বাটোয়ারার কার্য্য যখন সম্পন্ন হয়, তৎকালে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দনের বয়স অন্ততঃ পঞ্চদশ বৎসর হইবার সম্ভাবনা; কারণ তদীয় স্বাক্ষরিত কাগজ যাহা বর্ত্তমান দেখা যায়, উহা বণ্টন পত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। বিশেষ বণ্টনের ফলাফলও তিনি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের বয়সের হিসাব অনুসারে তদূর্দ্ধ পঞ্চম স্থানীয় ভ্রাতা কৃষ্ণরামের এইসময়ে সপ্তবিংশ বৎসর বয়স অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তৎকালে কৃষ্ণরামের দ্বিতীয়পুত্র রামপ্রসাদের জন্মগ্রহণও অসম্ভব নয়। অতএব আমরা ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদ জন্মিয়াছিলেন অবধারণ করিলাম।

রামপ্রসাদ খড়রিয়া মূলঘর নিবাসী বিষ্ণুদাস বংশীয় গঙ্গারাম রায়ের কন্যা সুমতিদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। গঙ্গারাম রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রামানন্দ রায় বিবাহ করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদের স্বীয় খুল্লতাত ভগ্নী গোবিন্দরাম রায়

(১) কেহ কেহ মুঙ্গেরের কথা বলিয়া থাকেন।

মহাশয়ের তনয়াকে। রামানন্দের কনিষ্ঠ রামশরণ রায়ের কন্যাসহ রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় (১)। এখন পাঠক মহোদয়গণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, কৃষ্ণদাসের শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী, অন্ততঃ কৃষ্ণদাসের মাতার সমবয়স্কা না হইলেও তাঁহার জ্যেষ্ঠা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী রামানন্দের বনিতা রামপ্রসাদের কনিষ্ঠা ভগ্নী যে তাঁহার মাতার সমবয়স্কা ছিলেন, তাহা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। বিশেষ কৃষ্ণদাস তাঁহার মাতার দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। এই হিসাবেও একপুরুষ উর্দ্ধে রামপ্রসাদের বিবাহ কার্য্য দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়, রাজবল্লভ ও রামপ্রসাদ প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া যে রামপ্রসাদ, রাজবল্লভ হইতে বয়ঃকনিষ্ঠ হইবেন, তাহার কোনও কারণ নাই। রামপ্রসাদের পিতা দেওয়ান কৃষ্ণরাম সম্পর্কে রাজবল্লভের ভ্রাতা হইলেও তাঁহাদের বয়সের যে কত প্রভেদ ছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা দ্বারা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইবে। কৃষ্ণরাম স্বোপার্জ্জিত অর্থে পঞ্চরত্নমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, রাজবল্লভ সেই মন্দিরে শিশুকালে যে বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তাহা লেখক গুপ্ত মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন।

(১) অম্বষ্ঠ সম্মিলনী সভার সম্পাদক ও হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর মজুমদার বি, এল, মহাশয়ের নিকট একখানা অতি প্রাচীন জীর্ণ কুলজী গ্রন্থ আছে। কবিকণ্ঠহার প্রণীত কুলগ্রন্থের পর প্রায় ৭।৮ পুরুষপর্য্যন্তের সম্বন্ধাদির বিষয় উহাতে সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। লেখকের নাম কিছু জানা যায় না, সম্ভবতঃ তিনি বিক্রমপুরবাসী বৈদ্যঘটক বংশের কেহ হইবেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক মহোদয়গণ উহাতে লালা রামপ্রসাদ ও রাজা কৃষ্ণদাস বাহাদুরের বিবাহের বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

"দ্বে ভার্য্যে গঙ্গারামস্য আদ্যায়াং নৈব পুত্রকঃ।
শেষায়াঞ্চত্বারঃ পুত্রাঃ দ্বে কন্যে পরিণিন্যতুঃ॥
লালারামপ্রসাদশ্চ রাজবংশকুলোদ্ভবঃ।
রামপ্রসাদকন্যাভ্যাং রবি-আদিত্য-বংশজঃ॥
সাভাজপুরবাসী চ এতে চ সূনবঃ ক্রমাৎ।
জ্যেষ্ঠো রামানন্দরায়ো রামশরণো মধ্যমঃ॥
রামমোহন রায়শ্চ নরসিংহরায়োঽপি চ।
জপসারাজকুলে জাতগোবিন্দরামকন্যকাং।
রামানন্দ উপযেমে পুত্রকন্যাবিবর্জ্জিতঃ॥

এতদ্দ্বারা কি স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় না যে কৃষ্ণরামের যুবাবয়সে রাজবল্লভ শিশু ছিলেন? (১)

এখন লালা কীর্ত্তিনারায়ণের কথা। গুপ্তমহাশয় তাঁহাকে রাজবল্লভের নিকট একটি বালকরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। কিন্তু এতদালোচনাতেও তাঁহার ভুল হইয়াছে। কারণ ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজবল্লভের রাজনগর পরগণা সহ, (সুজাউদ্দীনের বন্দোবস্ত সময়ে) কীর্ত্তিনারায়ণের ও তাঁহার বৈকুণ্ঠপুর পরগণার নাম উল্লেখ রহিয়াছে। তৎকালে ঐ পরগণার সদর রাজস্ব ছিল ১১৩০২৲ টাকা। ১১৭০ সনে (১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) বৃদ্ধি হইয়া হয়,

> ত্রয়ঃ পুত্রা কন্যৈকা চ রামশরণরাজতঃ।
> রঘুদেবস্তৎপুত্রাঃ রবি-আদিত্য বংশজা।
> সাভাজপুরবাসী চ কন্যকান্তাঃ বৃাবাহ চ॥
> রাজবংশ কৃষ্ণদাসো রাজনগরবাসীচ॥"

এতদ্ভিন্ন যাঁহার ইচ্ছা হয় বিক্রমপুর বংশ পত্রিকা বা পাত্রা অনুসন্ধান করিতে পারেন।

(১) নিম্নলিখিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে রাজবল্লভ, রামপ্রসাদ হইতে বরং কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ হইতে পরেন। আমাদের কুলক্রমাগত নিয়ম অনুসারে বয়ঃকনিষ্ঠ পুল্লতাতকেও বিশেষ মান্য করিয়া চলিতে হয়, যদিও এই প্রথার ব্যতিক্রম অধুনা বিস্তর ঘটিয়াছে, তথাপি যাঁহারা প্রাচীন আছেন, তাঁহারা উহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিয়া চলেন না। পূর্ব্বকালে যে এই প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য।

রামপ্রসাদ যে সময়ে মুর্শিদাবাদে কার্য্য করিতেছিলেন, তৎকালে রাজবল্লভ ঢাকার নবাবসহ নিকাশ দেওয়ার জন্য ঐ স্থানে উপনীত হইলে রামপ্রসাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এতৎ সম্বন্ধে গুপ্ত যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"পরে বিক্রমপুর জপসা নিবাসী লালা রামপ্রসাদ সেন যিনি জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র অথচ মুর্শিদাবাদের নবাবসরকারের এক কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি দেওয়ান রাজবল্লভের মুরশিদাবাদের উপস্থিত বার্ত্তা পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে উভয়তঃ স্ব স্ব দৈহিক বৈষয়িক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসানন্তর, প্রসঙ্গত দেওয়ান রাজবল্লভ মুরশিদাবাদের নবাব সরকারের আয় ব্যয় অবস্থা এবং দেওয়ানী পদ অবসর থাকাতে তৎকর্ম্মের ভার নায়েব ফৌজ সাহামতজঙ্গের প্রতি অর্পিত থাকা বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হন।"

(নব্যভারত ১৩১১ সন পৌষ ৪০৭ পৃষ্ঠা)

৺উমাচরণ রায়-প্রণীত মহারাজ রাজবল্লভের জীবনচরিত

এস্থলে আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না. যদি ভ্রাতুষ্পুত্র রামপ্রসাদ রাজবল্লভ হইতে বয়সে ন্যূন হইতেন তবে এস্থলে কেবল পরস্পর "স্ব স্ব দৈহিক বৈষয়িক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসানন্তর এই উক্তিতেই পর্য্যবসিত হইত না, অভিবাদন পদটিও প্রযুক্ত হইত।"

১৭২৬১৲ টাকা (১)। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজবল্লভের বয়স ২৯।৩০ বৎসর হইয়াছিল। তদপেক্ষা ন্যূন বয়সে কীর্ত্তিনারায়ণ যে জমিদারী অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পরে রামপ্রসাদ ও কীর্ত্তিনারায়ণ সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

## বিবাহ ও উন্নত পদারোহণ।

গুপ্তমহাশয় তৎপ্রণীত জীবনচরিতের ৬৩ পৃষ্ঠায় লেখিয়াছেন "টমসন সাহেবের রিপোর্ট দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, রাজবল্লভ ৪টি দার পরিগ্রহ করেন, কিন্তু প্রতাপ বাবুর নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক আছে, তাহাতে তিনটি পরিগ্রহের কথা লিখিত আছে। উহার প্রথমটি হাতার বগগণ বংশে ১মটী বারেন্দ্র দেশে ৩য়টি রাঢ় দেশে" আরও বলেন—

"হিন্দুশাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে একাধিক নিষেধ বিধি নাই সত্য, কিন্তু হিন্দু সাধারণ একাধিক বিবাহের বিষময় ফল অনুভব করিয়াই এক পত্নীর বর্ত্তমানে, পত্ন্যান্তর গ্রহণ করিতে রাজবল্লভের বহু পূর্ব্ব হইতেই বিরত হইয়া ছিল" পুনরায় বলেন—

"রাজবল্লভের দ্বিতীয়া পত্নী বারেন্দ্র সমীপস্থ নাটোর অঞ্চলবাসী এবং কনিষ্ঠা পত্নী বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড নিবাসী গোস্বামী বংশ সম্ভূতা"।

"এই সময়ে বারেন্দ্র ও বঙ্গ এই তিন সমাজস্থ বৈদ্যগণ পরস্পর আদান প্রথা প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে এই শেষোক্ত দুই মহিলার পাণিগ্রহণ করেন" (৬৪ পৃষ্ঠা)

শ্রীযুক্ত গুপ্তমহাশয় যদ্যপি সমাজসম্বন্ধীয় প্রকৃত ইতিবৃত্ত অবগত থাকিতেন, তবে তাঁহাকে টমসন সাহেবের রিপোর্ট (যাহা তিনি স্থানবিশেষে বেদবাক্যবৎ গ্রহণ করিয়াছেন) এ স্থলে অপ্রমাণ্য করিতে এত প্রয়াস পাইতে হইত

(১) কিংবরিপোর্ট ৩৩১।৩৩৩ পৃষ্ঠা

না। হিন্দু সমাজে বহুকাল যাবৎ বহু বিবাহ প্রচলন রহিয়াছে, তাহার জের অদ্যাপি মিটে নাই। তবে কোন সাহসে তিনি বলিলেন "একপত্নী বর্তমানে পত্ন্যান্তর গ্রহণ রাজবল্লভের বহু পূর্ব্ব হইতেই বিরত ছিল" ইহা ত এই উনবিংশ শতাব্দীতেও লোপ প্রাপ্ত হয় নাই, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও তাহা পুরা দমে চলিয়া ছিল। বিশেষ তৎসাময়িক বড়লোকদের উহাও একটা ঐশ্বর্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল, যিনি নিতান্ত বিবেচক তিনি অন্ততঃ দুইটি দার পরিগ্রহণ করিতেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সভাবাজারের মহারাজ রাজকৃষ্ণ ক্রমে ছয়টী রমণীরত্ন গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তবে এজন্য এ পর্য্যন্ত কেহই তাহাদের কৈফিয়ৎ তলব করেন নাই। পাছে রাজা রাজবল্লভের ভাগ্যে উহা ঘটে এইজন্য বোধহয় রাজবংশের হিতকারী লেখক মহোদয় পূর্ব্বেই ইসু সংস্থাপন দ্বারা উহার নিষ্পত্তি পূর্ব্বক রাজবল্লভের এই পাতকানুষ্ঠানের কারণ নির্দ্দেশে উহার সমীচীন মীমাংসা করিয়া রাখিলেন। যেন তাঁহাকে কোনরূপ কৈফিয়তের বশবর্ত্তী হইতে না হয়। তবে আমরা এইটি অনুমান করি, প্রচলিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই মহারাজ রাজবল্লভ এই বহুবিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া ছিলেন।

রাজবল্লভ সমাজ সংস্কার করিতে যাইয়া রাঢ় ও বঙ্গে আদান প্রদান প্রচলনের চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বারেন্দ্র সমাজ সহ উহা করিবার কোন কারণ তৎসময়ে ছিলনা। যেহেতু বহুপূর্ব্ব হইতে বারেন্দ্র ও বঙ্গে আদান প্রদান চলিয়া বঙ্গীয় সমাজের বহু বৈদ্য বারেন্দ্রবাসী হন। অতিপূর্ব্বে বারেন্দ্র সমাজ কহিলে যে বৈদ্যশ্রেণী বুঝাইত উহা সমুদয় নিম্নস্তরের বৈদ্য। (১) রাজবল্লভের এ হেন নীচবৈদ্য সহ সম্মিলনের চেষ্টা করার কোন কারণ ছিলনা, উহারাই চেষ্টাদ্বারা বঙ্গীয় সমাজে স্থান লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। রাঢ়ী ও

(১) "নম্বিষ্ঠাঃস্রা ধরাকুলো রক্ষিতাশ্চত পঞ্চ যে,
তে বারেন্দ্রেষু বিখ্যাতা দাসদত্তকরা অপি
রাঢ়ীয়াভিমতা যে যে প্রারম্ভে বঙ্গগা অপি"
ভরতমল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভা

বঙ্গজ বৈদ্য একমূল প্রসূত হইলেও বহুকাল যাবৎ ভিন্ন সমাজে পরিচালিত হইয়াছে, রাজবল্লভ সম্ভবতঃ উহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু কার্য্য-দ্বারা তাহাও প্রতীত হয় না, কারণ পরবর্ত্তী সময়ে রাজার সপ্তপুত্র ও দুই কন্যার বেলায় তাহা দৃষ্ট হয় না কেন? রাজার বিশেষ মনোযোগ থাকিলে, রাঢ়ীয় সমাজ সহিত যে আরও দুই, চারিটী, কার্য্য সম্পন্ন না হইতে পারিত এমত নয়। এই সকল কারণ প্রযুক্ত আমাদের বিশ্বাস হয় উহা একটী সাময়িক ঘটনা মাত্র। (১)

বহুদিন অতীত হয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাদের বংশের আদান প্রদান সম্বলিত একখণ্ড বংশাবলী যাহা জপসাতে প্রেরণ করেন তাহাতে মহারাজের চারিটি দার পরিগ্রহের কথারই স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। উহার প্রথমটি হাতার বগগণ বংশে, দ্বিতীয়টি ইংন নরদাস বংশে, তৃতীয়টি বাণীবহ মাধব বংশে, ৪র্থটি রাঢ় দেশে। তবে প্রতাপ বাবু এখন কোন সাহসে তিনটির কথা বলেন তাহার মর্ম্ম আমরা বুঝিতে সক্ষম হইলাম না। টমসন যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। অদ্যাপি বোজের গো উমেদপুর পরগণার মধ্যম ছোট নয়ারাণী নামে এক তালুকের পরিচয় আছে, যখন, মধ্যম, ছোট নয়া, এই তিন রাণী ছিলেন, তখন একজন বড় বা প্রধান রাণী অবশ্য থাকিবার কথা। এই বড় রাণী নামে অপর এক পৃথক তালুক ছিল, ৺চন্দ্রকুমার রায় মহাশয় প্রণীত রাজার জীবন চরিতে লেখা হইয়াছে "জ্যেষ্ঠা মহারাণীর মৃত্যুর পর অপর তিন রাণী ঐ তালুকদ্বয় উপভোগ করিতে ছিলেন। (জীবনচরিতের ৬২ পৃষ্ঠা)। এতগুলি প্রমাণ থাকা সত্বেও কি আমরা বলিব যে মহারাজ রাজবল্লভ সমাজ সংস্কার জন্য মাত্র তিনটি মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর রাজবল্লভের উন্নত পদারোহণের কথার আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) জপসাবাসী রামানন্দ সরকার রাঢ়ী সমাজের এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। অপর বিক্রমপুর শোককোট নিবাসী নিমদাস বংশীয় রূপনারায়ণ দাস রাঢ়দেশে লাহাড়িপুর বাসী গোবিন্দ সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

প্রথমটি আমাদের পারিবারিক বিবরণ হইতে ও দ্বিতীয়টি ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম, এ মহাশয়ের নিকট হইতেঅবগত হইয়াছি।

প্রতাপ বাবুর মতানুসারে নবাব সরকারী জনৈক খানসামাকে চূণ খাওয়া দণ্ডের দায় হইতে মুক্ত করিয়া রাজবল্লভ বুদ্ধিমান প্রতিপন্ন হইয়া উচ্চ রাজকার্য্যে প্রবেশ লাভ করেন। বহুদিন অতীত হয় "চাঁদ রাণী" গ্রন্থে হুগলী জেলার অন্তর্গত সোমড়া নিবাসী রামচন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্য সন্তানের উন্নত পদারোহণের গল্প আমরা যাহা শুনিয়াছিলাম, এক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই জানা হইয়াছে।

রামচন্দ্রের পিতা একজন প্রধান কবিরাজ ছিলেন, কোন কারণে রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের কোপানলে পতিত হইয়া কারারুদ্ধ হন। রামচন্দ্র পলাইয়া দিল্লী গমন ও পরে তথায় এক চূণ বিক্রেতার বিপণীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, একদা রাত্রিতে বাদসাহের জনৈক খেদমদকার চূণ ক্রয় জন্য উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র কারণ বুঝিয়া তাহাকে প্রচুর পরিমাণে তৈল পান করিবার উপদেশ প্রদান করায়, ভৃত্য আপনার অপরাধ এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিল, বাদসাহের তাম্বুলে অতিরিক্ত মতির চূণ প্রদান করায় বাদসাহ ক্রোধাভিভূত হইয়া, তাহার দণ্ড বিধান জন্যই এইরূপ চূণ ক্রয়ের জন্য পাঠাইয়াছেন। পরে বেচারা ভয়ে ভয়ে চূণসহ বাদসাহ সকাশে হাজির হইলে, অমনি অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইল ভৃত্য চূণ ভক্ষণ করুক, তাহাই হইল। কিন্তু উহাতে তাহার কোন অনিষ্ট না হওয়ায়, বাদসাহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভৃত্য রামচন্দ্র সেনের উপদেশ মত তৈলপান করার কথা ও তজ্জন্য তাহার কোন অনিষ্ট না হইবার কথা প্রকাশ করিলে, বাদসাহ রামচন্দ্রকে ডাকিয়া তদীয় বুদ্ধিমত্তার জন্য কোন রাজ কার্য্যে প্রবেশ করিয়া দিলেন, পরে স্বীয় প্রতিভা বলে রামচন্দ্র উন্নত কার্য্যে আরোহণ করিয়া রাজা উপাধি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন, লেখক রাজবল্লভের বেলায়ও একথা বলিয়াছেন। রাজবল্লভ ও রামচন্দ্র উভয়েই বৈদ্য সন্তান, দ্রব্য গুণ জানা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু এটা যে একটা সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় তাহা আমরা রাজবল্লভ বা রামচন্দ্রের অন্যান্য গুণাবলীর সহিত তুলনায় বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের সময়ে এই কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়া পরে রাজবল্লভে স্থান লাভ করিয়াছে।

তৎপর লেখক বলেন "জপসাবাসী শ্রীযুত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণরাম দেওয়ান এবং তদীয় ভ্রাতা রাম মোহন কোররীর অনুগ্রহে রাজবল্লভ রাজকার্য্যে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা নবাব সরকার হইতে সম্মান সূচক যে "পাঞ্জা" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শন করিয়াই তিনি উচ্চ রাজ কার্য্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন" ( ৫৯পৃষ্ঠা )। পুনরায় বলেন "আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের কথা একেবারে ভিত্তি শূন্য না হইতে পারে" ( ৬১ পৃষ্ঠা )। এস্থানে যদি কৃষ্ণরাম বা রামমোহনের অনুগ্রহে লেখা হইয়া থাকে তবে উহা ধৃষ্টতা, কারণ জ্ঞাতি বা কুটুম্বের বেলায় উপকার করাকে যিনি অনুগ্রহ করা মনে করেন, তিনি যথার্থ অবিনয়ী ও পাষণ্ড। লেখক নিজেও বলিয়াছেন "উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী কৃষ্ণরাম দেওয়ান ও রামমোহন কোরারী জ্ঞাতি রাজবল্লভের উন্নতি লাভ বিষয়ে সাহায্য করা অস্বাভাবিক নহে" এইটী যে খাঁটি সিদ্ধান্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এস্থলে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা আছে, পাঞ্জা দেখাইয়া যে রাজবল্লভ উচ্চ রাজকার্য্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, একথা কি রসিকলাল গুপ্ত মহাশয়, আনন্দনাথ রায়ের নিকট ব্যতীত অপর কাহারও নিকট অবগত হন নাই? যে জ্ঞাতিদল রামপ্রসাদের চাকুরির কথা তাহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন, গুপ্ত মহাশয় কি তাহাদের নিকটই প্রথমতঃ এবিষয় পরিজ্ঞাত হন নাই? তবে তাহা মুখ ফুটিয়া না বলিয়া, আনন্দনাথের নাম করা কেন হইল? পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লেখক গুপ্ত মহাশয়, রামপ্রসাদের পিতা বা তাঁহার যেথানে যেটুকু দোষ পাইয়াছেন, তাহা অম্লান বদনে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু গুণটুকু প্রকাশে এতদূর সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা যেন বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট না হয়।

পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য জানাইতেছি গুপ্ত মহাশয়ের বহু পূর্ব্বে এক খানা চিঠীতে লিখিয়াছেন "জপসায় অনেকে বলিয়াছেন এবং শ্রীযুত আনন্দকুমার রায়ও বলিয়াছেন রাজবল্লভ আপনাদের বাড়ীর পাঞ্জা লইয়া রাজকার্য্যে প্রবেশ লাভ করেন" এই কয়েকটি কথার মর্ম্ম লেখক কেন

স্বপ্রণীত গ্রন্থে উদ্ধৃত না করিয়া কেবল আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন, একথা লিখিলেন ? নিজের ঘরের কোন গৌরবের কথা নিজ মুখ হইতে বাহির হইলে যে তাহার মূল্য বড় বেশী হয় না, চতুর লেখকের বুঝিতে আর বিলম্ব হয় নাই, কাজেই এই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এস্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, আনন্দকুমার রায় ও আনন্দনাথ রায় একব্যক্তি নহেন।

রাজবল্লভ পাঞ্জা দেখাইয়া যে সদ্‌বংশোদ্ভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের গল্প চলিয়াছে। ১২৯৫ সনের ১৯ আষাঢ় তারিখের ঢাকা গেজেটে, এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হয়, তদালোচনা করিতেও গুপ্ত মহাশয় বিস্মৃত হন নাই। যথা "সোনারগা (মহেশ্বরদী) নিবাসী কেহ লিখিয়াছেন রাজবল্লভ ঐ পরগণাবাসী কৃষ্ণদেব রায়ের পাঞ্জা দেখাইয়া উক্ত পদাভিষিক্ত হন" (১) এই কথার যে কোন মূল্য নাই তাহা লেখকই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গুপ্ত মহাশয় লেখেন "যদি তাহাই হইত তবে তাহার সমীপবর্ত্তী জপসা গ্রাম হইতেই সংগৃহীত হইতে পারিত" (৮০ পৃষ্ঠা)। আমরা বলি পারিত কেন, সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

লেখক বলেন "নবাবী আমলে রাজোপাধি লাভ করিতে হইলে, পূর্ব্ব পুরুষের সম্মানসূচক নিদর্শনপত্র দেখাইতে হইত তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই"। রাজোপাধি লাভের সময়ে উহা আবশ্যক হইত কিনা তাহা জানিনা, কিন্তু উক্ত রাজকার্য্য বিশেষ "কানুনগো বা দেওয়ান" প্রভৃতি উচ্চ পদারোহণের সময় উহা যে আবশ্যক হইত তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন

(১) হামছাদা গ্রামে বৈদ্যবংশোদ্ভব অসাধারণ প্রতিভাশালী কৃষ্ণদেব সেন নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথম বকসীপদ হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরে রাজা উপাধি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন" "অপিচ ঐ প্রবন্ধে কৃষ্ণদেবের রাজোপাধির সনন্দ রাজা রাজবল্লভ ছলনাক্রমে হস্তগত করিয়া পিতৃসনন্দ বলিয়া নবাবকে প্রদর্শন ও বংশানুক্রমে রাজোপাধি প্রাপ্ত হন বলিয়া লিখিত আছে"

সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস ১১৯।১২০ পৃষ্ঠা।

করিয়াছি, আইন ই আকবরির যে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই "সদ্বংশ" কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ আছে। (১)

তবে প্রশ্ন হইতে পারে দেওয়ানী পদ লাভ কালে কৃষ্ণরাম কি দর্শাইয়া কৃতকার্য্য হন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, কৃষ্ণরামের পিতা গোপীরমণ সেন মহাশয় ততদূর উচ্চ কার্য্য না করুন, খাস তহশীলদারী কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। পরে অর্থবলে উত্তর সাহাবাজপুর কতক জমিদারী ক্রয় করিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণরাম জমিদার সন্তান বলিয়াই পরিচিত হন, কাজেই তাঁহাকে এজন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। বর্ত্তমান রাজোপাধির বেলায় ও কোন কোন কার্য্যে প্রবেশ সময়ে সদ্বংশের পরিচয় দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। রাজবল্লভ সম্বন্ধে যখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সদ্বংশের পরিচয় প্রদানের কথা উল্লেখ দেখা যায় তখন এটি একেবারে উড়াইয়া দিবার কথা নহে।

বংশমর্য্যাদা বিষয়টা যে তৎসময়ে একটা প্রধান উপকরণ মধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহা আমরা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠের ভ্রাতার বন্ধুতা সংস্থাপন বিবরণ হইতেও উপলব্ধি করিতে পারি। জগৎশেঠ যখন জানিলেন ভ্রাতা রাজবল্লভ সহ বন্ধুতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন, তখন তিনি "অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করা অনুচিত ও অপমানের কারণ বিবেচনায় তাহাকে ভৎর্সনা করেন"। (২) বলা বাহুল্য এই সময়ে রাজবল্লভ ঢাকার নাওরার পেস্কার পদে বরিত ছিলেন, তথাপি জগৎশেঠ তাঁহাকে সম্মানী বিবেচনা করেন নাই। রাজবল্লভের দেওয়ানী পদলাভ সময়ে যশোবন্ত রায়, তজ্জন্য যে কয়েকটি অনুকূল কথা বলেন তন্মধ্যেও সদ্বংশোদ্ভবতার কথা উল্লেখ আছে। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ক্রমশঃ

শ্রীআনন্দ নাথ রায়।

(১) গত শ্রাবণ মাসের ঐতিহাসিক চিত্র ১৭৩ পৃষ্ঠা

(২) নবনূর ১৩১১ সন পৌষ ৪০৭ পৃষ্ঠা ৺উমাচরণ কানুনগো প্রণীত রাজবল্লভের জীবনচরিত।

# মোগল সম্রাটের সৈন্য-বিভাগ।*

রাজ্য থাকিলেই তাহা রক্ষা করিবার জন্ত সৈন্ত রাখিতে হয়। আমি বর্ত্ত-মান কালের নামসর্ব্বস্ব পরাধীন রাজাদের কথা বলিতেছি না, সে কালের সেই মোগল রাজত্ব সময়ে দেশীয় প্রত্যেক নরপতি, প্রত্যেক ভূম্যধিকারী বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত নিজ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তির অনুরূপ সৈন্ত নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা বাল্যকালে সমরকৌশল শিক্ষা করিতেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অমিতবিক্রমে শত্রু দলন করিয়া অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন। তৎকালের বাঙ্গালীর বাহু বলবান ছিল, হৃদয়ের তেজ ছিল। ম্লেচ্ছের পদাঘাত তাহারা নীরবে হজম করিত না, আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণগণও কোশাকুশি ফেলিয়া কোমর বাঁধিয়া হাতিয়ার ধরিত। কিন্তু সে কাল বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বের সে স্মৃতি এখন কেবল কল্পনা রাজ্যের সামগ্রী হইয়াছে!

পারসিকগণ শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত, মোগলগণ তুর্কীর ন্যায় ওসমানের সম্প্রদায়-ভুক্ত। মোগলেরা তৈমুরলঙ্গের বংশীয়, সুতরাং তাহারা ভারতে আগন্তুক। ১৪০১ খৃষ্টাব্দে তৈমুর ভারতবর্ষ ত্রস্ত করিয়া উহার কতকাংশ অধিকার করেন। এই সময় দেশে ঘোর অরাজকতা, সকলেই might is right নীতির অনুগত। তৈমুর ভারতের কতকাংশের অধিপতি হইলেও, এই অরাজকতাপূর্ণ দেশে শান্তিতে অবস্থান করিতে পারিলেন না, কাজেই আশঙ্কার বিনাশসাধনের

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ পূর্ব্বে 'ইন্দিরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু অকালে উহার প্রচার বন্ধ হওয়ায় প্রবন্ধ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে পারে না। এক্ষণে সমগ্র অংশই পরিবর্দ্ধিত আকারে 'ঐতিহাসিকচিত্রে' মুদ্রিত হইল।—লেখক।

নিমিত্ত—অধিকৃত ভূভাগ আয়ত্তাধীন রাখিবার মানসে সৈন্য নিযুক্ত করিতে হইল। দেশের বিদ্রোহীদিগের জন্যই যে মোগল অধিপতিকে সৈন্যনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা নহে, তাঁহার প্রতিবাসী পারসীক্, উজ্ বেগ ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী নরপতিগণের অধীনে সকল সময়েই বিপুল বাহিনী সংরক্ষিত হইত। ইহারা তৈমুরের মিত্র ছিল না, কাজেই তাঁহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় স্থির করিতে হয়। উত্তরকালে তৈমুরের বংশধরগণ এই সৈন্য শ্রেণীর সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত করেন।

ঔরঙ্গজেবের সময়ে পারসীক্, উজবেগ, আরবীয় প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক সৈন্য-বিভাগে গৃহীত হইত। ডাঃ বার্ণিয়ার তৎসময়ের সৈন্যবিভাগের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপাঠে বোধ হয় ঔরঙ্গজেবের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট সে সময়ে কেহ ছিল না। আমরা নিম্নে এই সৈন্য-শ্রেণীর বিবরণ প্রদান করিতেছি।

জেসিং (Jesseingne), জেসমসিং (Jessomseigne) প্রভৃতি ক্ষমতাশালী নৃপতিগণ সৈন্যবিভাগের প্রধান ছিলেন। ইঁহারা রাজসরকার হইতে বৃত্তি পাইতেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রাজপুত সৈন্য যুদ্ধের জন্য সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে বাধ্য থাকিতেন। এই সকল সামন্ত নৃপতিবর্গ, সময় সময় অধীন সৈনিকবৃন্দসহ প্রাসাদ রক্ষার্থে নিযুক্ত হইতেন। নৃপতিবর্গকে এই ভাবে বৃত্তি প্রদান করিয়া সৈন্যবিভাগে রাখিবার প্রথম কারণ এই যে, তাহারা প্রতাপশালী, অসংখ্য সেনানী তাঁহাদের অধীনে থাকিত, কোন কোন নৃপতি ২৫০০০ হাজার সৈন্য রক্ষা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ এই নৃপতিগণের সাহায্যে অপরাপর নরপতিগণকে বাগে আনিতেন।

শেষোক্তেরা যখন সমর-ঘোষণা করিতেন বা মোগল সম্রাটকে কর প্রদানে অস্বীকৃত হইতেন বা প্রয়োজনের সময় মোগলের সাহায্যার্থে সমর প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ না হইতেন, তখন এই সকল সামন্ত নৃপতিগণই তাঁহাদের এইরূপ অবাধ্যতার শাস্তিপ্রদান করিতে যাত্রা করিতেন। তৃতীয়তঃ একজনের প্রতি অপরের অপেক্ষা একটু বেশী অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজন্যবর্গের মধ্যে ঈর্ষা ও প্রতি-

দ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি করিতেন। এই ঈর্ষাবশে তাঁহারা পরস্পর কলহে ব্যাপৃত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইতেন। চতুর্থতঃ, পাঠান বা কোন ওমরাও কি শাসনকর্তা অত্যধিক ক্ষমতাশালী হইলে তাহার বিষদন্ত চূর্ণ করিতে ইহাঁরা নিযুক্ত হইতেন। পঞ্চম,—গোলকণ্ডারাজ যখন রাজস্ব প্রদান করিতে অসম্মত হইতেন, কি বিজাপুর-রাজের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, কিংবা যখন তিনি নিকটবর্ত্তী কোন রাজা,—যিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন না বা মোগলকে কর প্রদান করেন না, তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন, তখন তাহার প্রতীকার-কল্পে এই নৃপতিবর্গ স্ব স্ব অধীন বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতেন। এ সব ক্ষেত্রে সম্রাট ওমরাওগণকে বড় একটা বিশ্বাস করিতেন না, কারণ তাঁহাদের অধিকাংশ পারসীক্-সম্প্রদায়ভুক্ত। গোলকণ্ডারাজও পারসীক্‌গণের ন্যায় শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধে অকপটে সমরাভিনয়নির্ব্বাহ করিবে না, এই আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। এবং ষষ্ঠ বা সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, এই সামন্ত নরপতিগণই প্রয়োজনের সময় পারস্য রাজের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইতেন। কারণ, ওমরাওগণ পারসীক্ বলিয়া স্বজাতীয়ের ও স্বদেশের প্রকৃত নৃপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন না। তাহারা স্বদেশের রাজাকে ইমাম, কালিফ বলিয়া মানিতেন। রাজা আলীর বংশাবতংশ, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তদ্‌বিরুদ্ধাচরণ মহাপাপ বলিয়া ওমরাওগণের ধারণা ছিল। এই জন্য এই উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত কতকগুলি পাঠান সৈন্যও মোগলসম্রাটগণ প্রতিপালন করিতেন। মোগল ব্যতীত অন্য যে সকল জাতির সৈন্য ছিল, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে সম্রাটের আশা ভরসার স্থল ছিল। এই সকল বিজাতীয় সৈন্যদিগের নানা শ্রেণীবিভাগ ছিল। তাহারা প্রধানতঃ দুই বিভাগে বিভক্ত, পদাতিক ও অশ্বারোহী। প্রথম দল সাম্রাজ্যের নানা অংশে নিযুক্ত থাকিত, অপর দল সদাসর্ব্বদা সম্রাটের সন্নিকটে সংরক্ষিত হইত। সম্রাটের নিকট যে অশ্বারোহিগণ অবস্থান করিত তাহারা আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম ওমরাও, তারপর মনসবদার, তার নীচে রোসিনদার এবং সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীতে সাধারণ অশ্বারোহী। পদাতিক শ্রেণীতেও দুইটী বিভাগ ছিল,

সাধারণ পদাতিক, ইহারা সৈন্যদলের ফরমাইজ খাটিত এবং কামান রক্ষা করিত, দ্বিতীয় শ্রেণী এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সম্মানশালী ছিল।

মোগল দরবারের প্রত্যেক ওমরাহই যে সম্ভ্রান্তবংশীয় ছিলেন, তাহা নহে। বার্ণিয়ার বলেন, সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূভাগই মোগল সম্রাটের সম্পত্তি ছিল; তজ্জন্য ফ্রান্সের ন্যায় তথায় ডিউক, মারকুইস প্রভৃতি কোন ভূসম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিল না, যাহারা কেবল ভূমির উপস্বত্ব দ্বারা সুখ স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিত। বিশেষতঃ সম্রাট তাঁহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন, কাজেই কোন ঐশ্বর্য্যশালী পরিবার অধিক দিন স্বীয় ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিতে পারিত না। তজ্জন্য একজন সমৃদ্ধিশালী ওমরাহের পুত্র বা পৌত্র পিতার মৃত্যুর পরে ভিক্ষুকের অবস্থায় পতিত হইত এবং শেষে পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত অপর এক ওমরাহের অধীনে সাধারণ অশ্বারোহী শ্রেণীভুক্ত হইতে বাধ্য হইত। সম্রাট্ সচরাচর ঐরূপ ওমরাহের বিধবা পত্নী বা নাবালক পুত্রগণের প্রতিপালনের নিমিত্ত কিছু বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন।

এই ওমরাওগণের মধ্যে কেহ হাজারী, কেহ দোহাজারী, পেঙ্গ্, হেচৎ এবং দোহাজারী ছিলেন; অর্থাৎ কেহ এক সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়ক, কেহ দ্বিসহস্র, পঞ্চ সহস্র, সপ্ত সহস্র এবং দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি। সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র দোভজ্দে হাজারী অর্থাৎ দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়ক। তাঁহাদের বেতন অশ্বের সংখ্যা অনুসারে প্রদত্ত হইত, অশ্বের আরোহী সৈনিকের বাবদ কিছু পাইতেন না। দুইটী অশ্বের একজন আরোহী সৈন্য নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ওমরাওগণের ছিল এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই প্রকারই কার্য্য চলিত। ঐ সকল স্থানে একটী প্রবাদ ছিল,—"যে সৈনিকের একটী অশ্ব সে অর্দ্ধপদাতিকের বড়।" একটী সৈনিক পুরুষ দুইটী করিয়া অশ্ব ব্যবহার করিলেও, অধিপতিরা কেন যে এত অধিক অশ্ব রাখেন, বা কেনইবা সম্রাট দোভাজ্দে হেচৎ হাজারী অধিনায়ককে দ্বাদশ সহস্র ও সপ্ত সহস্র অশ্বের খরচ প্রদান করিতেন, তাহার নিহিতার্থ অনুমান করা সহজ নহে। সম্রাট প্রকৃত কার্য্যক্ষম অশ্বের সংখ্যানুসারে অধিনায়কগণকে বেতন প্রদান করিতেন, এত-

ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বহির্ভূত কতকগুলি অশ্বপালন করিত বলিয়া আরও কিছু বৃত্তি তাহাদের ধার্য্য ছিল। এই অতিরিক্ত বৃত্তিই অধিনায়কগণের উপস্বত্ব লাভ হইত। কারণ নির্দ্দিষ্ট অশ্ব প্রতিপালনের নিমিত্ত সরকার হইতে যাহা প্রদত্ত হইত, তদ্দ্বারা অশ্ব ও অশ্বারোহীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিত। কিন্তু এই 'অতি অল্প অবশিষ্ট' ও অতিরিক্ত যাহা প্রদত্ত হইত তাহা একত্র করিলে সংখ্যায় অল্প রহিত না। কেহ কেহ মুদ্রার পরিবর্ত্তে বিস্তর জমী জায়গীর প্রাপ্ত হইত। ডাক্তার বার্ণিয়ার বলেন যে, তিনি মোগল সাম্রাজ্যে অবস্থান কালে যাহার অধীনে কার্য্য করিতেন তিনি পেঞ্চহাজারী বা হাজার সেনার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার কোন জায়গীর ছিল না, তিনি 'নগদী' ছিলেন অর্থাৎ প্রতি মাসে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অর্থ পাইতেন। বার্নিয়ার দেখিয়াছেন যে, এই পাঁচ হাজার অশ্বের ও অশ্বারোহীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও পূর্ব্বোক্ত অধিনায়ক মাসে প্রায় পাঁচ হাজার ক্রাউন সঞ্চয় করিতেন। কিন্তু এই প্রকার মোটাভাতা পাইলেও তৎকালে কোন ধনী অধিনায়ক ছিল না, অধিকাংশেরই অবস্থা অসচ্ছল ও অনেকেই ঋণগ্রস্ত। তাহাদের এইরূপ দুরবস্থার কারণ এই যে, প্রত্যেকেই স্বীয় পদমর্য্যাদানুযায়ী বৎসরে একদিন সম্রাটকে মূল্যবান্ উপহার প্রদান করিতে বাধ্য হইত। এতদ্ভিন্ন নিজের পুত্র পরিবার, সংখ্যাহীন দ্বারবান, চাকর প্রভৃতি প্রতিপালন এবং স্বকীয় তত্ত্বাবধানে বহুতর মূল্যবান উষ্ট্র ও অশ্ব রক্ষা করিত।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ও রাজধানীতে যে সমুদয় ওমরাও থাকিতেন, সর্ব্বসমেত তাহাদের সংখ্যা কত ছিল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা দুরূহ। তবে সম্রাট দরবারে প্রায় নিয়তই এক হাজার হইতে বারোহাজারী সেনাপতি ২৫।২০ জন অবস্থান করিতেন। এই সকল ওমরাওগণ ক্রমে রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্য পদে উন্নীত হইতেন। ইঁহারাই তখন রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ হন, দরবারের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করেন। তখন তাঁহারা বিদেশে যান না, বহুমূল্য পরিচ্ছদাদিতে বিভূষিত হইয়া কখন অশ্বারোহণে, কখন গজারোহণে, কখন পাল্কীতে অথবা আরাম-কেদারায় চাপিয়া বহু সংখ্যক শরীররক্ষক অশ্বারোহী সহ যাতায়াত করেন।

তাঁহাদের অগ্রে ও পার্শ্বে বহুতর পদাতিক সৈন্য পথের জনকোলাহল অপসৃত করিতে করিতে কীট মক্ষিকাদি বিদুরিত ও ময়ূরপুচ্ছের পাখা দ্বারা ধূলি নিবারণ করিতে করিতে অগ্রসর হয়। তৎসঙ্গে কেহবা পানীয় জল ভাণ্ড, কেহ বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্কন্ধে করিয়া চলিতে থাকে।

যে সকল ওমরাওগণ দরবারে অবস্থান করেন, তাঁহারা প্রত্যহ দুইবার সম্রাটকে কুর্নিস না করিলে দণ্ডিত হইতেন। প্রাতঃকালে ১০।১১ টার সময় সম্রাট যখন বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তখন একবার, এবং বৈকালে ছয়টার সময় একবার অভিবাদন করিতে হইত। তাঁহারা সপ্তাহে একদিন পালাক্রমে, প্রাসাদে প্রহরীর কার্য্য করিতেও বাধ্য হইতেন। এই সময় তাঁহারা বিছানা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রাসাদে লইয়া যাইতেন, সরকার হইতে কেবল আহারীয় পাইতেন। এই খাদ্য তাঁহারা সম্রাটের প্রাসাদের দিকে ফিরিয়া মাটীতে হস্ত দিয়া তাহা মস্তকে স্পর্শ করতঃ তিনবার অভিবাদন করিয়া গ্রহণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন সম্রাট যে কোন সময়ে, শীত গ্রীষ্ম যে কোন ঋতুতে যুদ্ধক্ষেত্রে, শিকারে, সৈন্যপরিদর্শনে, কি অন্য যে কোন স্থানে গজে, আরাম-কেদারায়, কি চৌদ্দলায় আরোহণে গমন করিতেন, ওমরাওগণকেও সেই সময় অশ্বারোহণে তাঁহার অনুগমন করিতে হইত।

চৌদ্দলা আট জন লোকে স্কন্ধে বহন করিত এবং আর আট জন বাহক তাহাদের সাহায্যার্থে সঙ্গে থাকিত। আরোহীকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উহার উপরে আচ্ছাদন থাকিত। বার্দ্ধক্য কি পীড়াবশতঃ বা কোন উচ্চ পদের সম্মান রক্ষার্থ বা শিকারের কষ্ট সহনে অপটু এমন যে সকল ওমরাওগণকে সম্রাট অব্যাহতি দেন, তাহারা ব্যতীত অপর সকল ওমরাওই সম্রাটের সহিত এইভাবে অনুগমন করিতে বাধ্য। সম্রাট যখন কোন প্রমোদভবনে বা মসজিদে গমন করেন তখনও অব্যাহতিপ্রাপ্ত ওমরাওগণ তাঁহার অনুসরণ করেন না, পূর্ব্বোক্ত ওমরাওরাই সমস্ত দিন সম্রাটের প্রহরায় নিযুক্ত থাকেন।

সৈন্য-বিভাগে দ্বিতীয় সম্মানীয় পদ ওমরাওের নীচেই—মনসবদার, ইহাঁরা

ক্ষুদ্র ওমরাওরূপে পরিগণিত হইতেন এবং পদের মর্য্যাদানুরূপ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। ইঁহারা সম্রাট ভিন্ন অন্য কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না এবং ওমরাওগণকে যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে হইত, ইহারাও সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইহাদের অধীনে অপর অশ্বারোহী সৈন্য থাকিলে, ইহাদিগকেও ওমরাও নাম অভিহিত করা যাইত। মনসবদারগণের অধীনে অপর অশ্বারোহী থাকিত না, কেবল নিজের ব্যবহারের জন্য সম্রাটের চিহ্নযুক্ত দুইটি, কি ছয়টি অশ্ব পাইতেন এবং তাহাদের বেতন মাসিক দুইশত হইতে ছয় শত, বড় জোর শত শত টাকা হইত। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না, তবে ওমরাওগণ অপেক্ষা ইহারা সংখ্যায় অধিক ছিল এবং দুই তিন শত মনসবদার প্রতি নিয়তই দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত সম্রাটের নানা স্থলে বহুতর মনসবদার এবং সৈনিকপুরুষ সেনাবিভাগ নিয়োজিত থাকিত।

তৎপর রোজিনদার অর্থাৎ রোজ (দিন) হিসাবে বেতন প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। ইহারাও এক শ্রেণীর অশ্বারোহী সৈন্য। রোজ হিসাবে ইহাদের কেহ কেহ অনেক মনসবদার অপেক্ষা অধিক বেতন পাইত, কিন্তু তৎতুল্য সম্মানলাভে সক্ষম হইত না। মনসবদারের ন্যায় ইহারা প্রাসাদের পুরাতন গালিচা, বিছানা প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য হইত না। ইহাদের সংখ্যা বিপুল, ইহারা প্রথমে কেরাণী, মহুরী, জমাদার প্রভৃতি নীচ কার্য্যে নিযুক্ত হইত।

সাধারণ অশ্বারোহী।—ইহারা ওমরাওের অধীনে কার্য্য করিত। যাহারা দুইটী অশ্বের আরোহী হইত, তাহারাই বেশী বেতন পাইত ও প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত। দুই অশ্বের আরোহী সৈনিকের পদে ওমরাওগণের পদের চিহ্নের অনুরূপ চিহ্ন থাকিত। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল না, প্রধানতঃ ওমরাওগণের বদান্যতার উপরই নির্ভর করিতে হইত। তিনি যাহাকে যে নজরে দেখিতেন, তাহাকে সেইরূপ বেতন প্রদান করিতেন। তত্রাচ সম্রাটের অভিপ্রায় ছিল যে, সাধারণ অশ্বারোহীর বেতন মাসে পঁচিশ টাকার কম না হয়।

পদাতিক সৈন্যের বেতন সর্ব্বাপেক্ষা কম, কেহ মাসে দশ টাকা, কেহ পনর টাকা, কেহ বা বড় জোর কুড়ি টাকা পাইত। কিন্তু কতিপয় গোলন্দাজের

(যাহারা গোলা দাগে) অধিক বেতন ছিল; বিশেষতঃ গোয়ার ইংরেজ ও ডচ্ কোম্পানী হইতে যে সকল ফিরিঙ্গী অর্থাৎ ক্রিশ্চিয়ান পর্তুগীজ, ইংলিশ, ডচ্, জর্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি সৈনিক পলাইয়া আসিয়া মোগল-সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা অধিক বেতন পাইত। মোগলেরা যেপর্য্যন্ত সুন্দররূপে কামান ব্যবহার করিতে সক্ষম না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত এই সকল ফিরিঙ্গিদের মধ্যে কেহ কেহ মাসে দুইশত টাকাও বেতন পাইয়াছে, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সময় তাহাদের একজনের বেতনও বত্রিশ টাকার উদ্ধ ছিল না।

মোগলদের কামান ও যুদ্ধাস্ত্র সমূহ দুই প্রকারের ছিল, এক প্রকার গুরু-ভারবিশিষ্ট বৃহৎ ও অপর প্রকার হাল্কা। একবার ঔরঙ্গজেব কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া গ্রীষ্মকাল কাশ্মীরে অতিবাহিত করিবার মানসে, সমস্ত সেনাদলসহ, স্থানে স্থানে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃষ, শূকর প্রভৃতি বন্যজন্তু সমূহ শীকার করিতে করিতে গন্তব্য স্থলাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সময় তাঁহার সেনাদলের সঙ্গে ৭০টী এরূপ বৃহৎ কামান ছিল যে, তাহা বহন করিতে প্রায় দুই তিন শত উষ্ট্রের প্রয়োজন হয়। হাল্কা কামানগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর এবং সহজে তাহা ব্যবহার করা যায়। দুইটী অশ্বে ইহার একটী অবাধে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিত। বৃহৎ কামানগুলি সমস্ত পথ সম্রাটের অনুসরণ করিতে পারে না, কারণ তিনি শীকারের অনুরোধে প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া সময় সময় ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া অগ্রসর হন। কিন্তু হাল্কা কামানগুলি সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। প্রত্যূষে সম্রাট যখন শীকারে যাত্রা করিতেন, দুইটী অশ্ব সংযুক্ত একখানি শকট গাড়ীতে এই ছোট কামানগুলি তৎ-পশ্চাৎ প্রধাবিত হইত। সোজা রাস্তা ছাড়িয়া সম্রাট্ বক্র অপ্রশস্ত পথে কোন পশুর পশ্চাৎ ধাবিত হইলে, কামান-শকটগুলি সোজা পথে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া সম্রাটের অবস্থানের আড্ডার নিকট পূর্ব্বেই হাজির হইয়া থাকিত। তার পর সম্রাট শিবিরে প্রবেশ করিলে, এই কামানসমূহ এককালে গর্জ্জন করিয়া তাহাদের উপস্থিতির সংবাদ জ্ঞাপন করিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল

# স্যর উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষা।

ভারতে ইংরাজ অধিকারের প্রথম অর্দ্ধশতাব্দীতে যে সকল মনস্বী রাজপুরুষ অসাধারণ অধ্যবসায়সহকারে সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞানলাভ করিয়া নিজ নিজ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর বিস্ময় ও প্রশংসার স্থল হইয়াছিলেন, স্যর উইলিয়ম জোন্স তাঁহাদেরই অন্যতম। নিজ জন্মভূমি হইতে শত সহস্র ক্রোশ দূরে, অপরিজ্ঞাত দেশে ভিন্ন ভাষা-ভাষী অচেনা লোকের মধ্যে, অসংখ্য প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুদ্ধ করিয়া, কত কষ্টে, কত অসুবিধায় তিনি সংস্কৃত ভাষায় সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তৎকালে এতদ্দেশীয় জনগণই বা ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুশাসন বাক্য ও সমাজশাসনের প্রতি কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা দেখাইবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

স্যর উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি রূপে ভারতে পদার্পণ করেন। ভৃত্যবর্গের সহিত কথোপকথন করিবার জন্যই তিনি প্রথমে একটু হিন্দুস্থানী শিক্ষা করেন। এদেশে সংস্কৃতের আদর দেখিয়া স্যর উইলিয়ম সংস্কৃত শিক্ষার অভিপ্রায়ে একজন অধ্যাপকের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া কোন ব্রাহ্মণই ম্লেচ্ছকে দেবভাষা শিক্ষা দিতে সাহসী ছিলেন না। তদানীন্তন কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শিবচন্দ্র স্যর উইলিয়মের বন্ধু ছিলেন, তিনিও বন্ধুর জন্য অধ্যাপক সংগ্রহের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাজের চেষ্টা বা স্যর উইলিয়মের বিজ্ঞাপিত মোটা বেতনেও কোন ফল হইল না। মোটা বেতনের প্রলোভনে দু একটি পণ্ডিত গোপনে স্যর উইলিয়মের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন—তাঁহাদের প্রতিবেশিগণ ইহা অবগত হইয়া সামাজিক শাসনের

ভয় দেখাইলে, একঘরে হইবার ভয়ে অধ্যাপকগণ আর স্যর উইলিয়মের বাটীর ত্রিসীমা মাড়াইতেও সাহস পাইলেন না। স্যর উইলিয়ম নিজেই বাঙ্গালার সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপে গিয়া অধ্যাপকগণের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন অধ্যাপকই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধান, অনেক চেষ্টার পর রামলোচন কবিভূষণ নামক একজন বৈদ্যজাতীয় সুশিক্ষিত পণ্ডিত মাসিক ১০০৲ শত টাকা বেতনে স্যর উইলিয়মকে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদানে প্রস্তুত হইলেন।

রামলোচন হাওড়ার নিকটবর্ত্তী সালাখিয়াবাসী ছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের উপর। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কিছুই ছিলনা, সংসারে তিনি মাত্র একাকী, সুতরাং তিনি একঘরে হইবার ভয় বড় রাখিতেন না। ইহা ব্যতীত তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। পাড়া প্রতিবেশীরা রোগ পীড়ায় তাঁহাকেই ডাকিত—তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা ভক্তিও যথেষ্ট ছিল। সুতরাং স্যর উইলিয়মকে সংস্কৃত শিক্ষা দিলেও লোকে তাঁহাকেই ডাকিবে এ ভরসা তাঁহার খুব ছিল। নির্দ্দিষ্ট বেতন ব্যতীত সালাখিয়া হইতে স্যর উইলিয়মের বাসা খিদিরপুর এবং খিদিরপুর হইতে সালখিয়া যাতায়াতের পাল্কী ভাড়া পাইবেন এই বন্দোবস্তে কবিভূষণ অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন।

কবিভূষণ মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাই অধ্যাপক ও অধ্যয়নার্থীর মধ্যে নিম্ন লিখিত ৮টী সর্ত্তের কথা হয়—

১। একটী একতল গৃহে অধ্যাপনার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে।

২। পাঠাগারের মেঝে নর্ম্মর প্রস্তরাবৃত করিতে হইবে।

৩। পাঠাগারের মেঝে ও দেওয়াল (যতদূর হাতে পাওয়া যায় ততদূর) প্রতিদিন গঙ্গাজল দ্বারা মার্জ্জনা করিবার জন্য একজন হিন্দু ভৃত্য নিযুক্ত করিতে হইবে।

৪। কাষ্ঠাসন ব্যতীত অন্য কোন আসন পাঠাগারে ব্যবহৃত হইবে না এবং ঐ কাষ্ঠাসন গুলিও প্রতিদিন গঙ্গাজলে ধৌত করিতে হইবে।

৫। প্রাতঃকালেই অধ্যাপনার সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

৬। নির্দ্দিষ্ট পাঠ-সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে এক পেয়ালা চা ভিন্ন অধ্যয়নার্থী আর কিছুই পান করিতে পারিবেন না।

৭। গোমাংস শূকর মাংস কিংবা কাঁটা, চামচ প্রভৃতি পাঠাগারে নিষিদ্ধ হইবে।

৮। অধ্যাপকের ব্যবহারের জন্য পাঠাগারের নিকটবর্ত্তী গৃহটীও প্রত্যহই গঙ্গাজলে মার্জ্জন করিতে হইবে। এই গৃহে এক প্রস্থ কাপড় রক্ষিত হইবে; পাঠাগারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অধ্যাপক নিজ কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া এই কাপড় পরিধান করিবেন; আবার বাড়ী আসিবার সময় এই কাপড় রাখিয়া নিজ কাপড় পরিধান করিয়া আসিবেন।

জ্ঞানপিপাসু অধ্যয়নার্থী অধ্যাপকের এ আবদারে সম্মত হইলেন—কবিভূষণ মহাশয়ও স্যর উইলিয়মের শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

পাঠারম্ভ কালে স্যর উইলিয়ম সংস্কৃতের কিছুই জানিতেন না, আবার অন্যদিকে তাঁহার অধ্যাপক কবিভূষণ মহাশয়ও ইংরাজী ভাষার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন—স্যর উইলিয়ম যে একটু হিন্দুস্থানী শিখিয়াছিলেন পরস্পরের মধ্যে তাহার সহায়তায়ই কথাবার্ত্তা চলিত। যাহা হউক অধ্যাপক ও অধ্যয়নার্থী উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে এক বৎসরের মধ্যেই স্যর উইলিয়ম সহজ সংস্কৃতে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম সংস্কৃতশিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ্যের লিঙ্গ ও ক্রিয়ার বিভক্তি শিক্ষা করিতেই বিশেষ বেগ পাইতে হয়। স্যর উইলিয়ম সর্ব্বপ্রথম ক্রিয়া ও বিভক্তির তালিকা করিয়াই ধাতু রূপ শিখিতে আরম্ভ করেন, ইহাই আমাদের অনুমান হয়। কিন্তু তিনি ঠিক কোন্ প্রণালীতে উহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য ক্রমে বহু অনুসন্ধানেও তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

একদিন অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত কথা প্রসঙ্গে স্যর উইলিয়ম সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্য কাব্যের অস্তিত্ব অবগত হয়েন। সহরের ধনীদিগের গৃহে যে নাট্যাভিনয় হইত, কলিকাতায় সেকালের ইংরাজ অধিবাসিবর্গের নিকট তাহা অবিদিত ছিল না। কবিভূষণ মহাশয়ও তাহা জানিতেন। এই নাট্যাভিনয়

প্রসঙ্গের আলোচনাকালে কবিভূষণ মহাশয় স্যর উইলিয়মকে বলেন যে, একালের ন্যায় সেকালেও ভারতীয় রাজা, মহারাজ ও ধনিবৃন্দের দরবারে নাট্যাভিনয় হইত। এই হইতেই স্যর উইলিয়ম সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য অধ্যয়নে করিতে আগ্রহান্বিত হয়েন। প্রথমেই তিনি মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নামক নাটক অধ্যয়ন করেন। উত্তর কালে, স্যর উইলিয়ম পদ্যে গদ্যে এই নাটকেরই এক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে অধ্যাপক কবিভূষণ মহাশয়ের স্বভাব কিছু খিটখিটে রকমের হইয়াছিল। বিশেষতঃ তিনি টোলের ধরণেই ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন, তাহাতে কোন কোন সময় কোন কথা ভাল রূপে না বুঝিতে পারিয়া স্যর উইলিয়ম দ্বিতীয়বার সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অধ্যাপক বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিতেন "ও, এ অতি জটিল প্রশ্ন গরুখোরের পক্ষে ইহা ঠিক বুঝা অসম্ভব।" স্যর উইলিয়ম নিজ অধ্যাপককে বিশিষ্টরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, তাই প্রাচীন অধ্যাপকের এ কঠিন তিরস্কারেও তিনি বিন্দু মাত্র ক্ষুব্ধ হইতেন না।

অধ্যাপক কবিভূষণ মহাশয় ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত জীবিত ছিলেন। ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু তিনি স্মার্ত্ত বা দার্শনিক ছিলেন না, সুতরাং ব্যাকরণ ও কাব্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্যর উইলিয়ম যখন স্মৃতি ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইল। এ সময় দেশের লোকে অনেকটা উদার ভাবাপন্ন হইয়াছিল, সুতরাং স্মৃতির অধ্যাপক খুঁজিয়া লইতে স্যর উইলিয়মকে এবার আর অধিক বেগ পাইতে হয় নাই।*

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

* ১৯০৭। জুন সংখ্যা Hindusthan Review" পত্রিকায় প্রকাশিত Sir William Jones. How he learnt Sanskrit." শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

# বৌঠাকুরাণীর হাট।

১

সুন্দরবনের একটি স্ফীতকলেবর নদী বাহিয়া একখানি বজরা ও কয়েকখানি নৌকা যাইতেছিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যের শেষছটা অরণ্যানীর শ্যামাঞ্চলে লুকাইবার চেষ্টা করিয়া শেষে আকাশের কোলে ঢলিয়া পড়িল। সহসা নদীর বক্ষে কে যেন তপ্ত সোনা ঢালিয়া দিল। পরক্ষণে প্রকৃতির সেই স্বর্ণরাগ মুছাইয়া গেল, এবং অন্ধকার আপনার কজ্জলরাশি আনিয়া বিশ্বশোভাকে আবৃত করিয়া ফেলিল। পাখীগুলি কলরব করিয়া পত্ররাশির অন্তরালে আশ্রয় লইল। ক্রমে দুই একটি হিংস্র জন্তুর শব্দ নিবিড় অরণ্যকে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। অরণ্যানীর শ্যামলতা গাঢ় কালিমায় পরিণত হইল, নদীর জলও যেন মসীস্রোত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে দুই একটি উজ্জ্বল তারকা সুদূর আকাশপথ হইতে আপনাদের ক্ষীণ রশ্মি ছড়াইয়া জীবজন্তুর হৃদয়ে যেন অভয়প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। নদীগর্ভে সেই ক্ষীণরেখা প্রবেশ করিয়া লুক্কায়িত রজতযষ্টি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইতে লাগিল।

রজনী উপস্থিত দেখিয়া বজরা ও নৌকার আরোহিগণ কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বজরার মধ্য হইতে রমণীকণ্ঠে ধ্বনি হইল,—

"মাধবমল্ল বজরা বাঁধিবার কি উপায় করিতেছ, রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে।"

বজরার বহির্ভাগ হইতে একজন পুরুষ উত্তর দিল,

"মা, আমি নিশ্চিন্ত নহি, এখনই তাহার উপায় করিতেছি।"

এই কথা বলিয়া পুরুষটি বজরার ও নৌকার মাঝিদিগকে একটি নিরাপদ স্থানে নঙ্গর করিবার জন্য আদেশ দিল। মাঝিরা বলিয়া উঠিল,

"কর্ত্তা, বনের মধ্যে ভাল জায়গা কৈ? তখনি বলেছিলেম যে বেশী এগুলেই বড় বনের মধ্যে পড়তে হবে, আপনারা তাতে কান কল্লেন না।"

সে যা হবার তা হয়েছে, এখন এর নিকটে কোন ভাল জায়গায় নঙ্গর কর।"

"তা সব জায়গাইত সমান, আঁধারে আর নড়ে চড়ে কি হবে? এই বড় গাছতলায় নঙ্গর ফেলছি।"

এই কথা বলিয়া বজরার মাঝিরা একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলে নঙ্গর করিল। অন্যান্য নৌকাও তাহার নিকটে রহিল।

পুনর্ব্বার সেই রমণীকণ্ঠে শব্দ হইল,

"এই নিবিড় বনে কি শেষে রাত্রি যাপন করিতে হইবে?"

"পুরুষটি উত্তর করিল,

"কি করিবেন মা, সুন্দরবনের মধ্যে গ্রাম, নগর কৈ? যাহা দুই একটি আছে, বহু দূরে দূরে, দুই এক দিনের পথ ব্যবধানে, কাজেই অনেকদিন আমাদিগকে এইরূপে বনের মধ্যেই রাত্রি কাটাইতে হইবে।"

"মা যশোরেশ্বরীর মনে যাহা আছে তাহাই হইবে। এখানে কোন ভয়ের কারণ নাই ত?"

"কি করিয়া বলিব মা, সুন্দরবনের সর্ব্বত্রই এখন বিভীষিকাময়! যেদিন হতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য চির-অস্তমিত হয়েছেন, সেদিন হতে সুন্দরবনের সর্ব্বত্রই বিভীষিকার অন্ধকার ছাইয়া ফেলিয়াছে।"

"তবে কি আবার মগ ফিরিঙ্গীর উপদ্রব বাড়িয়াছে?"

"অধিকপরিমাণে। প্রতাপাদিত্যের শাসনে যে সুন্দরবন তপোবনতুল্য ছিল, এক্ষণে আবার তাহা প্রকৃতই হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়া উঠিয়াছে। মগ ফিরিঙ্গীর উপদ্রবে গ্রামনগরও ধ্বংসমুখে পড়িতেছে।"

ইহাদিগকে দমন করিতে বাঙ্গলায় কি দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই?"

"আর একজন আছেন, আমরা এখন তাঁহারই নিকট যাইতেছি। চলুন দেখি, তিনি কি মনে করিতেছেন।"

"রাত্রিতে সকলকে সতর্ক থাকিতে বলিও।"

"ভৃত্য সে বিষয়ে সাবধান আছে।"

বজরা ও নৌকার আরোহিগণ যৎসামান্য আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া অবশেষে শয়ন করিল। মাধবমল্ল ও তাহার সহচরগণ সশস্ত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিল। প্রদীপের ক্ষীণালোক ক্রমে আরও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সহসা বজরার নিকটে একটি বন্দুকের শব্দ হইল। মাধবমল্লের ইঙ্গিতে তাহার একজন সহচর হস্তস্থিত বন্দুকের ধ্বনিতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। বজরা ও নৌকার আরোহী পুরুষ ও স্ত্রীগণ ভয়ে কোলাহল করিয়া উঠিল।

বজরামধ্যস্থ রমণী বলিয়া উঠিলেন,—

"একি, বন্দুকের শব্দ কেন?"

মাধবমল্ল উত্তর করিল,

"স্থির হউন মা, ব্যস্ত হইবেন না, একটু পরেই সমস্ত জানিতে পারিবেন।"

তাঁহাদের কথোপকথন শেষ হইতে না হইতে বজরার পার্শ্বে ঘন ঘন দুই চারিবার বন্দুকের শব্দ হইল। বজরা হইতে মাধবের সহচরগণও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিল। কিছু পরে বজরার পার্শ্ব হইতে অস্পষ্ট বাঙ্গলা ভাষায় শব্দ হইল,—

"এ বজরা কার?"

মাধবমল্ল উত্তর করিল,

"তাতে প্রয়োজন?"

"দরকার আছে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে।"

"আমরা বলিব না।"

"তবে আমরা বজরায় পড়িব।"

"সাধ্য থাকে অগ্রসর হও, যদি আর এক পা বাড়াও, তা'হলে বন্দুকের গুলিতে মাথা ফুটাইয়া এই নদীর জলে ফেলিয়া দিব।"

মাধবের কথা শেষ হইতে না হইতে বজরার উপর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। মাধব ও তাহার অনুচরগণ প্রতিবর্ষণ করিয়া বিপক্ষদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তাহাদের মধ্য হইতে আবার কে বলিয়া উঠিল।

"কার বজরা বলিলেই আমরা ক্ষান্ত হইব।"

"আমরা কিছুতেই বলিব না।"

"প্রতাপ রাজা ও তাহার সেনা ছাড়া আর কাহারা এমন বন্দুক ছাড়িতে পারে?"

"রুডার শিষ্য এখনও অনেক বাঁচিয়া আছে।"

মাধবমল্ল প্রতাপাদিত্যের গোলন্দাজ সেনাপতি রুডার নিকট বন্দুকচালনা শিক্ষা করিয়াছিল বলিয়া ঐরূপ উত্তর দিয়াছিল।

"তবে কি তোমরা প্রতাপ রাজার লোক ও রুডার কাছে বন্দুক চালাইতে শিখিয়াছ।"

"তাহাই মনে করিয়া এক্ষণে স্বস্থানে চলিয়া যাও।"

"যদি তাহাই হয়, তবে আমরা ফিরিয়া যাইতেছি ও তোমাদিগকে সেলাম করিতেছি।"

"তোমাদের কি কোন পরিচয় পাইতে পারি না।"

"আমাদের আর পরিচয় কি? আমরা রুড়ার স্বজাতি বটে, তোমাদিগকে সেলাম, আমরা চলিলাম।"

এই বলিয়া তাহারা যে নৌকায় বজরার নিকট আসিয়াছিল, ক্ষেপণীযোগে তাহাকে দ্রুত চালিত করিয়া নিমেষমধ্যে তথা হইতে অন্তর্হিত হইল।

বজরা মধ্য হইতে রমণী বলিতে লাগিলেন,

"তাহারা কি সত্য সত্যই চলিয়া গেল?"

"প্রতাপাদিত্যের সংস্রবের কথা শুনিয়া কাহার সাধ্য তিল মাত্র অপেক্ষা করিতে পারে?"

সেই সময়ে চন্দ্রোদয় হওয়ায় নদীবক্ষ আলোকের ছটায় ভরিয়া গেল। মাধবমল্ল বলিল,

"মা আপনার যদি কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বার খুলিয়া চাঁদের আলোকে দেখুন তাহারা কত দ্রুত পলাইয়া যাইতেছে!"

রমণী দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া দাসী ও সহচরীগণসহিত চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত

নদীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি আচ্ছাদনশূন্য নৌকা অনেকগুলি দাঁড়ের চালনায় দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"উহা কা'দের নৌকা।"

"উহারা ফিরিঙ্গী, কারণ তাহারা আপনাদিগকে রুডার স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।"

"এই সমস্ত দস্যুর কি দমন হইবে না?"

"জামাতা মহারাজের নিকট এই সমস্ত নিবেদন করিব, দেখি তিনিই বা কি করেন। প্রতাপাদিত্যের পর সমস্ত বাঙ্গালা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।"

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন— "আমিওত সেই মুখের দিকে চাহিয়া পোড়াজীবন ধারণ করিয়া আছি। নতুবা পিতা, মাতা, ভ্রাতার পথানুসরণ করিলাম না কেন? মা যশোরেশ্বরি, তোমার মনে কি আছে কেমন করিয়া বলিব।"

পাঠক এই রমণীরত্নের পরিচয় পাইয়াছেন কি? ইনি প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতী! প্রতাপের পতনের পর অন্ধকারময় যশোর পরিত্যাগ করিয়া স্বামী রামচন্দ্র রায়ের চরণচুম্বনের জন্য বাকলা যাত্রা করিয়াছেন।

প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ পত্ররাশি ও নদীবক্ষে পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। পক্ষিগণের কলরবে ও পক্ষসঞ্চালনে অরণ্যানী মুখরা হইয়া উঠিল। দুই একটি বানর নানারূপ মুখভঙ্গি করিয়া লম্ফপ্রদানে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতেছিল। দুই একটি গণ্ডার বেত্রবনের মধ্য হইতে মুখ বাহির করিতে লাগিল। নদীবক্ষে কুম্ভীর ও শুসক গা ভাসাইয়া আবার পরক্ষণে ডুবিয়া গেল। মাঝিরা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া নঙ্গর তুলিয়া 'বদর বদর' বলিতে বলিতে বজরা ও নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বিন্দুমতী বলিলেন,

"মাধবমল্ল আজ কি কোন গ্রাম পাইব না?"

মাধব উত্তর দিল,

"বলিতে পারি না মা, দেখি আজ কতদূর নৌকা চলিতে পারে। পূর্ব্বে আমি অনেকবার এই সকল স্থানে বেড়াইয়াছি। সুন্দরবনের কোন স্থানই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অনুচরের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু এখন যেন কেমন ভ্রম জন্মিয়াছে। মাঝিরা বলিতে পারিস্ নিকটে কোন গ্রাম আছে কি না?"

মাঝিরা উত্তর করিল,

"এখানে গাঁ কৈ? আজকার পুরাদিন না বাহিলে তবে গাঁ পাইব।"

বিন্দুমতী কহিতে লাগিলেন,

"আমরা তবে নিবিড় বনের মধ্যে পড়িয়াছি।"

মাঝিরা বলিল,

"হাঁ মা তাই বটে।"

তাহার পর নৌকা চলিতে লাগিল। বিন্দুমতী সুন্দরবনের শ্যামল শোভা দেখিতে দেখিতে কতক আশা কতক নিরাশাপূর্ণ হৃদয়ে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি রাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা, সোনার যশোরে লালিত পালিত হইয়া দেবী যশোরেশ্বরীর সেবায় এতদিন কাটাইয়াছিলেন। স্বাধীনতারক্ষার জন্য যশোরাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্য বাদসাহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইয়া পথিমধ্যে বারাণসীধামে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন! তাঁহার উপযুক্ত পুত্র উদয়াদিত্য প্রভৃতি যুদ্ধস্থানে চিরদিনের জন্য শায়িত। প্রতাপমহিষী অন্যান্য স্ত্রীগণসহ যমুনার নীলগর্ভে চিরদিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছেন। কাজেই বিন্দুমতীর হৃদয় অশান্তিপরিপূর্ণ, ঐ অশান্তির মধ্যে তাঁহার জীবনে একটু আশা ছিল, সে কেবল স্বামী রামচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে স্নেহলাভ। কিন্তু তাহাতেও নিরাশার ছায়া সর্ব্বদা সঞ্চারিত হইতেছিল। রামচন্দ্র বাকলা—চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের ও সমাজের একাধীশ্বর, তিনি অল্পবয়স্ক, প্রতাপ তাঁহাকে নিহত করিয়া বাকলা অধিকারের ইচ্ছা করেন। রামচন্দ্র

তখন যশোরে ছিলেন। বিন্দুমতীর মুখে তিনি তাহা শুনিয়া আপনার সেনাপতি রামনারায়ণ মল্লের সাহায্যে যশোর হইতে কৌশলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। তদবধি তিনি প্রতাপাদিত্যের নামও করেন নাই, বিন্দুমতীরও কোন সংবাদ লয়েন নাই। বিন্দুর মনে তাই নিরাশার ছায়া পড়িয়াছিল, পাছে স্বামী পিতার দোষে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রতাপের পতনের পর বিন্দুমতী অনেকদিন অপেক্ষা করিয়া শেষে নিজেই বাকলা যাত্রা করিয়াছেন। এক একবার তাঁহার মনে হইতেছে যে রামচন্দ্র তাঁহাকে পাইয়া নিশ্চয়ই প্রীত হইবেন। কারণ তিনিই রামচন্দ্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, কাজেই রামচন্দ্র তাঁহার কোন দোষ লইবেন না। আবার পরক্ষণে তাঁহার মনে হইতেছিল যে, অভিমানী রামচন্দ্র হয়ত পিতার দোষে তাঁহারও মুখদর্শন করিবেন না। এইরূপে আশার ও নিরাশার আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে স্থাপিত করিয়া বিন্দুমতী নিবিড় সুন্দরবন অতিক্রম করিতে করিতে বাকলার দিকে যাইতেছিলেন।

যশোর হইতে বাকলায় যাইতে তাঁহাদের অনেকদিন অতিবাহিত হয়। ইহার মধ্যে তাঁহারা নিবিড় বন, গ্রাম ও দুই একটি নগর অতিক্রম করিয়াছিলেন। স্বচ্ছসলিলপূর্ণ অনেক নদনদী বাহিয়া তাঁহাদিগকে বাকলায় উপস্থিত হইতে হয়। কোন স্থানে শ্যামল বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত নিবিড় অরণ্য, কোনস্থানে কণ্টকিত বেত্রবন। আবার কোথায় পরিষ্কৃত প্রান্তরে ধান্য ও ইক্ষুর চাষ। ক্ষুদ্র খালের উভয় তীরে সুন্দরী, কেওড়া, গুড়চাকা প্রভৃতি বৃক্ষ, তাহাতে মুখভঙ্গি করিয়া বানর ঝুলিতেছে। আবার বনের মধ্যে গণ্ডার ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে। নদীতে কুম্ভীরও মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে। বনের মধ্যে মধ্যে গ্রামের প্রান্তরে গাভীর দল চরিয়া বেড়াইতেছে। দুই একটি নগরের অট্টালিকাও দূর হইতে দেখা যাইতেছে। এইরূপে বহুদিন সুন্দরবনের মধ্যে কাটাইয়া তাঁহাদের বজরা বাকলায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাকলা হইতে কিছু দূরে বজরা পৌছিলে মাধবমল্ল কহিল,-

"মা, আমরা ত বাক্‌লার নিকট আসিয়াছি, এক্ষণে কি করিব বলুন, বজরা বাক্‌লায় যাইবে, না জামাতা মহারাজের নিকট সংবাদ পাঠাইব।"

বিন্দুমতী উত্তর করিলেন,

"এইখানে কিছুদিন অপেক্ষা করিব, বজরা বাকলায় যাইবে না, এবং তাঁহার নিকট সংবাদও পাঠাইব না।"

"তবে তিনি আপনার আগমনের কথা কেমন করিয়া জানিতে পারিবেন ?"

"যিনি রাজাধিরাজ, তাঁহার রাজ্যের মধ্যে বিশেষতঃ রাজধানীর নিকটে এতগুলি নৌকা কিজন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহার সন্ধান কি তিনি লইবেন না ? না লন, আমরা ফিরিয়া যাইব। মা যশোরেশ্বরীর মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।"

গদ্‌গদ কণ্ঠে বিন্দুমতী এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যদিও তিনি উপযাচিকা হইয়া স্বামীর নিকট আসিয়াছেন, তথাপি স্বামী তাঁহাকে লইতে না আসিলে তিনি যাইবেন না এবং প্রত্যাখ্যাত হইবার আশঙ্কাও তাঁহার মনে মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিতেছিল। বিন্দুমতীর কথা শুনিয়া তাঁহার ধাত্রী একজন প্রাচীনা পরিচারিকা বলিয়া উঠিল,—

"সেকি বিন্দু, জামাইকে খবর না দিলে সে নিতে আসবে কেন ? ওকি কথা বলছিস্।"

বিন্দুমতীর একজন সহচরী তাহার উত্তর দিয়া কহিল,

"তুই বুড়ী এর কি বুঝবি, মেয়ে মানুষ সেধে কি কখনও পুরুষের কাছে যায় ? আমরা এতদূর এসেছি এইই ঢের ; তখন দেখা যাক জামাই রাজার আক্কেলটা কেমন !"

বৃদ্ধা বলিল,

"কি জানি, তোদের রাগ রঙ্গ কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

সহচরী উত্তর দিল,

"বাহাত্তুরে হলে যুবকালের কথা কি মনে থাকে ?"

"আ মর ছুঁড়ি, আমার বাহাত্তুরে ধরবে কেন তোরই ধরুক।"

"আহা তবে তুমি ঘেটের কোলে আছ" বলিয়া সহচরী হাস্য করিয়া উঠিল।

বিন্দুমতী বলিলেন,—

"তোদের রহস্য এখন রাখ, এখন গভীর সমস্যায় পড়া গেছে।"

সহচরী বলিল,

"সমস্যা আর কি, আমরা এখান হতে কিছুতেই নড়বনা, কালাচাঁদ এসে আগে কিশোরীর পায়ে ধরবেন, তার পর যাওয়া না যাওয়া তাঁর সঙ্গে বোঝা পড়া যাবে।"

মাধবমল্ল বলিল,

"মা তবে সত্যসত্যই কি আমাদিগকে এখানে অপেক্ষা ক'রতে হবে।"

বিন্দুমতী উত্তর দিলেন,—"আমি সেইরূপ অভিপ্রায়ই করিয়াছি।"

"তবে আপনার আদেশই প্রতিপালিত হইবে।"

এই বলিয়া মাধবমল্ল মাঝিদিগকে তথায় নঙ্গর করিয়া অবস্থিতি করিতে আদেশ দিল।

সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া বিন্দমতী রামচন্দ্রের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন, দুইদিন, তিনদিন করিয়া দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু রামচন্দ্র আর তাঁহার নিকট আসেন না। বিন্দুমতী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "সত্যসত্যই কি তিনি আমার সংবাদ পান নাই, অথবা পাইয়া আমায় উপেক্ষা করিতেছেন।" শেষ কথা মনে করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। এদিকে তাহার সহিত অনেকগুলি নৌকা, ও বৃহৎ বজরা, আরোহী চালকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, তাহাদের আহার্য্য সামগ্রী যাহা সঙ্গে ছিল ফুরাইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহার সংগ্রহের জন্ত মাধবমল্ল তাঁহাকে জানাইতে লাগিল। তজ্জন্তও তিনি একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অগত্যা তীরে উঠিয়া লোকজনকে আহার সংগ্রহের জন্ত আদেশ দিলেন, তাঁহাদের অনেক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হওয়ায় লোকে তথায় ক্রমে আসিতে লাগিল। ক্রমে তথায় একটি হাট বসিল, সপ্তাহে

দুইবার করিয়া তথায় হাট বসিতে লাগিল। এত লোকের সমাগমেও রামচন্দ্র কোন সংবাদ লইতেছেন না কেন, ইহা ভাবিয়া বিন্দুমতী দিন দিন শুখাইতে লাগিলেন। পরে তিনি তথা হইতে স্থানান্তরে বজরা বাঁধিবার আদেশ দিলেন, এবং তথায় একটি প্রকাণ্ড দীঘী খনন করাইতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, ইহাতেও যদি রামচন্দ্র সংবাদ লন, কিন্তু রামচন্দ্র কোনই সংবাদ লইলেন না।

অবশ্য রামচন্দ্র যে বিন্দুমতীর সংবাদ পান নাই, এমন নহে। কিন্তু তিনি প্রতাপের দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া অভিমানভরে বিন্দুমতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। রামচন্দ্রের মাতার নিকট ক্রমে হাট বসা ও দীঘী-খননের সংবাদ পৌঁছিলে, তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, তাঁহার বধূ এই সমস্ত কীর্ত্তি আরম্ভ করিয়াছেন। যদিও রামচন্দ্রের অভিমানের কথা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তথাপি যে বধূ তাঁহার প্রাণসম পুত্রের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি পরিচারিকাসহিত নিজেই বিন্দুমতীর বজরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বজরায় আসিয়া পরিচারিকাটি বলিয়া উঠিল,—

"আমাদের বৌঠাকুরাণী কৈ গো ?"

বিন্দুর বৃদ্ধা ধাত্রী উত্তর দিল,

"তোমরা কে গা ?"

"আমরা রাজবাড়ী হতে এসেছি গো।"

তখন বিন্দুর সহচরী অগ্রসর হইয়া কহিল,—

"কি মনে করে গো ?"

"বৌ দেখতে।"

"কাদের বৌ ?'

"কেন, আমাদের রাজার বৌ।"

"তোমাদের রাজা কে গো ?"

"ওমা তুমি তাও জান না, কেন গো রামচন্দ্র।"

"তাঁর বৌ এখানে কোথায় ?"

"আর রঙ্গ কর্ত্তে হবে না, আমরা সব জেনেছি, এই দেখ তাঁর শাশুড়ী এসেছেন।"

বৃদ্ধা ধাত্রী বলিল,

"কৈ, রাজমাতা ?"

"হাঁ গো হাঁ" বলিয়া পরিচারিকাটি উত্তর দিল। তখন ধাত্রী "এই দেখ বাছা তোমাদের বৌ" বলিয়া রাজমাতা ও পরিচারিকাকে বিন্দুমতীর নিকট লইয়া গেল।

রাজমাতার আগমনে বিন্দুর শুষ্ক হৃদয়ে কে যেন আশাবারি ঢালিয়া দিল, তিনি মনে করিলেন যে, হয়ত রামচন্দ্র লজ্জায় আসিতে পারেন নাই, তাই মাকে পাঠাইয়াছেন। বিন্দু উঠিয়া এক পাত্র স্বর্ণমুদ্রা শ্বশ্রূর চরণতলে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। রাজমাতা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—

"চিরায়ুষ্মতী হও, ও সুপুত্রের মা হও।" শুনিয়া বিন্দুর হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল।

বৃদ্ধা ধাত্রী কহিল,

"সুপুত্তুরের মা ত হবে, কিন্তু সোয়ামীর সঙ্গে দেখা কৈ গো ?"

রাজমাতা বলিলেন।

"অবশ্যই তাহা হবে।"

পরিচারিকাটি বলিয়া উঠিল

"সেই জন্যেত আমরা এসেছি।"

"আহা তাই হোক" বলিয়া বৃদ্ধা নিঃশ্বাস ছাড়িল।

রাজমাতা বলিতে লাগিলেন,—

"মা, আমি তোমার সমস্ত কথা রামচন্দ্রের মুখে শুনেছি। তুমি তার জীবন রক্ষে করে আমারও জীবন বাঁচায়েছ। এমন মা লক্ষ্মীকে যদি ঘরে না নিয়ে যাই, তা হ'লে লোকে ধর্ম্মে কি ব'লবে ? তা মা, তুমি আমাদিগকে খবর দেও নাই কেন ?"

বিন্দুমতী নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

"কেঁদনা মা, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তুমি খবর না দিলেও, আমাকে ছাপাইবে কেমন করিয়া, চল আমার নৌকায় চল।" এই কথা বলিয়া রাজমাতা বিন্দুমতীর হাত ধরিয়া পরিচারিকাসহ নিজ নৌকায় উঠিলেন। নৌকা রাজবাটী অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিন্দুমতীর বজরা ও অন্যান্য নৌকা লোকজনসহ তথা হইতে নঙ্গর তুলিয়া ধীরে ধীরে রাজধানী বাকলায় উপস্থিত হইল।

৩

বাকলা রাজবাটীর একটি সুরম্য প্রকোষ্ঠে একখানি সুন্দর পর্য্যঙ্ক চতুষ্পদের উপর আপনার দেহ বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। পর্য্যঙ্কখানি সুন্দর হইলেও শুষ্ক, কারণ তাহা কাষ্ঠনির্ম্মিত, কাজেই তাহা আপনার শুষ্ক কলেবর একটি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আবৃত করিয়া যেন কাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তখন রাত্রিকাল, একটি প্রদীপ গৃহের কোণে লুকাইয়া যেন পর্য্যঙ্কের দিকে মিট মিট করিয়া চাহিতেছিল। দেখিতে দেখিতে একটি যুবাপুরুষ পর্য্যঙ্কোপরি বিস্তৃত শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন, অল্পক্ষণ পরে তিনি শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না। যুবক বারংবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যেন কি এক যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কিছুক্ষণ শয়ন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন, আবার অল্পক্ষণ পরেই শয়ন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বপরিবর্ত্তনও চলিতে লাগিল। এইরূপে একবার উপবেশন, আবার শয়ন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন, করিতে করিতে যুবক যেন সেই অল্প সময়কে কণ্টকময় মনে করিতে লাগিলেন। এক একবার তাঁহার মনে এরূপও হইতেছিল, যেন তিনি প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিতে পারিলে রক্ষা পান।

পাঠক এই যুবকের পরিচয় পাইয়াছেন কি? ইনিই বাকলাধিপতি রামচন্দ্র রায়। রামচন্দ্র অভিমানভরে বিন্দুমতীর সংবাদ লন নাই। তাঁহার মাতা

বিন্দুমতীকে রাজবাটীতে আনয়ন করায় রামচন্দ্রের অভিমান আরও বাড়িয়া উঠে। রামচন্দ্র কেবল মাত্র যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার হৃদয় তখনও বালকসুলভ চাঞ্চল্যে ও অভিমানে পূর্ণ ছিল। মাতা তাঁহাকে না বলিয়া বিন্দুমতীকে রাজবাটীতে আনয়ন করায় রামচন্দ্রের অভিমান যেন উথলিয়া উঠে। কিন্তু তিনি মাতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, সেই জন্য মাতৃ-আজ্ঞায় বিন্দুমতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হন। তথাপি অভিমান তাঁহাকে বৃশ্চিকবৎ দংশন করিয়া যন্ত্রণায় কাতর করিয়া তুলিতেছিল। তিনি মাতার কথায় বিন্দুর সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জামাতৃহননেচ্ছুর কন্যাকে গ্রহণ করিতে তাঁহার মনকে সম্মত করিতে পারেন নাই। তাই এক অভাবনীয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিন্দুমতী গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। পর্য্যঙ্কের নিকট উপস্থিত হইয়া বিন্দু চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। রামচন্দ্র তখন শয়ন করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিলেন না। পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—

"রাজাধিরাজ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা কি মনে করিয়া?"

শুনিয়া বিন্দুমতীর মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তিনি পর্য্যঙ্কের ধারে হাত রাখিয়া আপনাকে পতন হইতে রক্ষা করিলেন। রামচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিলেন,

"কোন উত্তর দিতেছ না যে?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিন্দুমতী কহিলেন,—

"প্রভুর চরণসেবার জন্য।"

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে তোমার প্রভু?"

"রাজাধিরাজ বাকলাধিপ।"

"হা, হা" শব্দে বিকট হাস্য করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,

"বাদসাহের প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গলার নবীন সম্রাট প্রতাপাদিত্যের কন্যা হইয়া বাকলাধিপের চরণসেবার জন্য? একি রহস্য?"

"রহস্য নহে প্রভো" বলিয়া বিন্দুমতী কাঁদিয়া ফেলিলেন। রামচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"রহস্য বৈকি, নতুবা যে বিবাহসময়েই স্বীয় জামাতাকে বধ করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করিতে চাহে, তাহার কন্যা কি কখনও কাহারও পদসেবার প্রয়াসী হইতে পারে?"

বিন্দুমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"কেন প্রভো এ দাসীর অপরাধ কি? দাসী তখনইত প্রভুর পদতলে সমস্ত নিবেদন করিয়াছিল।"

"হাঁ তা বটে, অবশ্য তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে, সে জন্য আমি তোমাকে কিছু পুরস্কার দিব মনে করিয়াছি।"

"দাসী চরণসেবা ভিন্ন আর কোন পুরস্কার চাহে না।"

"পিতৃভ্রাতৃহন্তা, জামাতৃবধেচ্ছুর কন্যার হস্তে চরণসেবা! কখনই নয়।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র উঠিয়া বসিলেন।

"স্বামিন্, প্রভো, ক্ষমা কর, যশোরে জন্ম বলিয়া যদি হতভাগিনী অপরাধিনী হয়, তা' হ'লে তাহার প্রতি পরদুঃখকাতর বাকলারাজের কি দয়া হইবে না?"

"না, কখনই নয়।" বলিয়া রামচন্দ্র পর্য্যঙ্ক হইতে ভূমিতে নামিয়া দাঁড়াইলেন। বিন্দুমতী অমনি তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। পা ছাড়াইয়া রামচন্দ্র নিবিরের মধ্যে দ্বারের নিকট আসিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিলেন ও প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিন্দুমতী "মা যশোরেশ্বরি, তোমার মনে এই ছিল" বলিয়া ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রাজমাতা মনে করিয়াছিলেন যে, উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে মনের গোল মিটিয়া যাইবে। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, অভিমান রামচন্দ্রকে অন্ত জগতে লইয়া গিয়াছিল। রামচন্দ্রের শয়নপ্রকোষ্ঠ হইতে চলিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া তিনি ক্ষিপ্রগতিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বিন্দুমতী ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন। তিনি তাঁহাকে তুলিয়া বলিলেন।

"ছি মা, কেঁদনা, ছেলে মানুষ, আজ একটু রাগ করেছে, আবার কা'ল ঠাণ্ডা হবে। তুমি চল আমার নিকট শোবে।" এই বলিয়া তিনি বিন্দুমতীকে লইয়া প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সে রাত্রিতে রাজমাতা আবার রামচন্দ্রকে শয়নপ্রকোষ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন নাই। রাজমাতা বিন্দুমতীকে লইয়া সে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাতে উঠিয়া তিনি শুনিলেন, রামচন্দ্র বাকলা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া রাজমাতা বলিয়া উঠিলেন,—

"হা হতভাগা, এমন সোনার লক্ষ্মী তোর অদৃষ্টে হবে কেন? তোর যা ইচ্ছা হয় কর, আমি আর কিছু বলব না।"

বিন্দুমতী সমস্ত শুনিলেন। তিনি রাজবাটীতে থাকা বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে তাহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া শ্বশ্রূর চরণস্পর্শ করিয়া বলিলেন,—

"মা, আমাকে বিদায় দিন, আমার জন্য আপনি পুত্রহারা হইবেন কেন?"

রাজমাতা বলিলেন,—

"সেকি মা, তুমি কোথায় যাইবে? আবার যশোরে ফিরিয়া যাইবে কি?"

"যশোরে কার কাছে যাব" বলিয়া বিন্দুমতী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"তবে কোথায় যাইবে মনে করিয়াছ?"

"কাশী যাইব ইচ্ছা করিয়াছি।"

"পাগল মেয়ে, কি দুঃখে কাশী যাবে, ছেলে মানুষ রাগ করে গিয়েছে, আজই আবার ঘুরে আসবে।"

"না মা, আপনি তাঁর ভাব তবে ভাল ক'রে বুঝতে পারেন নাই, আমি থাকলে আপনি তাঁকে পাবেন না।"

"তাই যদি তোমার মনে হয়ে থাকে, তবে আমার বলিবার কিছু নাই। কারণ তুমি সতীলক্ষ্মী, তোমার মনে যা হবে, তা যথার্থই ঘটবে। কিন্তু মা আমার মন ডাকিতেছে, আমি আবার তোমাকে ফিরাইয়া আনিব।"

"মার ইচ্ছা হলে তাই হবে, তবে এখন আমায় বিদায় দিন।"

"এস মা এস" বলিয়া রাজমাতা অশ্রুপূর্ণনয়নে বিন্দুমতীর মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিন্দু ধীরে ধীরে শিবিকারোহণে রাজবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বজরায় উঠিলেন ও বজরা ভাসাইতে আদেশ দিলেন।

মাধবমল্ল কহিল,—

"মা বজরা কোথায় যাইবে ?"

"কাশীতে"।

"কেন মা" ?

"পরে জানিতে পারিবে।"

প্রতাপের অনুচর মাধবমল্ল বিন্দুমতীর ভাব দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে, রামচন্দ্র নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। সেইজন্য সে বলিল, "আমাকে না বলিলে বজরা ভাসাইব না।"

"আমি এখন কিছু বলিব না।"

"আপনি না বলুন আমি বুঝিয়াছি। কে আছ, এখনই বন্দুক লইয়া রাজবাটী চল, রামচন্দ্র রায়কে বাঁধিয়া আনিতে হইবে।"

"মাধবমল্ল, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! তুমি বাকলারাজমহিষীর সম্মুখে তাঁহাকে অবমানিত করিতে চাহিতেছ? এখনই আমার বজরা হইতে নামিয়া যাও।"

মাধবমল্ল নীরব হইয়া রহিল। বিন্দুমতী মাঝিদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"মাঝি, তোমরা এখনই বজরা ছাড়িয়া দেও, কাশী যাইতে হইবে।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া মাঝিরা বজরা ছাড়িয়া দিল। বজরা ও নৌকা বাকলা পরিত্যাগ করিয়া কাশীর দিকে অগ্রসর হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রের বধের ইচ্ছা করিলে বিন্দুমতী তাঁহাকে সেই সংবাদ দেন ও তাঁহার সেনাপতি রামনারায়ণ মল্লের সাহায্যে রামচন্দ্র যশোর হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। যে সময়ে বিন্দুমতী বাকলায় আসেন, সে সময়ে রামনারায়ণ কোন কার্য্যোপলক্ষে

স্থানান্তরে ছিলেন, তিনি আসিয়া সমস্ত শুনিলেন ও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। প্রথমে রাজমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে রাজমাতা তাঁহাকে বলিলেন,—

"রামনারায়ণ, সমস্তই শুনিয়াছ ত, এক্ষণে যাহা ভাল হয় কর। আমি বৌমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি সুপুত্রের মা হও। তোমরা থাকিতে আমার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবে কি?"

রামনারায়ণ উত্তর করিল,

"না মা, কদাচ হইবে না। যেরূপে হউক আমি বৌঠাকুরাণীকে ফিরাইয়াই আনিব। আমাদের মহারাজের বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়াছে, নতুবা যে বৌঠাকুরাণীর জন্য আমরা তাঁকে বাঁচাতে পেরেছিলেম, এমন সোনার লক্ষ্মীকে তিনি পায়ে ঠেলবেন কেন?"

"আমিও সদা সর্ব্বদা তাই ভাবছি। নতুবা যে রামচন্দ্র পরের দুঃখ শুনলে কাঁদিয়া ফেলে, সে এমন সোনার লক্ষ্মীকে কষ্ট দিচ্ছে কেন? আগে সেই হতভাগা ছেলেটার খোঁজ কর, তার পর তুমি যেরূপে পার বৌমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া রামনারায়ণ প্রথমে রামচন্দ্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। রামচন্দ্র বাকলার নিকটেই ছিলেন। রামনারায়ণ সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে লইয়া রাজমাতার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজমাতা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—

"তোমার বুদ্ধি কি একেবারে লোপ পাইয়াছে।"

রামচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। কারণ, বিন্দুমতীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অবধি তাঁহার মনে অনুতাপ হইতেছিল। রামনারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"মহারাজ, আপনি কি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন। বৌঠাকুরাণী যদি আপনাকে প্রতাপাদিত্যের অভিসন্ধির কথা না জানাইতেন, তাহা হইলে আমরা কি আপনাকে বাঁচাইতে পারিতাম? সেই বৌঠাকুরাণী আপনার নিকট নিজে উপস্থিত হইলেন, আর আপনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন?

যাঁহার জন্ত বাকলারাজের জীবনরক্ষা হইয়াছে, সমস্ত বাকলা রাজ্যের লোক তাঁহার নিকট ঋণী। বাকলারাজ যদি তাঁহার অবমাননা করেন, আমরা কিছুতেই তাহা সহ্য করিব না। আমরা বুঝিব বাকলারাজের মতিভ্রম ঘটিয়াছে। যিনি পরদুঃখকাতর, তাঁহার এরূপ ভাব বুদ্ধিভ্রমের চিহ্ন বৈ আর কি হ'তে পারে? আমি এখনই বৌঠাকুরাণীকে আনিতে চলিলাম। যদি কাশী পর্য্যন্ত যাইতে হয়, তাহাও যাইব।"

"তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর" বলিয়া রামচন্দ্র নীরব হইলেন।

"আমার যাহা অভিরুচি, তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন" বলিয়া রামনারায়ণ তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

৪

ভুবনসুন্দরী বারাণসী প্রাতঃসূর্য্যকিরণে হাসিয়া উঠিয়াছে। তাহার মন্দিরচূড়া চুম্বন করিয়া সূর্য্যদেব আপনাকে ধন্ত মনে করিতেছেন। সুবর্ণমণ্ডিত চূড়াসকল বালার্ককিরণে প্রতিফলিত হইয়া বারাণসীর স্বর্ণময়ী নামের সার্থকতা সাধন করিতেছে। এই আনন্দকাননে আনন্দ সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিরাজমান। এমন নিত্যোৎসবময়ী পুরী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর ঘাটে ঘাটে প্রাতঃস্নানের জন্ত স্ত্রীপুরুষ সমবেত হইয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে মন্দিরনিকরের মঙ্গল-আরতির সঙ্গে সঙ্গে জনস্রোত গঙ্গাস্রোতে আসিয়া মিশিয়াছে। প্রভাতের সমীরণ ও বালসূর্য্যের কিরণ জাহ্নবীর পূত সলিলকে ঈষৎ শীতল ও ঈষদুষ্ণ করিয়া বড়ই মধুর করিয়া তুলিতেছিল। 'হর হর বিশ্বেশ্বর' শব্দে সমগ্র নগরী প্রতিধ্বনিত। দশাশ্বমেধ ঘাটে জনসংখ্যা এত অধিক যে, তাহাকে নরমুণ্ডে গ্রথিত বলিয়া বোধ হইতেছে। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে লোকস্রোত অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রাতঃস্নাতা আলুলায়িত কেশা রমণীগণ পুষ্পকরণ্ডহস্তে এবং নামাবলী ও উত্তরীয়-পরিশোভিত পুরুষগণ বিল্বপত্র পুষ্প হস্তে লইয়া পুরুষেরা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চারিদিকে যেন কেমন এক আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। পৃথিবীর অনেক নগর কর্ম্মক্ষেত্ররূপে কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া থাকে, কিন্তু বারাণসী

ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায় না।

সেই সময়ে চৌষট্টিযোগিনীর ঘাটের নিকট একখানি নৌকায় বসিয়া একজন পুরুষ ঘাটের দিকে অনিমেষনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ঘাটে একখানি বজরা ও কয়েকখানি নৌকা বাঁধা ছিল। ঘাটের উপরিস্থিত একটি বাটী হইতে একটি সুন্দরী স্ত্রী, একজন সহচরী, ও একটি বৃদ্ধা পরিচারিকার সহিত সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া জাহ্নবীজলে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা স্নানাদি সমাপন করিয়া যখন উপরে উঠিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে নৌকাস্থিত পুরুষটি নৌকা হইতে নামিয়া তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণে প্রবৃত্ত হন। পাঠক ইঁহাদের পরিচয় পাইয়াছেন কি? ঐ সুন্দরী স্ত্রীলোকটি বিন্দুমতী। বিন্দুমতী কাশী আসিয়াছেন। চৌষট্টিযোগিনীর ঘাট প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি, তাই বিন্দুমতী তাহার নিকট আবাস স্থাপন করিয়া সেই ঘাটে প্রত্যহ স্নানের জন্য আসিতেন। পুরুষটি রামচন্দ্রের সেনাপতি রামনারায়ণ। বিন্দুমতী বাকলা পরিত্যাগ করার কিছু পরে রামনারায়ণ বাকলায় উপস্থিত হন। তাহার পর রামচন্দ্রের অনুসন্ধানে তাঁহার দুই চারিদিন অতিবাহিত হয়। তাহার পর কাশী যাইবার আয়োজন করিতেও তাঁহার কিছু সময় লাগে। কাজেই তিনি পথিমধ্যে বিন্দুমতীর বজরা ধরিতে পারেন নাই। গত রাত্রিতে তিনি কাশী আসিয়া পঁহুছিয়াছেন, এবং চৌষট্টিযোগিনীর ঘাট প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি জানিয়া তিনি তাহারই নিকটে বিন্দুমতীর অবস্থান অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান যে মিথ্যা হয় নাই, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। রামনারায়ণ অতি প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিন্দুমতীর কোন লোকের সহিত দেখা হইতে পারে মনে করিয়া তিনি নৌকা পরিত্যাগ করিয়া তীরে উঠেন নাই। ভাগ্যক্রমে স্বয়ং বিন্দুমতীই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে চিনিতে রামনারায়ণের ক্ষণমাত্রও বিলম্ব ঘটে নাই।

বিন্দুমতী ও তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয় ধীরে ধীরে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দিকে

অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের সহিত কয়েকজন পুরুষ ও স্ত্রী আসিয়া যোগ দিল। রামনারায়ণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ বীরপুরুষ, চিরদিন অসি বন্দুক লইয়াই দিন কাটাইয়াছেন। ধর্ম্ম বা ভক্তির অনুষ্ঠানের কখনও অবকাশ পান নাই। ধর্ম্মক্ষেত্র কাশীধামে আসিয়া চারিদিকে ধর্ম্ম-স্রোত প্রবাহিত দেখিয়া তিনি যেন কেমন কেমন হইয়া গেলেন। যদিও তিনি বিন্দুমতীর অনুসরণ করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার মন যেন আর কোথায় চলিয়া যাইতেছিল। অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি শুনিলেন একজন বাঙ্গালী ভিখারী গান করিতেছে,—

"এ পাষাণ চিতে, শুধু চারি ভিতে,
ধূ ধূ করে মরু ভাবি নিরবধি।
দুর্গানামের বলে, কঠিন পাষাণ গলে,
মরুভূমে বহে স্বরগের নদী।
তাই প্রাণ খুলি, দুর্গা দুর্গা বলি,
গলে যা'ক আমার শিলাসম হৃদি।
ভক্তিমন্দাকিনী, বহুক অমনি,
দুর্গাপদবিম্ব হেরি নয়ন মুদি।"

গান শুনিয়া রামনারায়ণ অজ্ঞাতভাবে "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া উঠিলেন, এবং যেন আত্মহারা হইয়া গেলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আর দেশে ফিরিব না, এখানেই থাকিয়া যাইব।"

অল্পক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, বিন্দুমতী, তাঁহার সঙ্গিনীগণ ও লোকজন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। রামনারায়ণ ত্বরিতপদে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বেশ্বরের বিশাল মন্দির শির উচ্চ করিয়া দণ্ডায়মান। ইহা বর্ত্তমান মন্দির নহে, কারণ, তখন আরঙ্গজেবের জন্ম হয় নাই। যে মন্দির ভাঙ্গিয়া আরঙ্গ-জেব মসজীদ গড়িয়াছিল, আমরা সেই মন্দিরেরই কথা বলিতেছি। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া রামনারায়ণ দেখিলেন, দুর্ভেদ্য প্রাচীরবৎ লোকসকল

দণ্ডায়মান, কিন্তু তাহা ভেদ করিতে রামনারায়ণের বহু কষ্ট পাইতে হয় নাই। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বিন্দুমতী বিশ্বেশ্বরের মস্তকে পুষ্প বিল্বপত্র অর্পণ করিয়া করযোড়ে কি প্রার্থনা করিতেছেন। পরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিক্রান্ত হইবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার সহচরীটিও প্রণাম করিয়া সরিয়া আসিল। বৃদ্ধা পরিচারিকা দেবদেবকে প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবা, বিন্দুর একটি সুপুত্তুর দেও।"

এই কথা শুনিয়া রামনারায়ণের শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। যদিও তিনি বিন্দুমতীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি পরিচারিকার মুখ হইতে তাঁহার নাম শুনিয়া যাহা কিছু সন্দেহ মনে ছিল, তৎক্ষণাৎ তাহা দূর হইয়া গেল। বৃদ্ধার প্রার্থনায় ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বিশেষ কোন কষ্ট হইবে না। রামনারায়ণও বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। তাহার পর তাঁহারা অন্নপূর্ণার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বৃষগণের মুখে যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য দিয়া মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যথারীতি প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধা পরিচারিকা প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"মা, বিন্দুকে রাজরাণী করিয়া অন্নজল বিতরণ করাও।"

রামনারায়ণ দূর হইতে অন্নপূর্ণা দর্শন ও প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। একটু নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে, বিন্দুমতী পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"ধাই, তুই রোজ রোজ দেবতার কাছে ওকি বলিস, যা না হবার তা চাস কেন?"

বৃদ্ধা বলিল,

"তুমি যা মনে করনা কেন, জামাই মহারাজ তোমাকে নেবার জন্ত নিশ্চয়ই লোক পাঠাবে।"

সহচরী হাস্য করিয়া বলিল,

"আগে তোমারই ডাক পড়বে।"

বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল,

"নে নে মিছে বকিসনে, আমি যা বলি, মা বাবা নিশ্চয়ই তা শুনবে। কাশী এসে অবধি আমার মনে হচ্ছে, বিন্দুর একটি সুপুত্তুর হবে। সে তার আজার মত কীর্ত্তি রাখবে।"

সহচরী হাস্য করিয়া বলিল,

"আচ্ছা আমরা তার নাম রাখব, কীর্ত্তিনারায়ণ।"

বৃদ্ধা বলিতে লাগিল,

"দেখিস আমার কথা সত্যি হয় কিনা।"

রামনারায়ণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যদি বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা মুখ তুলিয়া চান, যদি বৌঠাকুরাণীকে দেশে ফিরাইতে পারি, ও শুভক্ষণে তাঁহার সুকুমার ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার নাম কীর্ত্তিনারায়ণ রাখিব।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁহারা রাজপথে আসিয়া পড়িলেন। আবার ক্ষুদ্র গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শেষে আপনাদের আবাসবাটীতে প্রবেশ করিলেন।

রামনারায়ণ নৌকায় আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার বিন্দুমতীর আবাস বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীর মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা-প্রকাশ করিলে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—

"আপনি কোথা হতে আসছেন।"

রামনারায়ণ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, একটা মিথ্যা পরিচয় দিবেন, কিন্তু কাশী আসিয়া তাঁহার ভাবান্তর ঘটিয়াছিল, কাজেই মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা না করিয়া সত্য সত্যই বলিয়া ফেলিলেন,—

"আমি বাকলা হইতে আসিতেছি।"

প্রহরী মাধবমল্লকে সেই সংবাদ দিলে, মাধব দ্রুতগতিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"মহাশয়ের নাম?"

"আমার নাম রামনারায়ণ মল্ল। বৌঠাকুরাণীমাতাকে সংবাদ দিন যে, তাঁহার সন্তান রামনারায়ণ তাঁহার পদবন্দনা করিতে আসিয়াছে।"

মাধবমল্ল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রুতবেগে রামনারায়ণের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে বিন্দুমতী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামনারায়ণ উপস্থিত হইয়া বিন্দুমতীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—

"মা, সন্তান মাকে নিতে এসেছে। বাবার প্রতি রাগ ক'রে মা কি কখনও ছেলে ছাড়তে পারেন?"

বিন্দুমতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সহচরীকে দিয়া কহিলেন, "আপনি আহারাদি করুন, পরে সে কথার উত্তর পাইবেন।"

রামনারায়ণ কহিলেন,—

"মা, যাইতে স্বীকার না করিলে আমি জলগ্রহণ করিব না।"

বিন্দুমতী বিষম বিপদে পড়িলেন, কাশীতে অতিথি—বিশেষতঃ আত্মীয়কে অনাহারে থাকিতে দেওয়া তাঁহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর বিবেচিত হইতে লাগিল। রামনারায়ণ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"মা আপনার জন্য আপনার সকল সন্তানই কাঁদিতেছে। যিনি বাকলা-রাজের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, সেই মা লক্ষ্মীকে হারাইয়া রাজ্যের প্রজা-সকল কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। রাজমাতা অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন। আর যিনি আপনাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, তিনি অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন।"

বিন্দুমতীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রামনারায়ণ আবার বলিলেন,—

"সন্তানের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?"

বিন্দুমতী সহচরীকে দিয়া উত্তর দিলেন,

"আচ্ছা আমি যাইব, আপনি আহারাদি করুন।"

রামনারায়ণ উত্তর করিলেন,—

"অন্নপূর্ণাক্ষেত্রে জীবন্ত অন্নপূর্ণার নিকট মহাপ্রসাদ পাইব, ইহাতে আপত্তি কি?"

অতঃপর আহারাদির ব্যবস্থা হইল। সন্ধ্যার পর বৃদ্ধা পরিচারিকা সহচরীকে বলিল,—

"কেমন আমার কথা সত্যি কি না?"

সহচরী বলিল,—

"এখন তোমাকে প্রণাম কত্তে ইচ্ছে হচ্ছে।"

পর দিন প্রাতঃকালে বিন্দুমতীর বজরা কাশী পরিত্যাগ করিয়া আবার বাকলার দিকে যাত্রা করিল। সঙ্গে সঙ্গে রামনারায়ণের নৌকাও ভাসিল।

৫

আশ্বিন মাস, কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর চাঁদ উদ্দামসলিলা পদ্মাবতীর হৃদয়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। শরৎকৃশা হইয়াও পদ্মাবতী স্বভাব পরিত্যাগ করেন নাই। কল কল নাদে উদ্দাম গতিতে সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছেন। তীরে কাশ কুসুমস্তবকের উপর জ্যোৎস্নালহরী পড়িয়া দ্বিতীয় পদ্মাবতী বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল। বিন্দুমতীর বজরা ও নৌকা পদ্মা বাহিয়া বাকলার দিকে চলিতেছিল। বজরার গবাক্ষ খুলিয়া বিন্দুমতী পদ্মাবতীহৃদয়ে চাঁদের খেলা দেখিতেছিলেন। পদ্মার কলধ্বনি তাঁহার কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। অনেকক্ষণ পদ্মার দিকে তাকাইয়া বিন্দুমতী বলিয়া উঠিলেন,—

"অতি সুন্দর।"

সহচরী বলিল,

"ইহার পর আরও সুন্দর লাগিবে।"

"তাতে তোমার কি?"

"আমার দেখিয়া শুনিয়াই সুখ।"

"তাতেই তোমার পেট ভরবে?"

"ভরা পেটের উপর বেশী ভাল নয়।"

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি প্রভাত হইল। উষার আলোকে জগৎ ভরিয়া গেল। ক্রমে সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক্ হইতে উঁকি মারিতে লাগিলেন, এমন সময়ে কিছু দূরে একখানি নৌকা হইতে ললিত রাগিণীতে কে গাহিল।

"শারদ প্রভাতে আজি বসুধা হাসিছে মরি,
শ্যামল শোভার স্রোতে বিশ্ব যেন গেছে ভরি।
আতট সলিলভরে, শ্যাম-শোভা বুকে ধরে,
গাহিয়া চলিছে নদী কুল কুল রব করি।
পল্লব কুসুমরাশি, আনন্দে উঠিছে হাসি,
শিশিরের ছলে যেন প্রেমাশ্রু পড়িছে ঝরি।
কেন আজি চরাচরে, এ আনন্দ থরে থরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে খেলে অপরূপ রূপ ধরি।
কান্তিরূপে বিশ্বপ্রাণ, ব্যাপি যাঁর অধিষ্ঠান,
সে মার চরণস্পর্শে ছুটে আনন্দলহরী।"

গান শুনিয়া বিন্দুমতী কহিলেন,—

"আহা এমন গানত কখনও শুনি নাই, সত্য সত্যই মায়ের আগমনে আনন্দের লহরী ছুটিয়াছে।"

সহচরী কহিল,—

"কোথায়? পদ্মায়, না তোমার মনে।"

"সর্ব্বত্রই।"

"তা হলেও তোমার মনের লহরীর বেগটা কিছু বেশী।"

"রঙ্গ রাখ, সত্যি দেখ, মা দুর্গা আসবেন বলে সবই যেন হেসে উঠছে।"

"তাত প্রতি বৎসরই অমনি হয়, তবে এবার তোমার কাছে সবই বেশী ভাল লাগবে।"

"তোকে কিছুতেই পারবার যো নেই, সত্যি ভাই এমন আনন্দ অনেক দিন পাইনি। একে মা আসছেন—"

বিন্দুমতীর কথা শেষ হইতে না হইতে সহচরী উত্তর দিল,

"তাতে আমি ফিরে যাচ্ছি।"

বিন্দুমতী কহিলেন,

"তবে তোমার ইচ্ছে আমাকে কিছু বলতে দিবে না, আচ্ছা আমি চুপ করলেম" এই বলিয়া বিন্দুমতী নীরব হইলেন।

বজরা পদ্মার এক শাখানদীতে প্রবেশ করিয়া বাকলার দিকে চলিতে লাগিল। যথাসময়ে বাকলার নিকট উপস্থিত হইলে রামনারায়ণের নৌকা বজরার অগ্রে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার তাহা ফিরিয়া আসিল। নৌকা বজরার নিকট উপস্থিত হইলে একজন পুরুষ ব্যস্ত ভাবে তাহা হইতে বজরায় লাফাইয়া উঠিলেন। ইনি স্বয়ং রামচন্দ্র রায়। বিন্দুমতীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অবধি রামচন্দ্র সত্য সত্যই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। রামচন্দ্র কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি ধীর, শান্ত, কোমল ও উদার ছিলেন। পরের দুঃখ শুনিলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন, এবং লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিতেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে নিহত করিতে চেষ্টা করায় তাঁহার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ও ক্রোধ উপস্থিত হয়। যদিও বিন্দুমতীর মুখ হইতে তিনি সেই সংবাদ শুনিয়া জীবনরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি প্রতাপের কন্যা বলিয়া বিন্দুমতীর প্রতি তাঁহার অভিমান উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন তিনি কেবল মাত্র যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে তিনি বিন্দুমতীকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু বিন্দুমতীর পূর্ব্বাপর ব্যবহার, তাঁহার সরল বদন, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এই সমস্ত স্মরণ করিয়া রামচন্দ্রের হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। তাহার উপর মাতার ও রামনারায়ণের গঞ্জনা তাঁহাকে আরও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। আবার সমস্ত প্রজা বিন্দুমতীর জন্য হাহাকার করায় রামচন্দ্র একেবারে অধীর হইয়া পড়েন। কয়মাস তিনি কষ্টে ছটফট করিতেছিলেন। রামনারায়ণের নিকট সংবাদ পাইয়া তাঁহার দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিধারা প্রবাহিত হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ রামনারায়ণের নৌকায় আরোহণ করিয়া বিন্দুমতীর বজরার নিকট উপস্থিত হইলেন ও এক লম্ফে তাহাতে চড়িয়া বসিলেন। রামচন্দ্র বজরার মধ্যে প্রবেশ করিলে, সহচরী বলিয়া উঠিল,—

"ওমা অপরিচিত পুরুষ বজরার মধ্যে কেন গো?"

রামচন্দ্র একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন,—

"অপরিচিত কি পরিচিত এখনই জানিতে পারিবে।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র বিন্দুমতীর নিকট উপস্থিত হইলেন ও বলিতে লাগিলেন,—

"বিন্দু, প্রাণাধিকে আমাকে ক্ষমা কর, আমার বুদ্ধিভ্রম ঘটায় আমি তোমার অবমাননা করেছি। কিন্তু তাহার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে আমি বোধ হয় আর বাঁচব না।"

বিন্দুমতী রামচন্দ্রের চরণ জড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"স্বামিন্, প্রভো, তোমাকে ক্ষমা করিব কি, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমাকে নানারূপে কষ্ট দিয়াছি। আমাকে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বল।" বলিয়া বিন্দুমতী কাঁদিতে লাগিলেন।

"আবার তোমাকে বাকলা রাজবাটীতে যাইতে হইবে।"

চক্ষু মুছিয়া বিন্দুমতী কহিলেন.

"তাহাই যাইব, তুমি যে আদেশ করিবে দাসী তাহাই প্রতিপালন করিবে।"

এইরূপে উভয়ের অনেক কথা বার্ত্তা হইল। পাঠকদের মধ্যে যাঁহাদের এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাঁহারাই সম্যক্‌রূপেই অবগত হইয়াছেন। যাঁহাদের ঘটে নাই, ঘটিলেই বুঝিতে পারিবেন।

তাহার পর বজরা ক্রমে চলিতে লাগিল, একটি স্থানের নিকট আসিলে জনকোলাহলে চারিদিক ভরিয়া গেল। বিন্দুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এখানে এত গোল কেন?"

রামচন্দ্র উত্তর করিলেন,

"এখানকার কথা তোমার মনে পড়ে কি? এখানে তোমার জন্য হাট বসিয়াছিল। সেই হাট আজিও আছে, ও ক্রমে তাহাতে লোকজন আরও বাড়িয়াছে। সকলে তাহার নাম দিয়াছে "বৌঠাকুরাণীর হাট" আজিও এই

বৌঠাকুরাণীর হাটকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিব মনে করিয়াছি। কারণ, ইহাই আমাদের জীবনের আনন্দপ্রদ স্মৃতিচিহ্ন। রামচন্দ্রের ইঙ্গিতে মাঝিরা তথায় নৌকা লাগাইলে, সকলে "জয় বৌঠাকুরাণীর জয়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ও নানাবিধ দ্রব্যে বজরা পূর্ণ করিয়া দিল। তাহার পর বজরা-বাকলার ঘাটে গিয়া লাগিল। রাজারাণী রাজবাটীতে প্রবেশ করিলে, রাজমাতা ধান্য দূর্ব্বা দিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—

"মা দুর্গাও পৃথিবীতে আসছেন, আর মা অন্নপূর্ণা কাশী হতে আমাদের বাড়ীতে এলেন।"

শুনিয়া বিন্দুমতী অধোবদন হইয়া রহিলেন।

রামনারায়ণ আসিয়া কহিলেন,

"মা তোমার আশীর্ব্বাদ এখন সফল হ'ক।"

রাজমাতা বলিলেন,

"বাবা তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।"

তাহার পর রাজবাটীতে আনন্দের কোলাহল উঠিল। দলে দলে স্ত্রীলোকেরা বিন্দুমতীকে দেখিতে আসিল। প্রজারা বৌঠাকুরাণীকে উপহার দিবার জন্য যাহার যাহা সঞ্চিত ছিল আনিয়া উপস্থিত করিল। কিছুদিন বাকলা রাজবাটীতে ও বাকলারাজ্যে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল, সেই সময়ে দুর্গোৎসব হওয়ার মহানন্দে সকলে মত্ত হইয়া গেল।

## উপসংহার।

রাজমাতার আশীর্ব্বাদ ও বৃদ্ধা পরিচারিকার কথা সত্য হইল। সহচরীর রহস্যও যথার্থ হইয়া উঠিল। শুভক্ষণে বিন্দুমতী এক সুপুত্র প্রসব করিলেন, রামনারায়ণের অনুরোধে তাহার কীর্ত্তিনারায়ণ নামকরণ করা হইল। কীর্ত্তিনারায়ণ পিতা ও মাতামহের ন্যায় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া আপনার নাম

চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। আজিও কুলাচার্য্যগণ তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। * আর বৌঠাকুরাণীর হাট আজিও সেই বিষাদহর্ষময় ঘটনার কথা সকলের মনে জাগাইয়া দিতেছে।

---

* চন্দ্রদ্বীপে প্রবাদ আছে যে বিন্দুমতী আর কাশী হইতে ফিরেন নাই। যশোরের কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ প্রতাপাদিত্যেরই দৌহিত্র। কায়স্থকারিকায় রামচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহের উল্লেখ নাই। কাজেই রামচন্দ্র যে বিন্দুমতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং কীর্ত্তিনারায়ণ তাঁহারই গর্ভসম্ভূত।

# খুরশিদ জাঁহানামা।

( হস্তলিখিত পারসী গ্রন্থ। )

একজন ইংরাজ ইতিহাস-লেখক লিখিয়া গিয়াছেন,—"ইংলণ্ড একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, কিন্তু তাহার প্রত্যেক পল্লীর ইতিহাস আছে ; ভারতবর্ষ এমন বৃহৎ দেশ, তথাপি তাহার ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না।" ইহা আমাদের পক্ষে অগৌরবের কথা, তাহাতে সংশয় নাই।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না, এমন কথা বলিতে সাহস হয় না। যে দেশে নানা শ্রেণীর সাহিত্য উদ্ভূত হইয়াছিল, সেখানে যে "ইতিহাস" লিখিত হয় নাই, অথচ "ইতিহাস" কথাটি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে সহসা আস্থা স্থাপন করা যায় না। আমাদিগের দেশেও ইতিহাস ছিল। তাহা "হিষ্টরী" নামে কথিত হইতে পারিত কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। ঘটনাবিবৃতি মাত্রই "হিষ্টরী" নামে পরিচিত, "ইতিহাস" একটু পৃথক। "ইতিহাসেও" ঘটনা বিবৃতি থাকিত, কিন্তু তাহাতে কেবল এক শ্রেণীর ঘটনাই সন্নিবিষ্ট হইতে পারিত। "ইতিহাসের" নিরুক্তি কি, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্ত মিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

ইতিহাস যে "পূর্ব্ববৃত্ত" কথা, তাহাতে সংশয় নাই। এ বিষয়ে "ইতিহাস" এবং "হিষ্টরী" এক পর্য্যায়যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু "পূর্ব্ববৃত্ত" সকল কথাই "হিষ্টরীর" লক্ষ্য "ইতিহাসের" লক্ষ্য তাহা হইতে কিছু পৃথক্। যে সকল

"পূর্ব্ববৃত্ত" কথা "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশসমন্বিত" তাহারই নাম "ইতিহাস।" এই শ্রেণীর ইতিহাস ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় অধীত হইত। তাহার পঠনপাঠন বিলুপ্ত হইবার পর, প্রয়োজনাভাবে, এই শ্রেণীর গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এরূপ অনুমানের সহিত কারণপরম্পরার অভাব নাই। সেকালে মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে সহজে কোন পুস্তকেরই বহুল প্রচার সাধিত হইত না। যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাই লোকে নকল করিয়া রাখিত। এরূপ অবস্থায় যখন যে গ্রন্থের প্রয়োজন তিরোহিত হইয়াছে, তাহার পর হইতেই সেই গ্রন্থ ক্রমে ক্রমে, লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে কত গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ইতিহাসের অভাব দেখিয়া, ইতিহাস ছিল না বলা শোভা পায় না। তথাপি আমাদিগের পক্ষে ফল সমানই দাঁড়াইয়াছে। আমাদিগকে ইতিহাস সংকলন করিয়াই কলঙ্ক দূর করিতে হইবে; আমাদিগেরও একদিন ইতিহাস ছিল বলিলেই কলঙ্ক দূর হইবে না।

ইতিহাস না থাকিলেও, ইতিহাসের উপাদানের অভাব নাই। তাহার সংকলনকার্য্যে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যক্রমে অধ্যবসায়শীল সংকলনকর্ত্তার সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

মালদহনিবাসী ইলাহিবকৃস এইরূপ একজন সংকলনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি দরিদ্র শিক্ষক হইয়াও, পারস্য ভাষায় একখানি পৃথিবীর ইতিহাস সংকলিত করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থের নাম—খুরশিদ জাঁহানামা। তাহা এখনও হস্ত-লিখিত অবস্থায় দপ্তর বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিছু কাল পরে বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। "খুরশিদ জাঁহানামার" আর আর সকল অংশ বিলুপ্ত হইলে দুঃখ হইবে না, কিন্তু ইহার যে অংশে বাঙ্গালার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা বিলুপ্ত হইলে দুঃখের বিষয় হইবে। ইলাহিবকৃস আমাদের সময়েই জীবিত ছিলেন, তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিয়াছেন। মহাত্মা বিভারিজ তাঁহার গ্রন্থ হইতে গৌড়ীয় বিবরণ নকল করাইয়া লইয়া তৎ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে) একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই

প্রথম, সেই শেষ। এত দিনের মধ্যে কেহ আর ইলাহিবক্সের হস্তলিখিত গ্রন্থ পাঠ করিবারও আয়োজন করিলেন না!

ইলাহিবক্স গৌড়পর্য্যাটকগণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, এখন তাহাও বর্ত্তমান নাই। তিনি অনেক পুরাতন মুদ্রা ও শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অনেক গৌড়পর্য্যাটক তাঁহার নিকট হইতে বিবরণ সংকলন করিয়া, তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়াই, নিজ নামে প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু কেহই ধারাবাহিকরূপে ইলাহিবক্সের সযত্ন-সঞ্চিত গৌড়ীয় বিবরণীর অনুবাদ বা পরিচয় প্রকাশিত করেন নাই।

বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস ছিল না। মালদহ-নিবাসী গোলাম হোসেন "রিয়াজ উস্ সলাতিন" নামে যে গ্রন্থ সংকলিত করেন, তাহাই বাঙ্গালার একমাত্র ইতিহাস। তাহার ছায়া অবলম্বন করিয়াই ষ্টুয়ার্ট সাহেব ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। গোলাম হোসেনের গ্রন্থ এক্ষণে বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে।* ইলাহিবক্স রিয়াজ-উস্ সলাতিন হইতে অনেক বিবরণ সংকলিত করিয়াছিলেন। সুতরাং "রিয়াজের" সহায়তায় খুরশিদ জাঁহানামা সহজে অধীত হইতে পারে। যে কোনও গৌড়তত্ত্বজ্ঞ লেখক ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে, আনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

গৌড়ীয় মুদ্রা ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পর প্রচলিত ইতিহাসের অনেক ভ্রম প্রমাদ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যাহাতে সংশয় ছিল না, এমন অনেক বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এরূপ সময়ে "খুরশিদ জাঁহানামাকে" নীরবে কীটদষ্ট হইতে দিলে, বাঙ্গালার কলঙ্কের অবধি থাকিবে না।

* রিয়াজ উস্ সলাতিনের বঙ্গানুবাদ" ঐতিহাসিক চিত্রের প্রথম খণ্ডে আরব্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সোসাইটি হইতে প্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদ বঙ্গানুবাদের অনেক পরে আরব্ধ হইয়াছিল।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ ইলাহিবক্‌সের জন্ম হয়। ইংরাজবাজার তাঁহার জন্মস্থান। তিনি তথাকার বিদ্যালয়ে পারস্যভাষার শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজবাজারেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে "খুরশিদ জাঁহানামা" রচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ইতিহাস সমাপ্ত করেন। দশ বৎসরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে যাহা সংকলিত হইয়াছিল, তাহা একবার পাঠ করিয়া দেখিবার জন্যও বাঙ্গালীর কৌতূহল উপস্থিত হইল না!

ইলাহিবক্‌স বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানের যে সকল পুরাতন অট্টালিকাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক অট্টালিকা এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেক জনশ্রুতিও বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং পুরাতন জনশ্রুতি কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার জন্যও "খুরশিদ জাঁহানামার" অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত। মুরশিদাবাদে "শাহ মর্ত্তাজি আনন্দ" নামক এক সাধু পুরুষের সমাধি মন্দির দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহা ভাগীরথী গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই মুসলমান সাধুর নামের সঙ্গে একটি হিন্দু নামের সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? ইলাহিবক্‌স লিখিয়া গিয়াছেন,—আনন্দী নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যাকে শাহ মর্ত্তাজি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম শাহ সাহেবের নামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কালাপাহাড় ব্রাহ্মণকুমার ছিলেন, গৌড়াধিপতির কন্যার প্রেমে পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—ইলাহিবক্‌স এইরূপ একটি জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার গ্রন্থে মালদহের বিবরণ যেরূপ পারিপাট্যের সহিত যথাযথভাবে লিখিত হইয়াছে, এমন আর অন্য কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার ইতিহাস সংকলিত করিতে হইলে, মালদহের ইতিহাস বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে। *

* The author had a great deal of local knowledge, and he gives some inscriptions and many particulars which are not to be found in Ravenshaws Gour, or in Cunninghams Archeological Reports, or anywhere else, so far as I know.—H. Beveridge.

ইলাহিবক্‌সের গ্রন্থ যে কিরূপ প্রয়োজনে আসিতে পারে, তাহার আভাস প্রদান করিবার জন্যই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। *

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

* রূপ সনাতনের কথা বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কথা। তাঁহাদের রাজকার্য্যের কথা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিবার জন্য ইলাহি বক্‌স পারস্য ভাষায় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে হস্তলিপিত "খুরশিদজাঁহানামার" অনেক অংশই ভাষান্তরিত হইবার যোগ্য। তাহা সাধিত হইলে,—গৌড়কাহিনী, ঢাকাকাহিনী, মুরশিদাবাদকাহিনী অনেক ঐতিহাসিক বিবরণে মনোজ্ঞ হইয়া উঠিবে।

# রায়রায়ান চায়েন রায়।

মুর্শিদাবাদ নিজামতের যিনি রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন, তিনি রায়রায়ান উপাধি লাভ করিতেন। রায়রায়ান শব্দের অর্থ রায়দিগের মধ্যে রায়। ইংরেজীতে বলিতে হইলে Ray of the Rays. এই উপাধি অত্যন্ত গৌরবাত্মক বলিয়া তৎকালে প্রচলিত ছিল। মুর্শিদাবাদ নিজামতের রাজস্বমন্ত্রী ব্যতীত বাঙ্গালার অন্য কোন নিজামতের কোন কর্ম্মচারী এরূপ উপাধি পান নাই বলিয়া মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই ঘোষণা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ যিনি মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা, সেই সুপ্রসিদ্ধ মুর্শিদকুলী খাঁ বঙ্গরাজ্যের রাজস্বের যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে তাহার সেরূপ বন্দোবস্ত হয় নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। তোড়রমল্ল ও সা সুজা কর্ত্তৃক বঙ্গরাজ্যের বন্দোবস্ত হইলেও মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বন্দোবস্ত তাঁহার জামাতা নবাব সুজাউদ্দীনের রাজত্বকালে সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং সেই বন্দোবস্তের যিনি প্রধান মন্ত্রী, তাঁহারও যে উচ্চ সম্মান হওয়া উচিত ইহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। সেই জন্য নবাব সুজাউদ্দীনের সময় তাঁহার রাজস্বমন্ত্রী বাদসাহ দরবার হইতে রায়রায়ান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং উক্ত পদেরও শেষে রায়রায়ান নামই প্রচলিত হয়। কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমে অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত এই পদ প্রচলিত ছিল। কিরূপে এই পদের সৃষ্টি হইল, আমরা এস্থলে তাহারও একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

মোগল রাজত্বকালে প্রত্যেক সুবাতে একজন নাজিম ও একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইতেন। নাজিম শাসন, বিচার ও সামরিক ব্যাপারের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি নবাব বা সুবেদার নামেও অভিহিত হইতেন। কিন্তু রাজস্বের ভার দেওয়ানের প্রতি অর্পিত ছিল। দেওয়ান নাজিমের অধীন ছিলেন না, কিন্তু

কোন কোন বিষয়ে তাঁহাকে নাজিমের আদেশ মানিয়া চলিতে হইত। সুচতুর বাদসাহ আরঙ্গজেব এই দুই পদের কার্য্যের সুচারুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই দেওয়ানের অধীন কাননগো প্রভৃতি রাজস্ব কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। কাননগোগণ বাদসাহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। সেই জন্য তাঁহারাও কিছু স্বাধীন ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগকেও দেওয়ানের আদেশে প্রায়ই কার্য্য করিতে হইত।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুর্শিদকুলী খাঁ বাদসাহ আরঙ্গজেবের আদেশে বাঙ্গলার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া আসেন। সে সময়ে ঢাকায় রাজধানী ছিল। বাদসাহের পৌত্র আজিম ওশ্বান নাজিম বা সুবেদার। দেওয়ানের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটায় দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুকসুদাবাদে আসিয়া দেওয়ানী স্থাপন করিলেন। মুকসুদাবাদ পরে তাঁহার নামানুসারে মুর্শিদাবাদ হইয়া উঠিল। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তদ্বংশীয়গণের নিকট হইতে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার নাজিমি বা সুবেদারী লাভ করিলেন। কিন্তু স্বতন্ত্র কোনও দেওয়ান নিযুক্ত হইল না। তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেহ কেহ নামে দেওয়ান রহিলেন। কিন্তু রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীরা প্রকৃত প্রস্তাবে দেওয়ানীর কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। নবাব মুর্শিদ নিজেই নাজিমি ও দেওয়ানীর কার্য্য সম্পাদন করিতেন। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন মুর্শিদাবাদের নিজামতী লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান রাজস্ব কর্ম্মচারীর উপর রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য নির্ভর করিতে হইল। দেওয়ানী পদেরও লোপ ঘটিল। উক্ত রাজস্বমন্ত্রী তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ থাকায় তিনি বাদসাহের নিকট হইতে তাঁহার জন্য একটি গৌরবাত্মক উপাধি আনাইলেন। সেই উপাধিই রায়রায়ান। রায়রায়ান রাজস্ববিভাগের মন্ত্রী হওয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই দেওয়ান হইয়া উঠিলেন। যদিও পূর্ব্ব সময়ের দেওয়ানদিগের ন্যায় তাঁহার কোনও স্বাধীন ক্ষমতা ছিল না; তাঁহাকে নবাবের আদেশ মানিয়াই চলিতে হইত, তাহা হইলেও তিনি রাজস্ব বিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বাই ছিলেন, এবং নবাব তাঁহার কার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না। কাজেই

তিনিও একরূপ স্বাধীনভাবেই কার্য্য পরিচালনা করিতেন। সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন না হইলেও তিনি নবাবের রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন, এবং তাঁহারই পরামর্শে বঙ্গরাজ্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত হইত।

নবাব সুজাউদ্দীনের যিনি রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন, এবং যিনি সর্ব্বপ্রথমে রায়-রায়ান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম আলমচাঁদ। আলমচাঁদ সুজা-উদ্দীনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু সুজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ আলমচাঁদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করায় আলমচাঁদ জগৎশেঠ প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে ইচ্ছা করেন। সেই সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ আপনার পরাক্রমে দেশমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। আলি-বর্দ্দী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী মহম্মদ সুজাউদ্দীনের সময় মুর্শিদাবাদ নিজামতে প্রবিষ্ট হন। ক্রমে হাজী উজীরি ও আলিবর্দ্দী পাটনার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন তাঁহাদেরও সহিত সরফরাজের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, সকলে মিলিয়া সর-ফরাজের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের আবেদন করেন, তাহার ফলে গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হন, এবং আলিবর্দ্দী মুর্শিদা-বাদের সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু রায়রায়ান আলমচাঁদ প্রভু ও প্রভুপুত্র সরফরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া প্রভুপুত্রের নিধনের কারণ হওয়ায় অনুতপ্ত হইয়া আত্মহত্যা সাধন করেন।

আলিবর্দ্দী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে, রায়রায়ানের পদ শূন্য। আলমচাঁদ এ জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন, সুতরাং তিনি একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিলেন। সেই সময়ে চায়েন রায় জাফরখাঁর জায়গীরের মোহরের ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুচতুর ও কার্য্যদক্ষ থাকায়, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকেই রাজস্বমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া বাদসাহ দরবার হইতে রায়রায়ান উপাধি আনাইয়া দিলেন। তদবধি চায়েন রায় নবাবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্বের কার্য্য পরি-চালনা করিতে লাগিলেন।

যদিও আলিবর্দ্দী খাঁ পরাক্রমশালী নবাব ছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজস্ব

অশান্তিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজত্বারম্ভের প্রথম হইতেই তাঁহাকে নানাপ্রকার শত্রুর সহিত সর্ব্বদাই সমরক্রীড়ায় লিপ্ত থাকিতে হইত। তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানগণই প্রধান। মহারাষ্ট্রীয়গণের বারংবার আক্রমণে তাঁহাকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। তাঁহার রাজত্বের প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গভূমিতে সমরানল প্রজ্বালিত থাকায় তাহা নির্ব্বাপিত করিবার জন্য যে কত অর্থবৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, তাহা বিচক্ষণ মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। রাশি রাশি অর্থবৃষ্টি করিয়াও তাহা নির্ব্বাপিত না হওয়ায় পরে উড়িষ্যার সমুদ্রজলে তাহা নির্ব্বাপিত করিতে হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত অবিরত যুদ্ধে বহু অর্থব্যয় করিয়া শেষে তাহাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রদান করিয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বঙ্গরাজ্যে শান্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদি আমরা বিবেচনা করিয়া দেখি যে, এই অশান্তির মধ্যে এই সমস্ত অর্থ কোথা হইতে সংগৃহীত হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তিত হইতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজস্বমন্ত্রী রায়রায়ান চায়েন রায় ও জগৎ শেঠ আমাদিগের সে চিন্তা দূর করিয়া দেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং সুজাউদ্দীনের রাজত্বসময়ে তাহা সম্পূর্ণ হয়। খালসা, ও জায়গীর এই দুই প্রকার জমা বন্দোবস্ত করিয়া মুর্শিদকুলী বাঙ্গলার রাজস্বের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ইহার সহিত আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর যুক্ত হইয়া ক্রমে আরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই বন্দোবস্তের সময়ে অনেকগুলি জমীদারী গঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গলার অনেক প্রধান জমীদারী সেই সময়ে গঠিত হয়। যাহা দুই একটি পূর্ব্বে ছিল, তাহাদিগকেও নূতন করিয়া গঠন করিতে হইয়াছিল। আলিবর্দ্দীর সময়ও এই বন্দোবস্তের উপর কিছু কিছু কর বৃদ্ধিও হয়। রায়রায়ান চায়েন রায়ের কৌশলে তাহার বৃদ্ধি হইয়াছিল, তজ্জন্য জগৎ-শেঠেরও পরামর্শ লওয়া হয়। কারণ জগৎশেঠ নবাবের গদীয়ান ছিলেন, অনেক সময়ে তাঁহাকে অর্থসরবরাহ করিতে হইত, এবং জমীদারেরাও তাঁহার নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া নবাবের রাজস্ব প্রদান করিতেন। সেইজন্য

চায়েন রায় ও জগৎশেঠ কৌশলের সহিত জমীদারদিগকে বাধ্য করিয়া কর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যে আবওয়াব স্থাপিত হয়, তন্মধ্যে একটি মহারাষ্ট্রীয়দিগের চৌথ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল। যদিও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে চৌথ দিতে হয় নাই, কিন্তু তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য তাহার পরিবর্ত্তে নবাবকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রদান করিতে হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সহিত অবিরত সংগ্রামে যে অজস্র অর্থব্যয় হইত, তাহার নির্ব্বাহের জন্যও যে রাজস্বমন্ত্রীকে সর্ব্বদাই রাজকোষে অর্থ প্রেরণ করিতে হইত, তাহা সকলেই অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। বন্দোবস্তী করে রাজ্য ও যুদ্ধ পরিচালনা সম্যক্ রূপে নির্ব্বাহ হইত না বলিয়া অতিরিক্ত কর স্থাপন করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু এই অতিরিক্ত কর স্থাপনের জন্য জমীদার বা প্রজাবর্গ কেহই অসন্তুষ্ট হয় নাই। কারণ, কি জমীদার কি প্রজা সকলেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয়ে সর্ব্বদাই 'ত্রাহি ত্রাহি' করিত। পশ্চিম বঙ্গের অনেক জমীদারের জমীদারী ও অনেক প্রজার গৃহ ও ক্ষেত্র মহারাষ্ট্রীয়দিগের দ্বারা পদদলিত হইয়া মরুভূমিতুল্য হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ব বঙ্গের জমীদারেরা ও প্রজারা যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহা-দিগের দ্বারা উৎপীড়িত হয় নাই, তথাপি তাহাদিগকেও তজ্জন্য উত্ত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের তাড়নায় অনেকে পশ্চিম বঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করে। ক্রমে পশ্চিম বঙ্গ জনশূন্য হইতে লাগিল এবং পূর্ব্ব বঙ্গ জন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসিগণও উত্ত্যক্ত হইয়া পড়ে। সেই জন্য কি জমীদার কি প্রজা সকলেই তাহার জন্য ব্যাকুল হয়। তদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমনাশঙ্কাও তাহাদের মনে মধ্যে মধ্যে স্থান পাইত। এই সমস্ত কারণে কি পশ্চিম বঙ্গ, কি পূর্ব্ববঙ্গ সমস্ত বঙ্গভূমির জমীদার ও প্রজাগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচারে ও আশঙ্কায় উৎপীড়িত ও ভীত হইয়া পরিত্রাণের জন্য সর্ব্বদা নবাবের নিকট প্রার্থনা করিত। নবাব ও তাহাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদাই সমর-ক্রীড়ায় লিপ্ত থাকিতে হইত। এই যুদ্ধের ব্যয়

নির্ব্বাহের জন্য রাজস্বমন্ত্রী করবৃদ্ধির প্রস্তাব করিলে জমীদার ও প্রজারা অম্লানবদনে তাহা দিতে স্বীকৃত হইল, এবং যাহারা রাজস্ব প্রদান না করিয়া সঞ্চিত অর্থ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত, তাহারাও বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে তাহা উত্তোলন করিয়া রাজস্ব মিটাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে রায়রায়ান রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া রাজকোষ পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়ায় নবাবকে সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিছু মাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই। তিনি রায়রায়ান ও জগৎশেঠের সাহায্যে সেই বিপদ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

এইরূপ মন্ত্রীর প্রতি গুণগ্রাহী নবাব যে কিরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা বোধ হয় কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। তাহা হইলেও আমরা সাধারণের অবগতির জন্য সায়র মুতাক্ষরীণ হইতে কয়েক পংক্তির অনুবাদ করিয়া দেখাইতেছি যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ রায়রায়ানকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, মুতাক্ষরীণকার বলিতেছেন—"চায়েন রায় আশ্চর্য্য প্রকারের লোক ছিলেন, তিনি যেরূপ কার্য্যদক্ষ ছিলেন, সেইরূপ প্রভুভক্তও ছিলেন, তিনি কখনও ক্ষতিজনক কার্য্য করিতেন না। অল্প সময়ের মধ্যে চায়েন রায় এইরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, নবাবের জামাতৃগণ ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইতেন। যদি কেহ নবাবের নিকট কোন প্রকার সাহায্য বা সম্মানের প্রার্থী হইতেন, চায়েন রায়ের নিকট অগ্রে গমন না করিলে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইত না। চায়েন রায় যাবতীয় কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে করতলগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবাব তাঁহার প্রতি এতদূর সন্তুষ্ট ছিলেন যে, কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা কর্ণগোচর করাইলে তিনি তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না। কোন সময়ে তাঁহার মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদ ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণের সহিত চায়েন রায়ের তুলনা করিয়া তাঁহাদেরই প্রশংসা করিতেছিলেন। নবাব সৈয়দ আহম্মদের কথা শুনিয়া এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, যে, "ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ নবাবের ভৃত্য মাত্র ছিলেন, কিন্তু চায়েন রায় তাঁহার পক্ষে প্রভুস্বরূপ!"

মুতাক্ষরীণকারের উপরোক্ত বর্ণনা হইতে সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায় যে, চায়েন

রায়ের প্রতি নবাবের কিরূপ বিশ্বাস ছিল। বাস্তবিক তিনি আলিবর্দ্দীর অশান্তি-পূর্ণ রাজত্বে প্রকৃত প্রভুভক্ত কর্ম্মচারীর ন্যায় যেরূপ রাজস্ব কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে বিরল বলিয়াই বোধ হয়। সেইজন্য আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। আলিবর্দ্দীর রাজত্বকালেই চায়েন রায়ের মৃত্যু হয়। তজ্জন্য নবাব যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছিলেন। এরূপ কর্ম্মচারীর মৃত্যুতে যে নবাব ব্যথিত হইবেন, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। চায়েন রায়ের পরে নবাব তাঁহার সহকারী বীরুদত্তকে উক্ত পদ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রায়রায়ান উপাধি পান নাই। এই রাজস্বমন্ত্রী, দেওয়ান বা রায়রায়ান পদ মুর্শিদাবাদ নিজামতে চিরদিনই হিন্দুগণই পাইতেন।

চায়েন রায় হিন্দুস্থানী ছিলেন, তিনি বিহার কি উত্তরপশ্চিমবাসী তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি বিহারবাসীই হইবেন। সে যাহাই হউক মুর্শিদাবাদের কোথায় তাঁহার আবাসস্থান ছিল, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি। কাশীমবাজার ইংরেজ রেসিডেন্সীর সম্মুখে তদানীন্তন গঙ্গার উত্তর তীরে তাঁহার আবাসস্থান ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সেই স্থানের নাম সন্ন্যাসীডাঙ্গা। সন্ন্যাসীডাঙ্গা কাশীমবাজার রাজবাটীর সম্মুখস্থ কাটিগঙ্গার অপর পারে অবস্থিত। ইহারই পশ্চিম দিয়া এক্ষণে রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। চায়েন রায়ের আবাসস্থানের নাম সন্ন্যাসীডাঙ্গা কেন হইল, ইহা যে একটি কৌতূহলজনক বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই, যিনি রাজরাজেশ্বর মুর্শিদাবাদের নবাবের রাজস্বমন্ত্রী, ও তাঁহার দক্ষিণহস্ত তাঁহার আবাসস্থান কিরূপে সন্ন্যাসীর আবাসস্থান হইয়া সন্ন্যাসীডাঙ্গা নামে অভিহিত হইল, ইহা জানিতে সকলেরই ঔৎসুক্য হইতে পারে, আমরা ক্রমে সেই কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করিতেছি।

চায়েন রায় মুর্শিদাবাদ নিজামতের রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন। তিনি রায়চায়ান উপাধিতে ভূষিত। মুতাক্ষরীণকারের বর্ণনায় তাঁহার কিরূপ প্রভুত্ব ছিল, তাহাও সকলে অবগত হইয়াছেন, এবং নবাবও তাঁহাকে প্রভুস্বরূপ মনে করিতেন। কিন্তু সেই চায়েন রায়ের জীবনযাত্রার কথা অবগত হইলে সকলকে

বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হইবে। চায়েন রায় নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি বিবাহিত ছিলেন কি না তাহাও জানা যায় না। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে যে বহুদার গ্রহণ করিতে পারিতেন, এবং বহুপুত্রের পিতা হইতে পারিতেন, তাহা বোধ হয় আমরা অনায়াসে বলিতে পারি। কিন্তু চায়েন রায় তাহা না করিয়া আপনার অর্জ্জিত বিপুল অর্থ সাধুসেবায় ব্যয়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসস্থানের চারিপার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণের জন্য আবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, নানকপন্থী, দরবেশ প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও ফকীরগণ তাঁহার বাসভবনকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেন। সেইজন্য উক্ত স্থানের নাম সন্ন্যাসীডাঙ্গা হয়। চায়েন রায় সমস্ত দিবাভাগে রাজস্ববিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিয়া সেই সমস্ত সাধুগণের সহিত ধর্ম্মালোচনায় রজনী অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদের জন্য সদাব্রত ও ভাণ্ডারারও ব্যবস্থা দিল। নিজে নগ্নপদে সকলের আবাসস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এজন্য তিনি কাহারও নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। কেবল নিজের উপার্জ্জিত অর্থই ব্যয় করিতেন। এক সময়ে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে যাইতে যাইতে সন্ন্যাসী-ডাঙ্গার ব্যাপার অবগত হইয়া রায়রায়ানকে নিকট হইতে কিছু বৃত্তি লইবারজন্য অনুরোধ করেন। রায়রায়ান প্রথমে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অগত্যা স্বীকৃত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই বৃত্তির দ্বারা সন্ন্যাসী-ডাঙ্গায় অতিথি ফকীরের সম্বর্দ্ধনা হইয়া থাকে। এই সাধুসেবা ব্যতীত চায়েন রায় দেবসেবা ও লোকসেবারও ত্রুটিকরেন নাই। তিনি স্থানে স্থানে অনেক মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। এখনও সন্ন্যাসীডাঙ্গায় একটি ভগ্ন শিবমন্দির তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তদ্ভিন্ন দৌলতাবাদের নিকট চায়েনরায়ের তালাও ও অমরকুণ্ডের নিকট চায়েনডাঙ্গার পুষ্করিণী তাঁহার লোক-সেবার পরিচয় দিতেছে। তাঁহার বাসভবনের চিহ্ন ও একটি কূপ আজিও সন্ন্যাসী ডাঙ্গায় দেখিতে পাওয়া যায়। চায়েন রায় নিঃসন্তান হওয়ায় দুইটি শিষ্যের প্রতি তিনি এই সমস্ত সেবার ভারার্পণ করেন। তন্মধ্যে একজন

বিহারবাসী ও দ্বিতীয় বঙ্গবাসী। বঙ্গবাসীটি কায়স্থ সন্তান। এক্ষণে তাঁহার বংশধরেরা সন্ন্যাসীডাঙ্গায় বাস করিতেছেন, ও রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের বৃত্তিতে কোনরূপে অতিথি ফকীরের আতিথ্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। সন্ন্যাসীডাঙ্গায়কোন কোন সন্ন্যাসীর সমাধিও আছে। চায়েনরায়ের সম্পত্তি কালক্রমে বহরমপুরের সেন মহাশয়দিগের অধিকারে আসিয়াছে। সন্ন্যাসীডাঙ্গা এখন তাঁহাদেরই সম্পত্তি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

# বেণু ও বীণা।

নব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—সর্ব্বত্র প্রশংসিত। ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"তুমি যে কাব্য সাহিত্যে আপনার পথ কাটিয়া লইতে পারিবে তোমার এই প্রথম গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেন—"আপনার 'বেণু ও বীণা' পাঠ করিয়া অনেকদিনের পর একটু খাঁটি কবিত্ব রস উপভোগ করিলাম।"

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি বলেন—"তোমার 'বঙ্গজননী' 'ঝড় ও চারাগাছ' প্রভৃতি কবিতা চমৎকার।"

"বঙ্গবাসী" বলেন—"ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, ছন্দে, ঝঙ্কারে, কবির অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় এ গ্রন্থে পদে পদে।"

"অমৃত বাজার পত্রিকা" বলেন—"'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল' শীর্ষক গানটি অতি চমৎকার,—অমরতা লাভের যোগ্য।"

"বসুমতী" বলেন—"এই নবীন কবি বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে উৎসাহ লাভের যোগ্য পাত্র; তাঁহার কবিতার ভবিষ্যৎ গৌরবজনক, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।"

"যুগান্তর" বলেন—"সত্যেন্দ্র বাবুর কবিতাগুলি সুন্দর, তাঁহার লেখনী তেজোপূর্ণ কবিতা প্রসব করিয়া তাঁহার নাম অমর করুক ইহাই আমাদের কামনা।"

উপরোক্ত পুস্তক সমূহ ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরী এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

# দেবগণের ভারত ভ্রমণ।

বঙ্গভঙ্গে ভগ্নহৃদয় বাঙ্গালীর জাতিগত এক অভিনব জীবনীশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। ইহার মূলে দৈবশক্তি বর্ত্তমান। কিরূপে এই মৃতকল্পজাতির দীর্ঘকালব্যাপী অবসাদ-তিমিরে, দেবশক্তির বিজলীত-লীলা সম্ভবে, তাহারই আলোচনার জন্য, এবং কি উপায়ে সেই দেবপ্রসাদ, বঙ্গের ও তৎসঙ্গে সমগ্র ভারতের জাতিগত জীবনকে উদ্বুদ্ধ, সজীব ও সবল করিতে পারে, তাহারই উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন প্রয়াসে 'দেবগণের ভারত-ভ্রমণ' প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহার লেখনী হইতে অমর পুরুষ বিদ্যাসাগরের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী বাহির হইয়াছে, গ্রন্থকার সেই শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা এবং রাজসংস্করণ ৩৲। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। দুই খণ্ড বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের সকল সংবাদ এই পুস্তকে অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হইতেছে। পড়িবার জানিবার ও শিখিবার সকল কথাই দেবতারা উপদেশ দিতেছেন। এখন গ্রাহক হইয়া তিন খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা বা রাজসংস্করণের জন্য ১৷৷০ টাকা পাঠাইলেই ত্বরায় তিনখণ্ড পুস্তক পাইবেন। পূজার সময়ে "দেবগণের ভারত ভ্রমণ" সর্ব্বত্র পাঠ ও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক খণ্ড প্রত্যেক খণ্ডেই শেষ হইয়াছে। নিম্ন ঠিকানায় পুস্তক পাইবেন। ডাক খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

সমগ্র পুস্তক প্রকাশিত হইলে মূল্য ৩ টাকা ও রাজসংস্করণ ৪৲ টাকা হইবে।

মেকাফ প্রেস
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১৫ই ভাদ্র ১৩১৪।

প্রকাশক
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মুখ্য উদ্দেশ্য। সর্ব্বসাধারণের সুবিধাকল্পে আবার পন্থার মূল্যও অতীব অল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে। পন্থার আকার ডিমাই আটপেজি ৫ ফর্ম্মা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০ এক টাকা চারি আনা। মফঃস্বলে একটাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।—প্রকাশক বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বনিতার সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও ন্যাশনাল কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।

৮৭ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট অথবা ১১০।২ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত।

# বঙ্গদর্শন।

( নবপর্য্যায় ) সপ্তমবর্ষ।

বৈশাখ হইতে আরম্ভ, ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে; আশ্বিন সংখ্যা আশ্বিনের পূর্ব্বেই বাহির হইবে, এই কয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, প্রভৃতি প্রধান প্রধান লেখকগণের লেখা আছে। উপন্যাস, জীবনী, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কবিতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হইয়াছে; প্রবন্ধগৌরবই বঙ্গদর্শনের বিশেষত্ব। প্রবীণ ও নবীন প্রধান লেখকগণের এরূপ একত্র সমাবেশ-কুত্রাপি নাই, বঙ্গদর্শন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মুখপত্র, গত ছয় বৎসরে ইহাতে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট স্বদেশী রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্গদর্শনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৵০ ভিঃ পিতে, ৩।৵০ লাগে, নমুনার সংখ্যা ।০ আনা।

শ্রাবণে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "রাজভক্তি" নামক প্রবন্ধ ও তাহে

# দেশের কথা

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর

তৃতীয় সংস্করণ।

সুলভ সংস্করণ ]

[ মূল্য ৸৹ বার আনা।

---


**কলিকাতা, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।**

৩য় বর্ষ কার্ত্তিক—১৩১৪। ৭ম সংখ্যা।

সচিত্র

মাসিক পত্র।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি. এল.

সম্পাদিত।

[ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা ]

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত

# বাজী রাও।

( দ্বিতীয় সংস্করণ বহুলরূপে পরিবর্দ্ধিত )

( মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের উৎকৃষ্ট মানচিত্র সহ )

মূল্য আট আনা। কাপড়ে বাঁধাই বার আনা।

যে মহাপুরুষের যত্নে বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেতুহিমাচল স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন কাহিনী এই পুস্তকে অতীব চিত্তাকর্ষক ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সাম্রাজ্য নীতি ও যুদ্ধনীতিসম্বন্ধে বিশদ ও কৌতূহলপ্রদ আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনায় পাঠক রাজপুত, মারাঠা, মোগল, ইংরাজ, আফগান, বুয়র ও শিবাজী, বাজীরাও, নেপোলিয়ান প্রভৃতির যুদ্ধনীতির তুলনামূলক সমালোচনাও দেখিতে পাইবেন। মহারাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য ভারতীয় রাজশক্তির সহিত যুদ্ধে ইংরাজ যে নীতি অবলম্বন করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও পরিচয় এই সমালোচনায় প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক এই নূতন। শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেরই ইহা একবার পাঠ করা উচিত। আকার প্রথম সংস্করণের তুলনায় প্রায় ৭০ পৃষ্ঠা বাড়িয়াছে, অথচ সাধারণের সুবিধার জন্য মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা চারি আনা কম করা হইয়াছে।

বাজীরাও সম্বন্ধে সংবাদপত্রাদির অভিমত এই পুস্তকের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ঝান্সীর রাজকুমার | ... | ... | ॥০ |
| আনন্দীবাঈ | ... | ... | ॥০ |
| মহামতি রানাড়ে দ্বিতীয় সংস্করণ ( যন্ত্রস্থ ) | | | ।/০ |

---

কলিকাতার সমস্ত প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রথম ভাগ, ৭ম সংখ্যা। তৃতীয় পর্য্যায়। ১৩১৪, কার্ত্তিক।

শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় বি, এল.,—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সহকারী সম্পাদক।

## সূচী।



# নিয়মাবলী।

ঐতিহাসিক চিত্রের জন্য প্রবন্ধাদি, বিনিময়ার্থে পত্রিকা প্রভৃতি ও সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে বহরমপুর খাগড়া পোঃ মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় এবং টাকা কড়ি, চিঠি পত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপনের হারও কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও গ্রাহক করা যায় না। গ্রাহকগণ মূল্যাদি পাঠাইবার সময় বা অপর কোন বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিবার সময় নম্বর দিয়া লিখিবেন। মোড়কের উপর যে নম্বর থাকে তাহাই গ্রাহক নম্বর।

নূতন গ্রাহক হইলে "নূতন" কথাটি এবং নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বা ডাক টিকিট না পাঠাইলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

প্রতি মাসের পত্রিকা তৎপর মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা না পাইলে ১৫ই তারিখের মধ্যে না জানাইলে আমরা পুনরায় দিতে বাধ্য নহি। নমুনার জন্য ৵০ তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

ঐতিহাসিক চিত্র কার্য্যালয়,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্—কলিকাতা
মেট্‌কাফ্ প্রেস।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

# ভ্রম সংশোধন।

৩১৪ পৃষ্ঠা ৭ পংক্তি বন্দন স্থানে চন্দন।

৩১৪ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তি কৌশিক স্থানে কৌলিণ্য।

৩১৫ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তি রূপেস্বর স্থানে রূপেশ্বর।

৩১৬ পৃষ্ঠা ২ পংক্তিতে শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় প্রণীত রাজবল্লভের জীবনচরিত বসাইতে হইবে।

৩১৮ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তি রাজপ্রবর স্থানে রাজচন্দ্র।

৩১৮ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তিতে, রুদ্রযানি স্থানে রুদ্রমণি।

৩১৮ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তি কাহরিয়া স্থানে, কাহুরিয়া।

৩১৮ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তিতে পাত্রী স্থানে শ্রোত্রী।

৩১৮ পৃষ্ঠা ২৬ পংক্তিতে কথা স্থানে কন্যা।

# ঐতিহাসিক চিত্র।

## গৌড়ের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ

( ২ )

### বাইশগজি প্রাচীর।

দাখিল দরওয়াজার সম্মুখেই এক আকীর্ণ বসতিশূন্য নিরানন্দময় দৃশ্য নয়নগোচর হয়; তাহাতে নানা সৌধ অট্টালিকার বিপুল ভগ্নাবশেষ পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে। উহার কিছু দক্ষিণে বহুতর বাঁধ, তাহার একাধিকটির উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দরওয়াজা দণ্ডায়মান আছে। ইহার একটীর নাম—চাঁদ দরওয়াজা; প্রাসাদে প্রবেশের বিজয়-দ্বার (triumphal entry) রূপে ব্যবহৃত হইত। দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রাসাদ,—তাহার দুই একখানি দেওয়াল এখনও বিদ্যমান আছে। এই প্রাচীরের উচ্চতা ৬৬ ফিট, ঘনত্ব অতি বেশি; তন্নিমিত্ত উহা বাইশগজি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রাচীন পরিবেষ্টিত স্থানের পরিমাণ সাত শত গজ দীর্ঘ, আড়াই শত গজ প্রস্থ, এবং তিনটী অঙ্গনে বিভক্ত; উত্তর প্রাচীরটী আবার আরও কয়েক উপ-অংশে বিখণ্ডিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অতীতের সাক্ষীস্বরূপ কেবল স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষ, একটী ছোট সমাধি মন্দির এবং কক্ষ বিভিন্ন করা কয়েকখানি প্রাচীর মাত্র দণ্ডায়মান আছে। (১)

(১) মেজর ফ্রাঙ্কলিন এই প্রাসাদপ্রাচীরের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—
"The upper part of the parapet is decorated with a profusion of flower-

## খাদেম রসুল মসজেদ

প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে খাদেম রসুল মসজেদ
ইষ্টকে মহাপুরুষ মহম্মদের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে
হইয়াছে। মহাপুরুষের বংশধর হোসেন শাহ নামক একব্যক্তি নিজে ঐ ইষ্টক-খণ্ড নাকি মদিনা হইতে আনয়ন করেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলার রাজত্ব সময়ে ইষ্টক আনীত এবং মীরজাফর কর্ত্তৃক এই স্থানে স্থাপিত হয়। হর্ম্ম্যটি এখনও ভাল অবস্থাতেই আছে; উহার একটীমাত্র গম্বুজ এবং চারিকোণে চারিটী ক্ষুদ্র মিনার, কিন্তু উহার অঙ্গন অনেকাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তীর্থযাত্রি-দের নিকট এই মসজেদটী অতি ভক্তির জিনিষ এবং তদ্ধেতুই উহা ধ্বংসমুখ

work carved in the brick. The palace is entirely in ruins. It was formerly divided into three parts, viz. the public hall of audience, the dwelling house of the sovereign, and the imperial harem. As its western entrance formerly stood the famous Chand Darwazah, built of brick and stone in a rich style of Mussalman architecture. It is now verging daily to decay, though its remains are seen still magnificent."

ফ্রাঙ্কলিন বলেন যে, নিম্নলিখিত আরবি-লিপি খানি গোয়ামালতিতে পাওয়া যায়; তাহা একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের উপর তুগ্‌রা অক্ষরে বড় বড় করিয়া লিখিত হইয়াছে। আসল-লিপি-খানি ফ্রাঙ্কলিন মহোদয়ের হস্তগত হয়; তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই প্রাসাদ ও দরওজা এক পরাক্রমশালী ও সমৃদ্ধিশালী নরপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। লিপিখানির ভাবার্থ এই,—

"দয়াময় ও মঙ্গলময় পরমেশ্বর,—যিনি তন্দ্রা কিম্বা নিদ্রাভিভূত হন না,—তাঁহাকে সাধুবাদ।

সৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই প্রেরিত পুরুষ মহাম্মদকেও ধন্যবাদ, যিনি কৃপা করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া সত্য ও ন্যায়পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

তদীয় বংশধরগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হোক্—তাঁহারা সৎপথ প্রদর্শক।

তাঁহার সহচরগণেরও মঙ্গল হোক্,—যাঁহারা ভগবানের নিমিত্ত প্রকাশ্যে বা গোপনে এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

"অবশেষে তাঁহার উপর,—যিনি মহান্ ঈশ্বরের আশ্রয়ে বিশ্রাম যাইতেছেন। যুবরাজ পর-হিতৈষিতার বীজ বপন এবং পরপ্রীতির পুণ্য-সলিল সর্বণ করিয়াছেন; সুলতান বিশ্বের রক্ষক, ধর্ম্মের গুরু; পরমশ্রদ্ধাস্পদ সৈয়দাব্রজ সুপ্রসিদ্ধ বারবকশাহ স্বজাতির আদর্শ পুরুষ। সুলতান মহম্মদ শাহ ধর্ম্মাবতার শিরিয়া ও আরবের দুই Draks যুবরাজের ভ্রাতাদের সমতুল্য;

হইতে রক্ষিত হইয়াছে। মৌলায়ী নামক একব্যক্তির বিশেষ তত্ত্বাবধানে ঐ পদচিহ্ন রক্ষিত হইত। গৌড়ের মধ্যে ইহাই একমাত্র মস্জেদ—যাহার সংরক্ষণকল্পে এত সতর্কতা অবলম্বিত হয়।

৯৩৭ হিজরীতে ( ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ) নছরত শাহ কর্তৃক মস্জেদ নির্ম্মিত হয়। মধ্যদ্বারের উপর একটী লিপিখোদিত আছে, তাহার ভাবার্থ :—

"সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেন,—'কেহ একটী ভাল জিনিষ আনয়ন করিলে, তাহার দশগুণ অধিক পুরস্কৃত হয়।' এই পবিত্র বেদী ও তাহার প্রস্তর—যাহার উপর মহাপুরুষের পদচিহ্ন আছে, তাহা সৈয়দ আসরফ্ উল হোসেনীর পৌত্র, সম্রাট্ হোসেন শাহের পুত্র, প্রতাপশালী ও সওদাগর নরপতি নাছিরুদ্দীন আবুল মোজাফঃর নাছের হোসেন কর্তৃক স্থাপিত। ভগবান তাঁহার রাজ্য ও শাসন চিরস্থায়ী এবং তাঁহার অবস্থা ও পদমর্য্যাদা উন্নত করেন। ৯৩৭ হিজরী ( ১৫৩০—৩১ খৃষ্টাব্দ )।"

## খাদেমরসুল মসজেদের প্রবেশ দ্বার।

যে অঙ্গনে মস্জেদটী প্রতিষ্ঠিত তাহার উত্তর দ্বারে এক কৃষ্ণবর্ণ পাটার ( slab ) উপর ৮৮৫ হিজরীর একটী লিপি আছে। ইহা তাহার আদিম স্থান

পৃথিবীর কোনও রাজপুত্র অপেক্ষা সদাশয়তা ও দানশীলতায় ন্যূন নহেন; প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত। যাহার বাসস্থান স্বর্গের অনুরূপ, যাঁহার প্রাসাদ হতভাগ্যদের আশ্রয়স্থল।

"প্রাসাদের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ঐ জলধারা অবলোকন কর,—উহার জল স্বর্গীয় সলিলের ন্যায়, উহার স্রোতধারা প্রপীড়িতদিগের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করে।

"এই ভবনের মধ্যে আত্মা পরম প্রীতিতে বাস করে, চিরানন্দে অবস্থান করে।

"এই রাজপুত্র কর্ত্তৃকই ঐ জলাশয়ের একটী দরওয়াজা নির্ম্মিত হয়। এই দ্বার রাজপ্রাসাদে প্রবেশের মধ্যম দ্বার: শুভ রাজত্বারম্ভের প্রথম ৮৭১ হিজরীতে নির্ম্মিত হয়।

"এই নরপতির উন্নতির নিমিত্ত, আইস আমরা সর্ব্বশক্তিমানের নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করি, পর্য্যন্ত পক্ষিকুল এই উদ্যানে তাহাদের সুমিষ্ট স্বর-লহরী তরঙ্গায়িত করিবে।

"পৃথিবীর আশ্রয়। বিশ্ব ও ধর্ম্মের স্তম্ভ এবং সমর-বিজয়ী সুলতান বারবক্ শাহ,—তাঁহার ক্ষমতা ও রাজ্য ভগবান অক্ষুণ্ণ রাখুন ( হিজরী ৮৭১; খৃষ্টাব্দ ১৪৬৬ )।"

হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং শুনিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়ে বিধ
নিকটবর্ত্তী কোন এক মস্জেদে ইহা সংলগ্ন ছিল।

লিপির ভাবার্থ,—"মহাপুরুষ বলিয়াছেন····· ( পূর্ব্বের ন্যায় )। নরপতি
মহম্মদ্ শাহের পৌত্র, নরপতি বারবক্ শাহের পুত্র, নরপতি শামসুদ্দীন আবু
মোজাফঃর ইউসফ্ শাহের রাজত্ব কালে এই মস্জেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ই
সেই ক্ষমতাশালী খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত······( লিপি অপাঠ্য )"।

তারিখ ৮৮৫ হিজরী ১০ই রমজান। (১

(১) মেজর ফ্রাঙ্কলিন লিখিয়াছেন যে, এই মস্জেদের উচ্চতা ষোল ফিট এবং দৈর্ঘ্য
ফিট ; পূর্ব্বে কৃষ্ণ মার্ব্বেলের চারিটি মিনার ছিল, তন্মধ্যে তাহার সময়েই তিনটী স্থানান্তরিত হয়
মস্জেদের সম্মুখভাগে প্রস্তরের তিনটী খিলান, তাহার এক একটিতে প্রস্তরের এক এব
কক্ষ এবং সমগ্র সম্মুখভাগ অঙ্কিত লতাপুষ্পাদিসমন্বিত ও সুশোভিত।

মস্জেদের বারান্দায় একখানি মার্ব্বেলে পারস্যভাষায় একটী বয়াৎ খোদিত আছে। বয়া
একটী মোসলমান সাধুর সমাধি-বিবরণ এবং সমাহিত করার সন ১০৭১ হিজরী লিখিত হইয়াছে

লিপির ভাবার্থ,—তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বর্গীয় দূতের নিকট আত্মাকে অর্পণ করার পর পর
ম্বরের প্রেরিত পুরুষের পদতলে বিশ্রাম করিতেছেন। আমি যখন তাঁহার মৃত্যুর তারিখ অ
আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান করিতেছিলাম, তখন এই স্বর উত্থিত হয়,—'এই কৃপামন্দিরা প
কর'। এই শেষ দুই বাক্যের গূঢ়ার্থে মনের সাধারণ অর্থ নিহিত আছে।

৯৩৭ হিজরীর নছরত শাহের লিপি ব্যতীত ফ্রাঙ্কলিন ৯০৯ সালের আর এক খানি লিপি
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অর্থ,—'এই দরওয়াজা সুপ্রসিদ্ধ, মহাজ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ সুলতা
পবিত্রচেতা, সুখের অনুচর, ভগবানের প্রতিনিধি, ইস্লাম ও মোস্লেমের রক্ষক—আলাউদ্দ
আবুল মোজাফর শাহ হোসেন সুলতান বিন সৈয়দ আস্রফ-উল্ হোসেনীর রাজত্বকালে নির্ম্মিত
হইয়াছে। ভগবান তাঁহার সাম্রাজ্য জয়যুক্ত করুন। ৯০৯ হিজরী ২২ মহরম মাহা।'

মিঃ এ গ্রোট্ লিখিয়াছেন যে, এই লিপিফলক এই মস্জেদের একটি প্রবেশদ্বারের নি
পড়িয়াছিল এবং খুব সম্ভবতঃ ইহা এই মস্জেদেরই লিপি-ফলক।—"Franklin describ
this inscription as lying on the ground near a gateway of this mosqu
to which it is far more likely to belong than the Yusaf Shah inscriptio
which Mr. Ravenshaw seems to have found in its place.

I see that in Mr. Blochman's numbered list of Husain Shah's inscri
tions ( I. B A. S. 1873 part 1 page 202 ), he refers in a note to one of .
H. 909 from Gaur, published in Glazir's Report on Rangpore, 1873,
108.. Not having that report at hand, I cannot be certain that this is r
identical with Major Franklin's.

Outside of the Mosque, near the gate, Major Franklin found the te
of the Qoran, already cited before."

## ফতেখাঁর সমাধি-মন্দির।

নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অপর বহুতর মস্‌জেদ ও সমাধি মন্দিরের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাহার অধিকাংশই ভগ্নদশায় উপনীত। ফতেখাঁর সমাধি এখনও চিনিয়া বাহির করা যায়, কিন্তু Creighton-এর আবিষ্কৃত হোসেন শাহের সমাধির কোন নিদর্শনই নাই; এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। (১)

## দুর্গের পূর্ব্ব ফটক।

খাদেমরসুলের পার্শ্বেই দুর্গের পূর্ব্বদ্বার; তাহার গঠন-প্রণালী বর্ত্তমান কালের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহা নাকি সুজা শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই নগর পরিত্যক্ত হইবার বহুকাল পরে তিনি কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ইহার পুনঃ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। প্রাসাদে প্রবেশের এক পথ ও এই দ্বার একটী সেতুর দ্বারা সংযুক্ত থাকা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ইহার ইষ্টক এবং প্রস্তরের সমবায়ে গঠিত এবং গৌড়ের একমাত্র ধ্বংসাবশেষ যাহাতে আস্তরের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই দরওয়াজার কয়েক গজ দক্ষিণে আর একটী দরওয়াজা;—ইহা দুর্গে প্রবেশের গোপন-পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। এই রাস্তা সোজাসুজি জেলখানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

(১) ফ্রাঙ্কলিন বলেন যে, মস্‌জেদে একটি সুন্দর খিলানকরা দরওয়াজা দ্বারা প্রবেশ করিতে হয়; তাহার পার্শ্বদেশ ও সম্মুখভাগ স্বতন্ত্র ধরণে গ্রথিত, শ্বেত ও সবুজবর্ণের টাইল—দেখিতে আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়। কোণচতুষ্টয়ে প্রস্তরের উপর সুবৃহৎ গোলাপপুষ্প খোদিত হইয়াছে। মস্‌জেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিনারগুলি কৌতুককর লতাগুল্ম, ফলপুষ্প প্রভৃতির বৃক্ষে অলঙ্কৃত! দ্বারের মধ্যদেশে এক বৃহৎ পরিবেষ্টিত অংশের (এই বেষ্টনীর মধ্যে শাহ সুলতান হোসেন এবং রাজ-পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির মৃত দেহ সমাহিত হইয়াছে। পার্শ্বদেশও পূর্ব্বোক্ত সবুজ ও শ্বেতবর্ণে সজ্জিত করিয়া গ্রথিত হইয়াছে। স্ট্রোট্‌ বলেন,—"Major Franklin's description bears out the drawing of the tomb made by Creighton, who tells us that even in Orme's day British Engineers had largly utilized its ruins."

## মিনার।

পূর্ব্ব দরওয়াজা দিয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া, উত্তরদিকে অর্দ্ধমাইল পরিমাণ পথ অগ্রসর হইলে একটী সুন্দর মিনার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যদিও স্থানীয় অনেকের বিশ্বাস যে, উহার শিখরে পীর আসা নামক এক সাধু বাস করিতেন, তত্রাচ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উহা বিশ্বাসীদিগকে উপাসনার নিমিত্ত আহ্বান করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, ইহা আবিসিনিয়ান মালিক ইন্‌ডিল—যিনি দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ উপাধি গ্রহণ করতঃ ৮৯৪ হিজরীতে ( ১৪৮৮ খৃঃ ) সিংহাসনে আরোহণ করেন,—তৎ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। মিনারে উঠিবার একটী পেচাল ( spiral ) সিঁড়ি আছে, তাহা প্রায় ৮০ ফিট্ দীর্ঘ উচ্চে—শিখরের এক ক্ষুদ্র কক্ষে শেষ হইয়াছে। মিনারের মস্তক একটী গম্বুজে আবৃত ছিল, কালের চক্র বিঘূর্ণনে এখন তাহা স্খলিত হইয়াছে। দ্বারের খোপে ও চৌকাঠের উপরে উল্লেখযোগ্য কতিপয় হিন্দুচিত্র এবং শূকর-শিকারের স্পষ্ট প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মিনারের উচ্চতা ৭০ হইতে ৮০ ফিট এবং চতুঃপার্শ্বের ( Roundness ) পরিমাণ ৩২ ফিট। ইহা প্রস্তর ও ইষ্টকে নির্ম্মিত হইয়াছে; বুনিয়াদে মোটা সোটা কর্কশ মার্ব্বেল ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রবেশদ্বার সবুজ প্রস্তরে ( কষ্টি-পাথরে ) নির্ম্মিত এবং তাহার সম্মুখভাগে বড় বড় তিনটী গোলাপ-পুষ্প দ্বারা সুশোভিত। যে স্তম্ভের উপর দ্বার সংরক্ষিত, তাহাও আশ্চর্য্য রকমের লতা-পুষ্পাদি অঙ্কনে অলঙ্কৃত। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রস্তরময় ৭৩টী ধাপ অতিক্রম করিয়া আরোহণ করিতে পারিলে মিশরের শীর্ষস্থিত গম্বুজের নিকটস্থ হওয়া যায়, এই গম্বুজের অবস্থাও শোচনীয় ( ১ )।

( ১ ) মেজর ফ্রাঙ্কলিনের রিপোর্টে, গোয়ামালতিতে প্রাপ্ত একখানি প্রশাস্তির কিয়দংশের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই লিপিতে সম্রাট ফিরোজ শাহকেই ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। লিপিখানি তোগ্‌রা অক্ষরে লিখিত ; এক একটি অক্ষর নয় ইঞ্চি করিয়া দীর্ঘ। লিপির ভাবার্থ,—"ধর্ম্মের এবং বিশ্বের বল, ভগবৎ-পন্থার বীর, পরমেশ্বরের পরম করুণা-

## তাঁতিপাড়া মসজেদ।

নিশর হইতে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিলেই সরকারী রাস্তা পাওয়া যায়। এই রাস্তা দিয়া দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইলে অসংখ্য ভগ্নাবশেষের মধ্যে উপনীত হইতে হয়; তন্মধ্যে তাঁতিপাড়া মসজেদ উল্লেখ যোগ্য। উহার অর্দ্ধেক পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু যে অংশ দাঁড়াইয়া আছে তাহাই অতি সুন্দর এবং ( Embossed ) ইষ্টকের সুদৃশ্য অলঙ্কারে বিমণ্ডিত। মসজেদের অভ্যন্তর ভাগ প্রকাণ্ড প্রস্তর-স্তম্ভে সংরক্ষিত এবং পশ্চিমদিকে উপাসনার নিমিত্ত কতিপয় সুদৃশ্য মনোরম বেদী আছে। ইহার নির্ম্মাণের সন তারিখ অবগত হওয়া যায় না; তবে শুনিতে পাওয়া যায় ইহার একখানি প্রস্তর লিপিতে ইউসক শাহের উল্লেখ ছিল কিন্তু তাহা এখন দেখিবার উপায় নাই। ( ১ )

ময় প্রতিনিধি, অপ্রতিদ্বন্দী সুলতান সইফুদ্দীন ( Saifuddunya Waddin. )" লিপিখানি অসম্পূর্ণ হইলেও যে সুলতানের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাঁহাকে সেনাক্ত করা যাইতে পারে; তিনি সফিউদ্দীন আবুল মোজাফঃর ফিরোজশাহ ( দ্বিতীয়; ব্লাকম্যান্ সাহেবের প্রস্তুত তালিকার অষ্টাদশ বঙ্গ নরপতি। ষ্টুয়ার্ট ও রিয়াজ-উস্-সালাতিনের উপর নির্ভর করিয়া, মিনারের নির্ম্মাতা পূর্ব্বোক্ত সুলতান ফিরোজশাহ হাবসীকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এস্থলে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বোক্ত অসম্পূর্ণ লিপিখানি মিনারের কোনও স্থানে পাওয়া যায় না, পরন্ত তৎস্থান হইতে চারি মাইল উত্তরদিকাভিমুখে অবস্থিত গোয়ামালতী কুঠিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিপির লিখিত বিবরণের সহিত রিয়াজের বর্ণনা ঐক্য হওয়ায়, ফ্রাঙ্কলিন ইহাকে মিনারেরই গাত্র-লিপি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। রিয়াজ-উস্-সালাতিন একালের রচিত ( ১৭৮৭ খ্রী: অ: ) ইতিহাস হইলেও, গ্রন্থকর্ত্তা মুন্সি চাহেন বিভিন্ন হর্ম্ম্য অট্টালিকাদির নির্ম্মাণ তারিখ নির্দ্ধারণকল্পে প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এই আবিসিনিয়ান আক্রমণকারী, যিনি অপক্ষপাত ন্যায় বিচার এবং উদার বদান্যতার জন্য লিপি-সমূহে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তিনি মাত্র বর্ষ তিন ৮৯৩-৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

অবশেষে গ্রোটের নিজের কথাই উদ্ধৃত হইল,—"Franklin's inscription is probably that referred to by Mr. Fergusson in his description of this minar ( History of Indian and Eastern Architecture, P. 550 ), but its purport does not bear out this eminent archœologist in assigning the construction of the minar to Shamsuddin Firuz shah, who reigned in Western Bengal A. H. 702-722, or more than a century and a half earlier."

( ১ ) লাটান মসজেদের সমীপবর্ত্তী 'মাহাজানতলা' নামক মসজিদ হইতে ফ্রাঙ্কলিন যে লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁতিপাড়া মসজেদের এই কথিত লিপির সাদৃশ্য দেখান

## লাটান মসজেদ।

পূর্ব্বোক্ত মসজেদ হইতে অদূরে—দক্ষিণে লাটান বা চিত্রিত ( Painted ) মস্‌জেদ অবস্থিত। ইহার বহির্ভাগ প্রভূত পরিমাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অভ্যন্তরের অধিকাংশ স্থানই পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় আছে। মসজেদটী এক প্রকাণ্ড গম্বুজে আচ্ছন্ন; ইহাও ইউসফ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

গৌড়ের অপরাপর সৌধ অট্টালিকা অপেক্ষা এই মসজেদটিই ফ্রাঙ্কলিনের দৃষ্টি সমধিক আকর্ষণ করে; তিনি ইহাকে নাথু বা নর্ত্তকী বালিকার মস্‌জেদ ( Nathu or Dancing girl's Mosque ) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা প্রস্থে ৬০ ফিট এবং মেজে হইতে গম্বুজের চূড়া ৪০ ফিট দীর্ঘে; সমগ্র বহির্ভাগ নানাবর্ণের ( ঘন কৃষ্ণ, পীত, সবুজ, শ্বেত ) টাইলের সুন্দর চিত্রন দ্বারা সুশোভিত; টাইলগুলি দেখিতে ঠিক মার্ব্বেলের ন্যায় বোধ হয়। নানা বর্ণের টাইল নয়ন তৃপ্তিকর মনোরম স্থাপত্য কার্য্যসমন্বিত, ইষ্টকনির্ম্মিত আট জোড় মিনারেটে ( Minarats ) মসজেদের বহির্ভাগ সংরক্ষিত। ৩৫ ফিট উচ্চ, ৬৬ ফিট প্রস্থ এবং ডোম সহিত ৫০ ফিট দীর্ঘ একটী জাঁকাল রকমের

যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। প্রথমোক্ত লিপিখানির মর্ম্মানুবাদ,—"এই মস্‌জেদ সুপ্রসিদ্ধ নরপতি, ধর্ম্মের ও পৃথিবীর সূর্য্য, বারবক্‌শাহ সুলতানের পুত্র, মহম্মদশাহ সুলতানের পৌত্র,—সুলতান ইউসফ্‌ শাহের রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত। পরমেশ্বর তাঁহার রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখুন; ৮৮০ হিজরীর মহরম মাসের প্রথম দিনে নির্ম্মিত।"

তাঁতিপাড়া মস্‌জেদের উত্তর-পূর্ব্বে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে মাহাজানতলা মস্‌জেদ। ক্রায়টনের মানচিত্রে মহাজানতলার উল্লেখ আছে, কিন্তু তথাকার মস্‌জেদের কোনও চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। তাঁতিপাড়া মস্‌জেদই কেবল লাটান মস্‌জেদের নিকটবর্ত্তী। ক্রায়টনের মতে ৮৮৫ হিজরী বা ১৪৮০ অব্দে এই মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছে; তিনি ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাপ্ত একখানি লিপি দেখিয়া এই সন নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, কিন্তু লিপিখানি উদ্ধৃত বা তাহার অনুবাদ প্রদান করেন নাই। খাদেম রসুল মস্‌জেদের যে লিপির বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা, র‍্যাভেন-সার মতে অপর কোন স্থান হইতে স্থানান্তরিত এবং এই অপর স্থান বস্তুতঃ তাঁতিপাড়া।

খিলান বারান্দার মধ্য দিয়া মস্‌জেদে প্রবেশ করিতে হয়। এই বারান্দার উপর আর তিনটী ডোম উঠিয়াছে। বারান্দা দিয়া অগ্রসর হইয়া মস্‌জেদের প্রধান কক্ষ, যাহার পরিমাণ ৩৬ বর্গ ফিট ( Sq. ft. ) এবং যাহার মস্তকে সিরিয়া ধরণের আচ্ছাদন,—তাহাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়।

স্তম্ভগুলি আকারে কৃশ হইলেও আশ্চর্য্য ক্ষমতা-প্রভাবে, সেই বিপুলকায় গম্বুজগুলি একালপর্য্যন্ত মস্তকে ধারণ করিয়া আছে; স্তম্ভের দৈর্ঘ্য দশ ফিট। এই খিলান-প্রবেশদ্বারের সমস্ত ভিতরটার উপর চিত্রিত টাইলের অঙ্কন-নৈপুণ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বহু শতাব্দীর কালচক্র পরিবর্ত্তন সত্বেও অধিকাংশ স্থানেই আদিম বর্ণ রক্ষা করিয়া আছে। খিলানের অভ্যন্তর অংশের উপরিভাগ ইষ্টক গ্রথিত এবং ঠিক ফিরিঙ্গি-যোড়ের ( Dovetailed) আকারে নির্ম্মিত। মধ্যস্থানের ছয়টী খিলান ঘনব্লু ও শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট এবং অপর ছয়টী বিপরীত ভাবে শ্বেত, সবুজ, পীত বর্ণের টাইলে সজ্জিত। গম্বুজের নিম্নস্থান পর্য্যন্ত, এই হর্ম্ম্যের অভ্যন্তর ভাগের সমগ্র উপরের অংশটা ( Inner surface পূর্ব্বোক্ত প্রকারের টাইল সংযুক্ত। গম্বুজের নিম্নস্থান হইতে অতি সুন্দর সূক্ষ্ম তাবা খচিত ও মীনাহের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখের বহির্ভাগেও চারু স্থপতিকৌশলের নিদর্শন বিদ্যমান।

এই সুরম্য মস্‌জেদটী এক নর্ত্তকী রমণী-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয়। এক সময়ে সে তৎকালের সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্রী ছিল। মস্‌জেদের এই শোচনীয় অবস্থার সময়েও যিনি একবার উহা দর্শন করিয়াছেন, তাহাকেই ইহা সুচ্ছন্দে নির্ম্মিত জাঁকজমকশালী হর্ম্ম্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। গ্রোট বলেন যে, তিনি আবার হিন্দুস্থানের মধ্যে এরূপ সুন্দর অথচ হালকা গাঁথুনির ও সূতার অলঙ্কৃত ইমারৎ দ্বিতীয়টি দর্শন করেন নাই।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ তারিখে মালদহ জেলায় তৎকালিন অস্থায়ী কালেকটর মিঃ কিং গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ বিষয়ে সরকারে যে রিপোর্ট করেন, তাহার এক স্থলে লিখিত আছে,—"The Lattan Mosque, even in its present state, has a pleasing effect as a whole, but that the

fallen bricks have been spoiled by lying on the ground, and give no fair impression of the structure.' (১)

## কোতোয়ালী দরওয়াজা।

লাটান মসজেদ হইতে দুই মাইল অগ্রসর হইলে, নগরের দক্ষিণ প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। এই প্রাচীর ভেদ করিয়া এক সুন্দর খিলানের (যাহার নাম কোতোয়ালী দরওয়াজা) নিম্ন বহিয়া এক সাধারণ রাস্তা বিস্তৃত রহিয়াছে। খিলানটী ৪১ ফিট এবং উহার উভয় পার্শ্বে সামরিক সৈন্যসামন্তের অবস্থানের নিমিত্ত অর্দ্ধগোলকের কক্ষসমূহ বিদ্যমান। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইলেও গৌড়মণ্ডলীর মধ্যে তাহা অতি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য; উহার চতুঃপার্শ্বে তিন্তিড়ি বৃক্ষ-সমূহ দণ্ডায়মান এবং দেওয়ালের ফাটল হইতে পিপ্পল বৃক্ষ প্রভৃতি অনন্ত আকাশে মস্তকোত্তোলন করতঃ অতীত গৌরবের শোচনীয়ত্ব প্রদর্শন করিতেছে। (২)

(১) পশ্চিমের হলঘরের,—যথায় উপাসনার 'কিব্‌লা' বা বেদী ছিল, সেই কক্ষের মধ্যস্থলে খিলান সম্বন্ধে ক্রোট্‌ লিখিয়াছেন,—"In the centre of the Western hall is a magnificent arch, in which is placed the Kibla or niche where prayers. were performed according to the Mohammedan ritual. * * * The arch is decorated with much taste, having a profusion of carved foliage and trellis work. In each side of this niche are corresponding recesses in the wall, to preserve the uniformity of the building. The diameter of the lower circle of the dome is 60 ft.

There was formerly an inscription at the eastern entrance of the Mosque, placed over the doorway, which has been taken out and carried away. In front of the entrance is a spacious basin of excellent water it is 580 ft. in circumference. * * *

(২) মিঃ কিং তদীয় রিপোর্টে মহম্মদ শাহের ৮৬০ হিজরীর এক প্রশস্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নাকি পথপার্শ্ব হইতে মাইল খানেক তফাৎ পড়িয়াছিল ; এই প্রশস্তি এই দরওয়াজাতে ছিল বলিয়া তাঁহার ধারণা। পক্ষান্তরে ব্লক্‌ম্যান্‌ সাহেব, এই দরওয়াজার ভিতর হইতে সংগৃহীত একখানি লিপির উল্লেখ করিয়াছেন। (I. B. A. S. vol. XLIV, pt. i. p. 289),

কোতোয়ালী দরওয়জার উত্তর ও পূর্ব্বে,—পরিখা-কারার অভ্যন্তরেই ছোট সাগরদীঘী। এই সুন্দর জলাশয়টী উত্তরদিকের বৃহৎ সাগরদীঘীর সমকক্ষ হইতে না পারিলেও, ইহা দৈর্ঘ্যে এক হাজার গজ ও প্রস্থে চারিশত গজ এবং অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে উহার তীরে অগ্রসর হওয়া যায়। জলাশয়ের তীরে সুন্দর বিটপিনিচয় প্রভৃতির সজীবতার পরিচয় প্রদান করিতেছে,—তত্রাচ উহার সৌন্দর্য্য উপভোগের অসুবিধা হয়, এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট নহে।

জলে কোনরূপ লতাগুল্মাদি সঞ্জাত হয় নাই; তাহার কারণ জলাশয়ের তলদেশ নাকি বালুকাময়। বহুতর জল-প্রণালীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া প্রতীতি হয় যে, এই জলাশয় হইতেই রাজপ্রাসাদের এবং দুর্গের ব্যবহার্য্য জল সরবরাহ হইত।

জলাশয়ের উত্তর তীরে সমচতুরস্র বিশিষ্ট একটা সৌধের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়;—তাহা মাদ্রাসা বা কলেজগৃহ বলিয়া শুনা যায়। ইহার চতুঃসীমা দুইটী রেখাদ্বারা চিহ্নিত; এই ইমারতে যেরূপ granite ও মার্ব্বেল ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্রূপ গৌড়ের আর কোন অট্টালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় না। (১)

## ফিরোজপুর দরওয়াজা।

কোতোয়ালী ফটক দিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া বহু-প্রাকারের একবারে দক্ষিণের শেষ সীমায় উপনীত হওয়া যায়। চৌকাঠের উপরিভাগের বক্র অংশসমূহ এবং অগণিত ইষ্টকের সহিত খাড়াই গম্বুজগুলি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ইতস্ততঃ

তাহাতে পূর্ব্বোক্ত নরপতির শাসন সময়েই ৮৬২ হিজরীতে এক সেতু নির্ম্মাণের বিবরণ আছে। এই দরওয়াজার নিকটবর্ত্তী পাঁচটি arch এর জন্যই এই সেতু নির্ম্মিত হয়, বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। ফ্রাঙ্কলিনের সময় ইহা প্রকৃতরূপে ইষ্টক দ্বারা দোরস্ত ছিল।

(১) সম্ভবতঃ সম্রাট্ হোসেন শাহই এই মাদ্রাসা বা কলেজের আবিষ্কর্ত্তা। (See Inscription No. 10 of Blochmann's Contributions, No. II. J. B. A. S., vol. xliii. pt. i. p, 303)

বিক্ষিপ্ত থাকিয়া, এককালে তথায় লোকের ঘনবসতি থাকার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এইস্থলে পাঁচশত গজ দীর্ঘ ও দুইশত গজ প্রস্থ বলদীঘী ( Ballo-Dighi ) নামে দীর্ঘিকা বিদ্যমান আছে।

তথা হইতে দুই মাইল দূরে ফিরোজপুর জায়গীর; একটী সুউচ্চ ইষ্টক দ্বার দিয়া সাধু নিয়ামতুল্লার গৃহে প্রবিষ্ট হইতে হয়; তাহার বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন। একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর তীরে এই গৃহ অবস্থিত, তথায় একটী সাদাসিদে মসজেদও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সুন্দর গম্বুজবিশিষ্ট একটী অট্টালিকা,—যাহা এক সাধুর সমাধিমন্দির রূপে পরিচিত এবং যাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বাৎসরিক ছয় সহস্র টাকার জায়গীর প্রদত্ত হইয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমাধির চতুঃপার্শ্বে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধি-মন্দির আছে। উহার অধিপতি কতিপয় প্রাচীন-লিপি সংগ্রহ করেন, তন্মধ্যে একখানির অর্থ এইরূপ;—

"সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর বলেন,—'মসজেদসমূহ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সম্পত্তি।' এই ফটকের নির্ম্মাতা—খাঁনজাহান। ৯৭০ হিজরীর ১লা জুন—হজ্জা ( ১৫৬৩ খৃঃ ২২শে জুলাই )।"

১০৮০ হিজরীতে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) শাহ নিয়ামতুল্লা পরলোক গমন করেন; সম্ভবতঃ তৎপূর্ব্ব হইতেই গৌড়ের অধঃপতন সূচিত হইয়াছিল।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

ক্রমশঃ।

# বালাজী বিশ্বনাথ।

১।

কোঙ্কণ প্রদেশে, বোম্বাই দ্বীপের প্রায় ৪৫ মাইল দক্ষিণে "জঞ্জীরা" নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপটি এক্ষণে কুলাবা (কোলাবা) জেলার অন্তর্ভুক্ত। ইংরাজদিগের এদেশে রাজ্য-স্থাপনের পূর্ব্বে জঞ্জীরা দ্বীপ ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ আবিসীনীয় বা হাব্‌সীদিগের (১) অধিকার-ভুক্ত ছিল। হাব্‌সীগণ দক্ষিণাপথে "সিদ্দী" (এই শব্দ "সৈয়দী" শব্দের অপভ্রংশজাত) নামে ও তাঁহাদের পূর্ব্ব-অধিকৃত ভূমিভাগ অদ্যাপি "হাব্‌সান" নামে পরিচিত। হাব্‌সান প্রদেশের পরিমাণ ৩২৫ বর্গমাইল এবং উহার বর্ত্তমান রাজস্ব-সংক্রান্ত আয় বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা। আবিসীনীয়দিগের তদানীন্তন রাজধানী জঞ্জীরা দ্বীপে এক্ষণে ইংরাজের একজন সহকারী (আসিষ্ট্যাণ্ট) পোলিটিক্যাল এজেণ্ট বাস করেন।

জঞ্জীরা দ্বীপের ১২ মাইল দক্ষিণে বাণকোট নামক সাগর-প্রণালীর উত্তর তীরে, সাবিত্রী নদীর মোহানার নিকট "শ্রীবর্দ্ধন" নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রাম দণ্ডারাজপুরা ( Rajapoor ) সুবার অধীন ছিল। এক্ষণে এই গ্রামের লোক-সংখ্যা ন্যূনাধিক তিন সহস্র হইবে। কোঙ্কণের অন্তর্গত অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই গ্রামেও আম্র, পনস, নারিকেল, কদলী ও সুপারি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানকার সুপারি অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বত্র বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে

(১) অতি প্রাচীনকাল হইতে পশ্চিম ভারতের মালাবার উপকূলে আবিসীনীয়গণ বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করিতেন। ইঁহারা নৌ-বিদ্যায় সুপটু ছিলেন বলিয়া খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে আহম্মদনগরের নিজামশাহী সুলতানগণ ইঁহাদিগের হস্তে আপনাদের নৌসেনাবিভাগের ভার অর্পণ করেন। তদবধি জঞ্জীরা দ্বীপে আবিসীনীয়দিগের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্ত্তী কালে ইঁহাদিগের হস্তে মোগল নৌ-সেনার পরিচালন-ভারও অর্পিত হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বিবৃত করিব, সে সময়ে ইঁহারা নামে মোগল সম্রাটের অধীন হইলেও কার্য্যতঃ প্রায় স্বাধীন ভূপতিরই ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

এই গ্রাম বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। (২) বর্ত্তমান সময়ে শ্রীবর্দ্ধনের আর সে বাণিজ্য-শ্রী নাই। এক্ষণে উহা পেশওয়ে বংশের প্রতিষ্ঠাতা, বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্র-রাজ-মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথ ও মহাবীর বাজী রাওয়ের জন্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীবর্দ্ধনগ্রামে বর্ত্তমান সময়ের প্রায় সার্দ্ধ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম বিশ্বনাথ ভট্ট। তিনি গার্গ্য গোত্রোৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জনার্দ্দন ভট্ট ছিল। বিশ্বনাথ ভট্ট জঞ্জীরার সিদ্দীদিগের অধীনতায় শ্রীবর্দ্ধন পরগণার দেশমুখ এবং গোবেলে, বোরলই, মণ্ডলে ও মসলে এই চারিটি গ্রামের গ্রাম-লেখকের কার্য্য করিতেন। মহালের জমাবন্দীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও পরগণার রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কার্য্যের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। সে কালে রাজায় রাজায় বিবাদ ঘটিলে এই দেশমুখেরা যাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন, তাঁহার পক্ষে দেশ জয় করা সহজ সাধ্য হইত। দেশমুখেরা বিরোধী হইলে রাজার পক্ষে খাজনা আদায় বা দেশ শাসন করা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিত। শ্রীবর্দ্ধনের ভট্টবংশের হস্তে দেশমুখের কার্য্য-ভার ন্যস্ত থাকায় দেশে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ও মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সম্বন্ধ ছিল।

বিশ্বনাথ ভট্ট চারিটি পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথম পুত্র কৃষ্ণাজী ও তৃতীয় পুত্র রুদ্রাজীর কোনও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয়, তাঁহারা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র জানোজী বা জনার্দ্দন ভট্ট পৈতৃক পদের উত্তরাধিকারিরূপে শ্রীবর্দ্ধনে থাকিয়া দেশমুখের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বিশ্বনাথ ভট্টের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বালাজী। বালাজী

(২) এই প্রসঙ্গে সেকালের ভারতীয় বাণিজ্যের বিস্তার-বাহুল্য সম্বন্ধে জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি উদ্ধারের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—We must not suppose that the Indian trade was a small trade in those days. For bulk and value the commerce that now floats on Indiam waters is beyond all precedent, but we suspect from all we can learn that India then monopolised as large a proprotion of the gross trade of the world as she does at present. J. Douglas—*Bombay and Westen India* vol. Pp 113-14.

বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও অসাধারণ গুণ-গরিমায় সমগ্র মহারাষ্ট্র-সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইনিই পরিশেষে মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়া "পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহারাষ্ট্র দেশে আত্ম-নামের সহিত পিতৃনাম সংযুক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় বালাজীর নামের সঙ্গে তাঁহার পিতার "বিশ্বনাথ" নাম সাধারণতঃ একত্র লিখিত হইয়া থাকে। বালাজী বিশ্বনাথ স্বজন-সমাজে বালাজী পন্ত নামে পরিচিত ছিলেন। (৩)

বালাজী বিশ্বনাথের জন্মাব্দের উল্লেখ কোনও প্রাচীন গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হয় না। তবে বাজী রাওয়ের জন্মকাল ধরিয়া বিচার করিলে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে বা তৎসম-সময়ে বালাজীর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বাল্যকাল হইতেই বালাজী অত্যন্ত উদ্যমশীল ও স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। যৌবনে পদার্পণের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত তিনি পৈতৃক পদের কার্য্য-পরিচালন-বিষয়ে অগ্রজ জানোজীর সহকারিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্তের স্বাধীনতা-বশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই সিদ্দী কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার এরূপ মনোমালিন্য ঘটিল যে, তিনি শ্রীবর্দ্ধন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। (১৬৯৭ খৃঃ) ঐ সময়ে সিদ্দীদিগের অধীন 'দাভোল' প্রদেশে আবাজী বল্লাল (সাতারা গেজেটীয়ারে বর্ণিত আওজী বল্লাল) নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় সুভেদারের কার্য্য করিতেন। বালাজীপন্ত তাঁহার আশ্রয়ে "চিপ্‌লুণ" তালুকের কর-সংগ্রহের ভার এবং "মাঁঠবন্দর" নামক স্থানের লবণের কারখানাগুলির ইজারা গ্রহণ করিলেন। চিপলুণ সহর (এক্ষণে গ্রাম) সমুদ্র তীর হইতে ২৫ মাইল দূরে ও বাসিষ্ঠী নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া সে কালে কোঙ্কণ প্রদেশের একটি অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। এই স্থান এক্ষণে রত্নাগিরি জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রীয় রীতি অনুসারে কিশোর বয়সেই বালাজীর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীর নাম রাধাবাঈ। রাধাবাঈর গর্ভে বালাজীপন্ত দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে চিপলুণে গমন করিবার প্রায়

(৩) "পন্ত" শব্দটি পণ্ডিত শব্দের অপভ্রংশ-জাত। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের নামে শেষে যেরূপ "ঠাকুর" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মহারাষ্ট্র দেশে সেইরূপ পন্ত শব্দের প্রয়োগ সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়।

দুই বৎসর পরে তাঁহার প্রথম পুত্র, বর্ণিতব্য ইতিহাসের নায়ক মহাবীর বাজী রাওয়ের জন্ম হয়। (১৬৯৯ খ্রীঃ) ইহার দুই বৎসর পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র চিমণাজী আপ্পা ভূমিষ্ঠ হন। (১৭০১ খ্রীঃ)

চিপলুণে গমন করায় বালাজী পন্তের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। যুবা বয়স হইতেই বালাজীর হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল। চিপ্‌লুণে গমন করিয়া তিনি সেই ধর্ম্মভাবের পরিবর্দ্ধন করিবার বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হন। চিপলুণের অতি নিকটে "পরশুরাম ক্ষেত্রে" শ্রীমদ্‌ ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী নামক একজন প্রসিদ্ধ পরমহংস বাস করিতেন (৪)। তাঁহার যোগবলের অদ্ভুত আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া বালাজী তাঁহার মঠে গমন করিলেন। তদবধি ক্রমশঃ তাঁহার সহিত বালাজী পন্তের পরিচয় ঘনীভূত হইতে লাগিল। পরিশেষে বালাজী স্বামীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সে সময়ের প্রায় সমস্ত গণ্যমান্য মহারাষ্ট্রবাসীই এই মহাপুরুষের নিকট জ্ঞানভক্তির উপদেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। স্বয়ং মহারাষ্ট্রপতি তাঁহার প্রতি অপরিমেয় ভক্তি ও সম্মান প্রকাশ করিতেন। জঞ্জীরায় সিদ্দীদিগেরও অনেকেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন। উন্দেরী দুর্গের অধ্যক্ষ সিদ্দী সুরুর ইয়াকুদ খান এই হিন্দু ফকিরের সেবা করিয়া জঞ্জীরার সিংহাসন লাভ (১৭০৬ খ্রীঃ) করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেকালের অনেক কাগজ-পত্রে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়াকুদ খান স্বামীজীকে তাঁহার মঠের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য যে তিনটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা মঠের উত্তরাধিকারিগণ ভোগ করিতেছেন। একদা

(৪) বেরার অঞ্চলে "দুধেবাড়ী" নামক গ্রামে সম্ভবতঃ ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃমাতৃ দত্ত নাম "বিষ্ণু পন্ত" ছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায় নানা রূপে বিপন্ন হইয়া তিনি সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হন। তৎপরে কিছু দিন গণপতির উপাসনা করিয়া পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তিনি বারাণসীতে গমন পূর্ব্বক বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও তত্রত্য জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী নামক কোনও প্রখ্যাত পরমহংসের নিকট ব্রহ্ম-বিদ্যার দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি বিষ্ণু পন্ত "শ্রীমদ্‌ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী" নামে পরিচিত হইলেন। চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যান্ত বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া তিনি তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হন। এবং উত্তরে বদরী নারায়ণ হইতে দক্ষিণে সেতু বন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থক্ষেত্রাদির দর্শন করিয়া ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কোঙ্কণে উপস্থিত হইলেন। তথায় চিপ্‌লুণের নিকটবর্ত্তী পরশুরাম ক্ষেত্রে কয়েক বর্ষ অজ্ঞাতবাস পূর্ব্বক কঠোর তপস্যার পর তিনি একটি মঠ স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

সিদ্দীদিগের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী তাঁহাদিগের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব মহারাষ্ট্র প্রদেশে চলিয়া যান। তখন সিদ্দীগণ তাঁহাকে স্বরাজ্য মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বহু যত্ন করিয়াছিলেন (৫)। ফলকথা, সে সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী হিন্দু, মুসলমান, ধনী, দরিদ্র, রাজা প্রজা সকলেরই পূজনীয় ছিলেন। এরূপ একজন দেশপূজ্য মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া বালাজী বিশ্বনাথ যে আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

বালাজীর গুণোন্নত চরিত্র-দর্শনে অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের অনুগ্রহ-লাভের ফলে বালাজীরও জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তিনি পরমহংসের নিকট যে কেবল ধর্ম্মোপদেশই লাভ করিতেন তাহা নহে, রাজনীতিক বিষয়েও বহু প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং সময়ে সময়ে বিপুল অর্থ-সাহায্য পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতেন। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে মহাত্মা রামদাস স্বামী যেরূপ ছত্রপতি শিবাজী ও মারাঠা সর্দ্দারগণকে ধর্ম্মনীতির সহিত রাজনীতি বিষয়েও পরামর্শ দান করিতেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী সেইরূপ মহারাষ্ট্রপতিগণকে ও দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে রাজনীতিক চক্র-পরিচালন বিষয়ে বহু পরিমাণে সহায়তা করিতেন। দেশের রাজনীতিক অবস্থা তাঁহার নিকট করতলামলকবৎ সুবিদিত ছিল যাহাতে মহারাষ্ট্র-ধর্ম্মের ও মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা যত্ন প্রকাশ করিতেন। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজ রাজারাম যখন জিঞ্জী দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন মহারাষ্ট্রদেশে যে ঘোর রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর সাহায্যে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিশেষভাবেই উপকৃত হইয়াছিলেন। তদবধি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র দেশে যে সকল রাজনীতিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশেরই সহিত এই মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্রব ছিল। অত্যাচারী ও বিধর্ম্মীর সহিত যুদ্ধে প্রণোদিত করিবার সময় তিনি মহারাষ্ট্রীয় সেনানীদিগকে রামায়ণ-মহাভারতোক্ত বীরান্দের সহিত তুলিত করিয়া উদ্দীপনাপূর্ণ পত্র লিখিতেন। কেবল তাহাই

(৫) এবিষয়ে সিদ্দীমসুরের পুত্র সিদ্দীসথুল ও রাজাপুরের সুভেদার সদি ইয়াকুবের লিখিত অনেক খানি মূল পত্র আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। (পারসনীস কৃত শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর চরিত্র ও পত্র-ব্যবহার—পৃষ্ঠা ২২৯ হইতে ২৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

নহে, বন্দুক, কামান ও অসি-ভল্লাদি অস্ত্র-দানেও তিনি তাঁহাদিগের সহায়ত করিতেন। সমর-বিজয়ী সেনানিগণ দেবানুগ্রহের চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহার নিকট অস্ত্র-শস্ত্রাদি লাভে পুরস্কৃত হইয়া আপনাদিগকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেন তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তিতে সাধারণের বিশ্বাস থাকায় তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনেক সময়েই দেশের রাজপুরুষদিগের দ্বারা দৈব আদেশরূপে প্রতিপালিত হইত এবং উহা তাঁহাদের অধিকাংশ কার্য্যকে ধর্ম্মভাবে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিত। অধিকাংশ মহারাষ্ট্র সর্দারের জননী ও গৃহিণীগণ তাঁহাদিগের পুত্র ও স্বামী প্রভৃতির মঙ্গলের জন্য তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ ও প্রসা প্রার্থনা করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পত্র লিখিতেন। পরমহংস ব্রহ্মেন্দ্রও তাঁহাদিগকে মন্ত্রপূত কবচাদি প্রেরণ-পূর্ব্বক সেতু-নির্ম্মাণ ও কূপ-খননাদি জন-হিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে অনুরোধ করিতেন। লোকে তাঁহাকে ভার্গবের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত।

শ্রীবর্দ্ধন পরিত্যাগের পর চিপ্‌লুণে আসিয়াই ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর ন্যায় দেশের অবস্থাভিজ্ঞ রাজনীতি-কুশল পরমহংসের সংসর্গে বালাজী বিশ্বনাথ যে জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার ভাবী উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইতেছিল, সন্দেহ নাই। বালাজীর স্বাভাবিক মনস্বিতা ও কার্য্যতৎপরাদি গুণের পরিচয় পাইয়া ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীও তাঁহাকে দেশের কার্য্য সাধন করিবার উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়া ছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেশের অবস্থা ও মহারাষ্ট্র বাসীর কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেন। পরমহংসের প্রতি বালাজীরও দিন দিন শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছিল। রাজধানীতে গমন করিয়া কর্ম্মবহুল রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে বালাজী বিশ্বনাথ যে স্বয়ং উচ্চপদ লাভ করিয়া মহারাষ্ট্র রাজ্যের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইবেন, এই বিশ্বাস পরম হংসের মনে ক্রমেই বদ্ধমূল হইতেছিল। এই কারণে তিনি বালাজীকে রাজধানীতে প্রেরণ করিবার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন সময়ে একটি বিশেষ ঘটনায় পরমহংসের সংকল্প-সিদ্ধির সুযোগ ঘটিল।

এই সময়ে সিদ্দী কাসিমখান জঞ্জীরা দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয়ে প্রীত হইয়া মোগল সম্রাট অওরঙ্গজেব তাঁহাকে মোগল নৌ-সেনার অধিনায়কত্ব দান করিয়াছিলেন। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর সময় হইতে সিদ্দী কাশিম মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। এই কারণে মারাঠা সেনানায়কগণের সহিত তাঁহার প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিত। হাব্‌সী রাজ্যে হিন্দু প্রজাদিগের উপর অত্যাচারও নিতান্ত অ

হইত না। এই কারণে, তাঁহাদের প্রকৃতিপুঞ্জ ও সর্দ্দারগণ একবার মহাত্মা শিবাজীকে সিদ্দীরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। অনেক হিন্দু সিদ্দীর রাজ্য হইতে শিবাজীর রাজ্যে গিয়া বাস করিতেন। শিবাজী নয় বার অভিযান করিয়াও সিদ্দীদিগের উচ্ছেদ সাধন বা সম্পূর্ণ দমন করিতে পারেন নাই।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিকার লইয়া তদানীন্তন মহারাষ্ট্রীয় নৌ-সেনার অধিপতি কাহ্নোজী আংগ্রের সহিত সিদ্দীগণের শত্রুতা চলিতেছিল। (৭) ফলে হিন্দু প্রজার উপরে অত্যাচারও বৃদ্ধি পাইতেছিল। বাজী রাও যখন অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে প্রতিবেশী বালক-

(৭) আংগ্রেবংশের আদিপুরুষের নাম সেখোজী শঙ্কপাল। সহ্যাদ্রির পশ্চিমাঞ্চলস্থিত উপত্যকায় "আংগরবাড়ী" নামক গ্রামে সেখোজীর নিবাস ছিল। ঐ গ্রামের নামানুসারে তাঁহার বংশধরগণ "আংগ্রে" নামে পরিচিত হন। "কুলবা গেজেটিয়ারে" আংগ্রেদিগকে আফ্রিকার আদিম নিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মহারাষ্ট্র সমাজে তাঁহারা প্রসিদ্ধ "ছিয়ানব্বই কুলের ক্ষত্রিয়দিগের" অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। সেখোজীর পুত্র তুকোজী আংগ্রে ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর নৌ-সেনা-বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তুকোজীর পুত্র কাহ্নোজী বাল্যকাল হইতে পিতার সাহচর্য্য করিয়া জলযুদ্ধে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তুকোজীর মৃত্যু ঘটিলে কাহ্নোজী মহারাষ্ট্র নৌ-বলের একাংশের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। তদবধি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় দেড় শত বর্ষ কাল আরব সমুদ্রে আংগ্রেদিগের প্রাধান্য ছিল। আংগ্রেবংশের অভ্যুদয়কালে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ১১০ মাইল দীর্ঘ ও ৩০ হইতে ৬০ মাইল পরিসর ভূভাগে তাঁহাদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহারাজ সম্ভাজীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রদেশে যে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাতে সিদ্দী, মোগল ও পোর্ত্তুগীজদিগের কবল হইতে কাহ্নোজী আংগ্রের বাহুবলেই মহারাষ্ট্র রাজ্যের পশ্চিমাংশ রক্ষা পাইয়াছিল। সেই দুঃসময়ে কাহ্নোজী পূর্ব্বোক্ত শত্রুদিগকে জল-যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী মহারাষ্ট্রীয় দুর্গগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা কাহ্নোজীর ভয়ে সর্ব্বদা কম্পমান হইতেন। কাহ্নোজী ইংরাজদিগের ১টি, ফরাসীদিগের ১টি ও ওলন্দাজদিগের ৩টি বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন। পোর্ত্তুগীজ ও সিদ্দীদিগের সাহায্য লইয়াও ইংরাজেরা কাহ্নোজীকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। আংগ্রের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বোম্বায়ে এক দল স্বতন্ত্র নৌসেনা সর্ব্বদা সজ্জিত রাখিতে হইয়াছিল। আংগ্রেবংশীয় রমণীরাও জলযুদ্ধে অসাধারণ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। জয়সিংহ আংগ্রের স্ত্রী সকওয়ার বাঈ ও রঘুজী আংগ্রের স্ত্রী আনন্দী বাঈর শৌর্য্য সাহস ও সমর-কৌশলের কথা ইংরাজের লিখিত ইতিহাসেও পাঠক দেখিতে পাইবেন।

কাহ্নোজী আংগ্রে শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং ও তাঁহার পরিবারের প্রায় সকলেই স্বামীজীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি পরমহংসকে যে সকল পত্র

গণের সহিত শৈশব ক্রীড়ার আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাহ্নোজী আংগ্রে ও সিদ্দী কাশিমের বিবাদানল অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে কাহ্নোজী সিদ্দীর কর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিয়া স্বদলভুক্ত করিবার চেষ্ট করিতেছিলেন। ইত্যবসরে, বালাজী বিশ্বনাথ গোপনে আংগ্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, এবং সিদ্দীর কর্ম্মচারীদিগকে আংগ্রের পক্ষবলম্বন করিতে প্ররোচিত করিতেছেন—এইরূপ সংবাদ সিদ্দী কাসিমের কর্ণগোচর হয়। জঞ্জীরার রাজপুরুষদিগের সহিত বালাজীর পূর্ব্বাবধিই অসদ্ভাব ছিল। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত রটনা যতদূর সত্য হউক, কাশিম তাহাতে সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। এই ষড়যন্ত্র-বিষয়ক জনরব নিতান্ত ভিত্তিহীন ছিল বলিয়াও বোধ হয় না। বরং হিন্দু প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি অত্যাচারকারী সিদ্দীদিগের শাসন বিপর্য্যস্ত করিয়া পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র শক্তিকে নিষ্কণ্টক করিবার চেষ্টায় যে পরমহংস ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর উভয় শিষ্য—কাহ্নোজী আংগ্রে ও বালাজী বিশ্বনাথ গোপনে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। বালাজীর দুর্ভাগ্যক্রমে এই ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রকাশ পাওয়ায় সিদ্দী কাশিম ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীবর্দ্ধনের ভট্টপরিবারকে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। ফলে

লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহাকে সুশিক্ষিত ও বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়াই ধারণা জন্মে। কিন্তু ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা কাহ্নোজীকে একজন প্রকাণ্ড জল দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ, মহাত্মা শিবাজী যেরূপ বিপক্ষের বল-হানি ও দেশের স্বাধীনতা সম্পাদনার্থ আরব্ধ যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার জন্য সময়ে সময়ে শত্রুপক্ষের গ্রামনগরাদি লুণ্ঠন করিতেন, কাহ্নোজী আংগ্রেকেও সেইরূপ করিতে হইত। মেওয়াড়ের প্রাতঃস্মরণীয় রাণা প্রতাপকেও এইরূপ লুণ্ঠন করিয়া যুদ্ধব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া যেরূপ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার সমর্থন কিছুতেই করা যায় না। জেম্‌স্ ডগলাস সাহেব তাঁহার Bombay and Western India নামক গ্রন্থে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সে সময়ে সোমালি, সিদ্দী, আরব, পর্টুগীজ ও মহারাষ্ট্রীয়গণ সুবিধা পাইলেই সমুদ্রে দস্যুতা করিত। পোর্ত্তুগীজ প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ জাতিরাও দস্যু-বৃত্তিতে অতীব নিপুণ ছিল। কিন্তু ইংরাজদের মত নৃশংসভাবে দস্যুতা করিতে আর কেহই পারিত না। তাহার পর মারাঠা ও ইংরাজ জলদস্যুর তুলনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

The Maratha pirate was bad the English was worse, for he had learned more and profited a great deal less The trade was new to the one, and heriditary to the other. Kidd and Evory and Green are the names of some of these ruffians who committed robbery and murder on high seas, and the scope and duration of their enemies far exceeded those of any individual attack on life and property on land. Their sweep was wide as the Indian Peninsula and adjacent seas......pp 119-20.

বালাজীর অগ্রজ জানোজী ধৃত হন। সিদ্দী কাশিম তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা করেন। হতভাগ্য জানোজীকে একটি গোণীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত করা হইল! (১৭০১ খ্রীঃ)

এই দুর্ঘটনায় অতিমাত্র ভীত হইয়া বালাজী বিশ্বনাথ আত্ম-রক্ষার জন্য সপরিবারে সিদ্দীদিগের অধিকার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বাণকোট প্রণালীর দক্ষিণ-তীরস্থিত "ওয়েলাস" গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে হরি মহাদেব ভানু নামে এক সজ্জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বালাজীর সহিত তাঁহার পূর্ব্বপরিচয় ছিল। বালাজী তাঁহাকে আপনার বিপদ্‌বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, কাঙ্কণ-পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহ্যাদ্রির পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত মহারাষ্ট্র রাজধানী সাতারায় গিয়া নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াই তিনি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর পরামর্শক্রমেই বালাজী রাজধানীতে গমন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তদানীন্তন পেশওয়ে (মহারাষ্ট্র রাজমন্ত্রী) ভৈরবপন্ত পিঙ্গলের প্রিয় সর্দ্দার চিমনাজী দামোদরের সহিত পরমহংসের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাজপ্রতিনিধি পরশুরাম ত্র্যম্বক ও উচ্চপদস্থ অন্যান্য রাজপুরুষেরাও পরমহংসকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং রাজধানীতে গমন করিলে পরমহংসের অনুগ্রহে তাঁহার পৃষ্ঠবলের বিশেষ অভাব হইবে না জানিয়া বালাজী রাজধানীতে গমন করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। "সাতারায় গমন কর, তোমার ভাগ্যোদয় হইবে"—যাত্রাকালে গুরুদেবের এই আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া বাজী রাও ও চিমণাজি আপ্পানামক দুই শিশু পুত্র, জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণাজী বিশ্বনাথের বিধবা পুত্রবধূ গোদাবরী বাঈ এবং সহধর্ম্মিণী রাধা বাঈকে সঙ্গে লইয়া বালাজী বিশ্বনাথ দেশত্যাগী হইলেন। ওয়েলাস-নিবাসী ভানু পরিবারের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। বিশেষতঃ অত্যাচারী সিদ্দীর রাজ্যে বাস করিতে তাঁহাদিগেরও অনিচ্ছা ছিল। এই কারণে হরি মহাদেব ভানু দুই ভ্রাতা সহ (বালাজী পন্তের আশ্রয়ে অর্থোপার্জ্জন করিবার সুবিধা পাইবেন ভাবিয়া) তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। বন্ধু বৎসল বালাজী তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, তিনি যাহা উপার্জ্জন করিবেন, তাহার একাংশ ভানু পরিবারের সাহায্যার্থে দান করিতে বিস্মৃত হইবেন না। (৮)

(৮) বালাজী বিশ্বনাথ ও তাঁহার বংশধরগণ শেষ পর্য্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর (পেশওয়ের) পদ প্রাপ্ত হইলে হরি মহাদেব ভানুকে আপনার অধীন কড়ুনবীসের (Audit বা হিসাব পরীক্ষকের)

অতঃপর ভট্ট ও ভানু কিয়ৎ দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই সিদ্দীর অনুচরগণের দ্বারা বালাজী ধৃত ও "অঞ্জনবেল" দুর্গে বন্দিভাবে প্রেরিত হন। অঞ্জনবেল দুর্গ প্রসিদ্ধ সুবর্ণ দুর্গের ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সিদ্দীর আদেশে বালাজীকে সপরিবারে (পুত্র বাজী রাও ও চিমণাজী আপ্পা, স্ত্রী রাধাবাঈ ও জ্যেষ্ঠাগ্রজ কৃষ্ণাজী বিশ্বনাথের পুত্রবধূ গোদাবরী বাঈ সহ) ঐ দুর্গে বাস করিতে হয়। ঐ বিপৎকালে হরি মহাদেব ভানু ও তাঁহার উভয় সহোদর বহু যত্ন করিয়া অঞ্জনবেলের দুর্গপতিকে বশীভূত করেন। ফলে বালাজীর মুক্তিলাভ ঘটে। তখন সহ্যাদ্রি উত্তীর্ণ হইয়া ভট্ট ও ভানু পুণার নিকটস্থিত "সাসবড়" গ্রামে উপস্থিত হইয়া ঐ গ্রামের কুলকরণী ও দেশপাণ্ডে (১) অম্বাজী ত্র্যম্বক পুরন্দরে (গ্রাণ্টডফ বর্ণিত আবাজী পন্ত পুরন্দরের) বাটীতে গমন করিলেন। অম্বাজীপন্তও উদ্যমশীল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভট্ট ও ভানুর উদ্দেশ্য অবগত হইয়া উন্নতিলাভের আশায় তাঁহাদিগের সহিত মহারাষ্ট্র দেশের তদানীন্তন রাজধানী সাতারা নগরীতে গমন করিলেন। অম্বাজীর আশা বিফল হয় নাই। বালাজী বিশ্বনাথ মহারাষ্ট্র রাজ্যের মন্ত্রিত্ব লাভ করিলে অম্বাজীকে স্বীয় মুতালিক বা উপমন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

পদ প্রদান করেন। বালাজীর বংশধরদিগের সময় পরে ঐ পদ ভানুপরিবারের বংশানুগত হইয়াছিল। ভানুবংশীয়েরাও নানা সময়ে পেশওয়েদিগকে অকৃত্রিম সহায়তা করিয়াছিলেন। মাধবরাও পেশওয়ের মৃত্যুর পর এই ভানুবংশীয় বালাজী জনার্দ্দন ওরফে নানা ফড়নবীস মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করিয়া বিবিধ বিপত্তি হইতে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

Selections from the State Papers (Bombay, 1885.) গ্রন্থের ৬৮৪।৫ পৃষ্ঠা লিখিত আছে যে, হরি মহাদেব ভানুর পিতা মাধোজী (মহাদেব কৃষ্ণ) ভানু ওয়েলাস গ্রামে মহাজনী করিতেন। তিনি হাবশীদিগের সহিত যুদ্ধে পরাভূত জানোজী বিশ্বনাথকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন বলিয়া পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহাকে সাতারায় আহ্বান করিয়া তাঁহার পুত্রগণকে রাজসরকারে চাকরি জুটাইয়া দেন। এই তথ্য ইংরাজ লেখকেরা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, জানি না। নানা ফড়নবীসের আদেশে লিখিত ভানুবংশের বিবরণ ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণের রচনায় আমরা যে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই উপরে সন্নিবিষ্ট হইল

(১) "কুলকর্ণী গ্রামলেখী স্যাৎ"—রাজ-ব্যবহার কোষঃ। কুলকরণী অর্থে গ্রামলেখক। গ্রামাধ্যক্ষের নীচেই গ্রামলেখকের পদ। গ্রামলেখককে গ্রামের যাবতীয় পতিত ভূমি, কৃষিক্ষেত্র, পথঘাট, প্রভৃতির বিবরণ লিখিয়া রাখিতে হয়। কর-সংগ্রহ-কার্য্যে গ্রামাধিকারীকে সহায়তা করা ও গ্রামের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব রাখাও তাঁহার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। দেশপাণ্ডে—District accountant. একাধিক গ্রামের বা একটি সমগ্র মহালের ভূমি প্রভৃতির হিসাব যাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাখিতে হয়, তাঁহাকে দেশপাণ্ডে বলে।

এই সময়ে পূর্ব্ব মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল। মহাত্মা শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্রাট অওরঙ্গজেব যে দ্বাদশ লক্ষ মোগল সেনা লইয়া মহারাষ্ট্র দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাদের হস্ত হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয়ই চেষ্টা করিতেছিলেন। যিনি কোনরূপে একখানি অস্ত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনিই মোগলদিগের আক্রমণ নিবারণে যত্ন প্রকাশ করিতেছিলেন। স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য বিংশতি বর্ষ কাল অনবরত সমর করিয়া তাঁহারা মোগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বালাজী যখন "সাসবড়ে" পদার্পণ করেন, তখনও মহারাজ রাজারামের বীর-পত্নী তারাবাঈর অমাত্য রামচন্দ্র পন্থ, প্রতিনিধি পরশুরাম ত্র্যম্বক, সচিব শঙ্করাজী, নারায়ণ ও সেনাপতি ধনাজী (ধনঞ্জয়জী) যাদব প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের বীর্য্যবিক্রমে সমগ্র দক্ষিণাপথ কম্পিত হইতেছিল। মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের রণোন্মাদ ও রুদ্রমূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন মারাঠাদিগের বিক্রমে তাঁহাদিগের পক্ষে পলায়নও অতীব বিঘ্নকর হইয়া উঠিয়াছিল। মোগল-শাসিত প্রদেশে ক্রমশঃ মহারাষ্ট্র আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছিল। সুতরাং কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে সে সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে কার্য্যক্ষেত্রের অভাব ছিল না। বালাজী উদ্যমশীল, কার্য্য-কুশল ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন; এই কারণে রাজধানীতে পদার্পণ করিবার পর অল্প দিবসের মধ্যেই তিনি রাজকার্য্যে প্রবেশ ও উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন।

সাতারায় মহাদেব কৃষ্ণ জোশী নামক ভাতৃদিগের পরিচিত এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় তারাবাঈর প্রতিনিধি পরশুরাম ত্র্যম্বকের সহিত বালাজীর পরিচয় ঘটে। বালাজীকে পরমহংস ব্রহ্মেন্দ্রের অনুগৃহীত ব্যক্তি জানিয়া প্রতিনিধি মহাশয় প্রথমেই তাঁহাকে ও অম্বাজীকে একটি তালুকের রাজস্ব আদায় করিবার ইজারা প্রদান করিলেন এবং সে কার্য্যে তাঁহাদের দক্ষতা দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সেনাপতি ধনাজী যাদবের অধীনতায় রাজস্ব বিভাগে কারকুনের পদে বার্ষিক শত মুদ্রা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। (১৭০৬ খ্রীঃ) ভাতৃ-ত্রিতয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ রানাজী মহাদেব সচিব শঙ্করাজী নারায়ণের অধীনতায় কর্ম্ম পাইলেন। অবশিষ্ট দুইজন বালাজীর আশ্রয়েই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

# মহারাজা রাজবল্লভ সেন।

## সমাজপতিত্ব ও বিধবাকন্যার বিবাহ উদ্যোগ।

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাজবল্লভের সমাজপতিত্ব লাভের কথা। বহু কুলীন সন্তান সম্মিলন করিয়া রাজবল্লভ যে সমাজপতিত্ব পদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা সত্য কথা। তবে সমুদয় শ্রেণীর বৈদ্য সম্মিলন কথা ঠিক নয়, মূলকথা যদি উচ্চ শ্রেণীর লোককর্ত্তৃক কেহ উন্নীত হন, তবে পরবর্ত্তী শ্রেণীর লোক ক্রমে তাহাই মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। রাজবল্লভের বহুকার্য্যে বিক্রমপুরবাসী অধিকাংশ বৈদ্য প্রতিকূলাচারী ছিলেন, তন্মধ্যে লেখক নিমদাস বংশীয় নিধিরাম, রাম রাম এই দুই ব্যক্তিকে মাত্র রাজার প্রতিপক্ষ বলিয়া (১) গঙ্গারামকে স্বপক্ষে রাখিয়াছেন, কিন্তু নিধিরাম গঙ্গারাম, রামপ্রসাদ কেন অপর বহু বৈদ্য, রাজার বিরুদ্ধে নানারূপ কার্য্য করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা অবশ্য বৃথা হইয়াছিল জপ্‌সা ও রাজনগরের জ্ঞাতিদের সহায়তায় ও উচ্চকুলীনসহ কুলকার্য্য করিতে থাকায় তাহার পক্ষই ক্রমে প্রবল হইয়া পড়ে। এজন্য তিনি স্বপক্ষীয় জ্ঞাতি ও স্বজাতির ব্যক্তি মাত্রকেই নানারূপ উপহার ও পারিতোষিক বিতরণ করেন (২)। লেখক বলেন "রাজবল্লভের উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি এই সম্মানসূচক পদগৌরব (সমাজপতিত্ব) উপভোগ করিতেছেন"। আমরা

(১) সম্ভবতঃ রামপ্রসাদকেই লেখক রাম রাম নামে উল্লিখিত করিয়াছেন।

(২) "তদনুসারে মহারাজ রাজবল্লভ স্বীয় জ্ঞাতিকুটুম্বাদির সহিত প্রায়শ্চিত্ত করত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্নিষ্টোম, অত্যাগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতলোকে দক্ষিণা এবং বাজী ও ভূম্যধিকারী এবং আত্মীয় অমাত্য জ্ঞাতিকুটুম্ব, অম্বষ্ঠ প্রভৃতিকে যথাযুক্ত অর্থ বসন ভূষণাদি প্রদান করেন"। মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত ৺ উমাচরণ রায় প্রণীত মযমুর ১৩১১ সন মাঘ ৪৪৫ পৃষ্ঠা

তাহার এই কথার অনুমোদন করিতে পারি না, কারণ রাজবল্লভের বংশধরগণ মধ্যে সকলেই যে সমাজপতিপদে বরিত ছিলেন তাহা নয়। দেওয়ান রামদাস ও রায় রতনকৃষ্ণ রাজবল্লভ বর্ত্তমানে অপুত্রাবস্থায় লোকান্তরিত হন, এই কারণে তাহাদের দত্তকেরা জমিদারী বা সমাজপতিত্বপদলাভে বঞ্চিত হন। মহারাজার জমিদারী পাঁচ অংশে বিভক্ত হইয়া একাংশ প্রাপ্ত হন রাজাকৃষ্ণদাস বাহাদুরের তিন পুত্র (১), অপর একাংশ রাজা গঙ্গাদাসের দুই পুত্র, অপরাংশ রায় গোপালকৃষ্ণ, আর একাংশ রায় রাধামোহনের দত্তক পুত্র, অবশিষ্টাংশ কেবলরাম বাবু।

রাজবল্লভ স্বীয় জমিদারী রাজনগর প্রভৃতি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহনামে মালিকীস্বত্ব লেখাইয়া দিয়া স্বয়ং সেবাইত থাকেন মাত্র। যে যে ব্যক্তি লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের অংশিদার তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে জমিদার ও সমাজপতি; অপর কেহই এই দুই বিষয়ের দাবি করিতে সমর্থ নন। চন্দ্রকুমার রায় মহাশয় বলেন "প্রাণকৃষ্ণের (রাজা কৃষ্ণদাসের পুত্র) নিঃসন্তানাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার স্ত্রী প্রথম গৌরমোহনকে পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রামকুমার তাহার পুত্র কালীশচন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করেন।" এই কারণ প্রযুক্ত প্রাণকৃষ্ণের দত্তক জমিদারী বা লক্ষ্মীনারায়ণের অংশ প্রাপ্ত হন না। কাজেই তাহার সমাজপতিত্বপদ বা উপাধির অধিকারও লাভ হয় না।

প্রাণকৃষ্ণের স্ত্রী বিবাহসময়ে যৌতুকস্বরূপ যে ভূবৃত্তি প্রাপ্ত হন, তাহার আয় মাত্র কালীশচন্দ্র ভোগ করেন। কালে রাজ-উত্তরাধিকারী রাজ্যপ্রাপ্ত প্রকৃত ব্যক্তিগণ হীনপ্রভ হইলে এই যৌতুকস্বামীই শ্রেষ্ঠ হইয়া দাড়ান, কাজেই অপর বংশধরেরা তাহাকে সমভাবাপন্ন করিয়া লইতে বাধ্য হন, কিন্তু

(১) কৃষ্ণদাস বাহাদুরের চারি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ২য় পুত্র নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক গমন করেন তাহাতে অপর তিন অংশিগণ তাঁহার বিধবাস্ত্রীকে অংশ হইতে উচ্ছেদ করিয়া মকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। এজন্য তিন পুত্র সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন"।

চন্দ্রকুমার রায়-প্রণীত মহারাজা রাজবল্লভের জীবন চরিত। ৬০ পৃষ্ঠা

তাহা অপরে গ্রাহ্য করিবে কেন? রামদাস ও রতনকৃষ্ণের সন্তানগণ চির-বৃত্তিভোগী মাত্র।

যেমন হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ কএকটি নিয়ম প্রতিপালন না করিলে তাহার জাতিপাত হয়, তেমন সমাজ সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন না করিলেও তাহার সামাজিক মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। বৈদ্যের কুলশাস্ত্রমত যে ব্যক্তি নিয়ত কুলীনসহ আদান প্রদান করেন, তিনি গোষ্ঠীপতিত্বপদলাভ করিয়া থাকেন; তাহার আর বন্ধন না করিলেও চলে। তিনি কুলীন না হইলেও মান্য প্রাপ্ত হন (১)। যাহা হউক, যিনি সমাজপতি, সমাজের নিয়ম প্রতিপালন করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি কর্ত্তা বিপথগামী হন তবে সেই সমাজের অকল্যাণ নিশ্চিত। এজন্যই সম্প্রতি কথা উঠিয়াছে ব্রাহ্মণগণ বিপথগামী হওয়াতেই হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে রসাতলগামী হইতেছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এই তিন শ্রেণীতেই কৌলিক প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যে নয়টি গুণের উপর উহার প্রথম ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, কালে যদিও আর তাহা টিকিল না, মূল আদান প্রদানেই উহা সীমাবদ্ধ থাকিল। কার্য্যতঃ যে ব্যক্তি উহা প্রত্যাখ্যান করেন সমাজের অনুশাসনে তিনিই নিন্দনীয়। আমরা

(১) মৌলিকগণ যদিও কোন মতে কুলীন হইতে পারেন না সত্য, কিন্তু তথাপি যাঁহারা নিয়ত কুলীনদিগের সহিত আদান প্রদানাদি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা কুলীন না হইলেও অতিশয় সম্মানাস্পদ।

"কুলীনৈঃ সহ সম্বন্ধাদাচার-পূত মৌলিকঃ।
শ্রদ্ধেয়ঃ কুলীনৈঃ সোঽপি গোষ্ঠীষু শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
সত্তাক সঙ্গতিং লব্ধা ক্ষুদ্রোঽপি জায়তে মহান্।
স্বাতীপয়ো যথা শুক্তৌ মুক্তাফলং হি জায়তে।"

"সদাচারাদি সম্পন্ন মৌলিক যদি নিয়ত কুলীনদিগের সহিত আদান প্রদানরূপ কুলকার্য্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি গোষ্ঠীপতি নামে অভিহিত হইয়া কুলীনদিগেরও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েন। স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি হইয়া শুক্তিতে পতিত হইলে তাহা হইতে যেরূপ মুক্তাফল জন্মে, তদ্রূপ কুলীনদিগের সৎ সঙ্গতিলাভে মৌলিকগণও অতিশয় গৌরবাস্পদ হইয়া উঠেন।"

✓ বিনোদলাল সেন সংগৃহীত বৈদ্যকুলতত্ত্ব ৯।১০ পৃষ্ঠা। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা দেখ।

দেখিতে পাই, সমাজপতির বংশমধ্যে অনেকের এইরূপ আদান প্রদান ক্রিয়ার এত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে যে, তাহাদিগকে আর কোনরূপে উক্ত সম্মানের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করা যাইতে পারে না বা কেহ করেও না।

তবে রাজা গঙ্গাদাস, রাজা কৃষ্ণদাস বাহাদুরের সন্তান মধ্যে যাঁহারা লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবাইত নিযুক্ত আছেন অথচ সমান ঘর পর্য্যন্ত অতিক্রম করেন নাই, তাঁহাদিগকেই সম্মান করা যাইতে পারে। রাজপুতনার বহু মহারাজ-সন্তান বৃত্তিভোগী আছেন, অনেক রাজপুত্র দত্তকস্বরূপ সরদারগণকে প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু যিনি মূল গদীর মালিক, তিনি যেই হউন না কেন, তিনিই সম্মাননীয়।

মহারাজা রাজবল্লভের বালিকা কন্যার বিধবা বিবাহের উদ্যোগ অবলম্বন করিয়া লেখক মহাশয় বলেন "বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই জামাতা-রূপে স্বরসেন এই অবোধ বালিকাকে অকূল দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন।

* * * * *

"যে বিধবা বিবাহ বহুকাল হইতে হিন্দু সমাজে অপ্রচলিত মাত্র তিনজন পণ্ডিতের (১) মতের উপর নির্ভর করিয়া তাহার পুনঃ প্রচলন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না, সুতরাং এই বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রাজবল্লভ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। প্রেরিত দূত কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা প্রভৃতি নানাস্থান হইতে অনুকূল মত সংগ্রহ করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে সমাগত হন।"

"বৈদ্যবংশীয় রাজবল্লভ কর্ত্তৃক এইরূপ একটি গুরুতর সমাজসংস্কার সাধিত হইবে, তাহা কৃষ্ণচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি উপস্থিত পণ্ডিত-গণকে বলিলেন, আগামী কল্য রাজবল্লভের দূত আবার সভায় সমাগত হইলে,

(১) রাজনগর নিবাসী নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌম, কৃষ্ণদাস সিদ্ধান্ত ও কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ।

আপনারা বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিবেন” (১১৩,১১৪,১১৫,১১৬ পৃষ্ঠা)।

রাজবল্লভ যে বিধবা বিবাহ প্রচলনে চেষ্টা পান তাহা প্রচলিত কথা, কিন্তু উহা কৃষ্ণচন্দ্রের কুটিলতায় সংসাধিত হয় না, একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। লেখক এতৎ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ ১৩১২ সনের ভাদ্র মাসের ভারতী পত্রিকায় প্রচার করেন, “বঙ্গবাসী” সম্পাদক তাহার প্রতিবাদ করিয়া সমালোচনা করেন (১) তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল, বাস্তবিক “বঙ্গবাসী”র সহিত আমরাও বলিতেছি যে, লেখক বিশেষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অধিকাংশ বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই, আমরা এতৎ বিষয় যথাসাধ্য প্রমাণ করিব।

আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, নেপালের পণ্ডিতদের মত না হওয়াতেই বিধবাবিবাহ কার্য্য পণ্ড হয়। মহারাজ রাজবল্লভ কি এতই অবিবেচক ছিলেন যে, অগ্রে ঘর ঠিক না করিয়া পরকে স্ববাসে আনয়ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন? বিশেষ তৎকালে নবদ্বীপ-সমাজ বঙ্গের শীর্ষস্থানীয়; সেই সমাজ বা সমাজপতি ঠিক না করিলে যে এই এই কার্য্য কখনও হইতে পারিবেনা তাহা কি তিনি বুঝিয়াছিলেন না? আমাদের বিবেচনায় নবদ্বীপের মত সংগ্রহ করিয়াই পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মহারাজ পণ্ডিত প্রেরণ করেন। এই কার্য্যে দূত প্রেরণ কথা সঙ্গত হয় না। ৺চন্দ্রকুমার রায় মহাশয় বহু পূর্ব্বে ক্ষিতীশ বংশাবলীতে এইরূপ বিবরণ পাঠ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন (২) তিনিও দূতের স্থানে পণ্ডিত কথা প্রয়োগ

(১) “প্রবন্ধ অকারণ প্রবর্দ্ধিত, একটি অনুবন্ধেই সকল কথা চলে, * * * মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এসম্বন্ধে যে মহারাজ রাজবল্লভের সহিত কপটতা করিয়াছিলেন, লেখক এসংবাদ কোথা হইতে পাইলেন? তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই। একজন স্বধর্ম্মপরায়ণ শক্তিসম্পন্ন রাজার নামে এরূপ কলঙ্কারোপ বড় বিষম কথা। যাহারা প্রমাণ ব্যতীত এরূপ গুরুতর কথা প্রচার করেন, তাঁহারা নিশ্চিতই দেশবাসীর শ্রদ্ধা ভক্তি হারাইয়া থাকেন।” বঙ্গবাসী ১৮ ভাদ্র ১৩১১।

(২) “ধার্ম্মিক প্রবর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে একটুকু সাধারণ অভিমানের জন্ত সেই সময়ে

করিয়াছেন। আমরা রাজবল্লভের বয়স নির্দ্ধারণ ব্যাপারে যেমন উক্ত রায় মহাশয়ের মতটীকে খাটি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি এস্থলেও তদীয় মতটীকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমান করি।

অতঃপর লেখক বলেন "বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে অসমর্থ হইয়া রাজবল্লভ এই বালিকার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উপায়ান্তর উদ্ভাবন করিলেন। তিনি অবিলম্বে এক স্বজাতীয় বালক সংগ্রহ করিয়া অভয়াকে দত্তক স্বরূপ অর্পণ করিলেন। ধর্ম্মাঙ্গদ বংশে এই দুহিতার বিবাহ হইয়াছিল, এই বংশ বৈদ্য সমাজে কৌলিন্যের নিমিত্ত সুবিখ্যাত। সামাজিক নিয়মানুসারে দত্তক কৌলিন্য হইতে বঞ্চিত হইলেও চন্দন দ্বারা এই দোষ নিবারণ হইতে পারে। রাজবল্লভ এই দত্তক পুত্রের কৌলিন্য রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া চন্দনের অনুষ্ঠান করত বঙ্গদেশীয় সমস্ত বৈদ্য সন্তানকে নিমন্ত্রণ করেন। তাহার নিমন্ত্রণানুসারে বঙ্গীয় সমাজের প্রায় প্রত্যেক বংশীয় বৈদ্যরাজ নগরে সমবেত হইয়া, একবাক্যে এই পুত্রের দোষ মার্জ্জনা পূর্ব্বক তাহাকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।"

লেখক বলেন "সামাজিক নিয়মানুসারে দত্তক কৌলিন্য হইতে বঞ্চিত হয়" তিনি উহা কোথায় জানিলেন? রাজাকৃষ্ণদাস বাহাদুরের তনয়াসহিত প্রভাকর বংশীয় মহোজ্জ্বল কুলবিশিষ্ট জয়চন্দ্র সেনের বিবাহকার্য্য সম্পাদন হয়। দৈব দুর্ঘটনার অল্পকাল মধ্যেই জয়চন্দ্র কালগ্রাসে পতিত হন। পরে

এত মিথ্যা ও কপট ব্যবহার দ্বারা শাস্ত্রসম্মত একটি ব্যবহারের উপর নিজে পাপী হইবেন এবং পণ্ডিতগণকে পাপী করিবেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।"

"মহারাজা অবশেষে নেপাল দেশে পণ্ডিতগণকে প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিতগণ তথায় উপস্থিত হইলে, তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলী এই ব্যবস্থা জন্য সমাগত জানিয়া, তাঁহাদিগকে ভোজনের দ্রব্যাদি সহ একটি মহিষবৎস প্রদান করেন, পণ্ডিতগণ উক্ত বৎস ভোজনে অস্বীকার করিলে নেপালী পণ্ডিতগণ বলিলেন, মহিষমাংস শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, এমতাবস্থায় গ্রহণ না করার কারণ কি? পণ্ডিতগণ বলিলেন, যদিও শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু কলিতে ব্যবহার নিষিদ্ধ। নেপালের পণ্ডিতগণ বলিলেন, ইহাও তদ্রূপ। পণ্ডিতগণ অনন্যোপায় হইয়া এদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাজও বহুতর চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় দ্বারা সফল কাম না হওয়াতে বিষণ্ণ মনে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।" (৺ চন্দ্রকুমার রায়-প্রণীত জীবনী ৩০।৩১ পৃষ্ঠা)

কৃষ্ণদাস বাহাদুরের তনয়াকেও এক দত্তক পুত্র রাখিয়া দেওয়া হয়, উহাতে তৎকালে চন্দনের ব্যাপার সম্পাদিত হয় না। এজন্য কি জয়চন্দ্রের দত্তক বংশ হইতে রূপেশ্বরের দত্তক বংশের সম্মান অধিক? এতদ্ভিন্ন সিদ্ধকাঠী নিবাসী পিতাম্বর বংশীয় রাজপ্রবর রঘুনাথকে, সিদ্ধকাঠী আদিত্যবংশীয় রুদ্রযানি সেন প্রাণকৃষ্ণকে, সেনহাটী অরবিন্দ বংশীয় নরোত্তম কবিশেখর বিশ্বনাথকে (১), কাহরিয়া বিষ্ণুবংশীয় রাজচন্দ্র মজুদার ঈশ্বর চন্দ্রকেও রামনিধি মজুমদার রাজ কিশোরকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইঁহারা আজিও বৈদ্যসমাজে কুলীন বলিয়া বিশেষ সম্মানিত আছেন। উহাঁদের কাহারও চন্দন কার্য্য দ্বারা সমন্বয় সাধন হয় নাই। রূপেশ্বরের বংশধরগণ যে ইহাঁদের কাহারও হইতে সম্মানী তাহাও নন বরং সেনহাটী, সিদ্ধকাঠী প্রভৃতি স্থানে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহাদেরই গৌরব কুলীনসমাজে কতকটা বেশী দেখা যায়। তবে এস্থলে চন্দনের গৌরব অধিক কি হইল?

আমরা যতদূর জানি তাহাতে দেখা যায়, দত্তক গৃহীতার স্বসমাজ যদ্যপি দত্তককে সমান বলিয়া স্বীকার করিয়া লন, তবেই সে সমাজে সমানভাবে স্থান প্রাপ্ত হয়; তবে কুলীন সমাজকে সমন্বয়ের জন্য কিঞ্চিৎ সামাজিকতা প্রদান করিতে হয় মাত্র। বৈদ্যসমাজে দত্তকের কুল নাই, এই কথা সত্য নহে। যাঁহারা অক্ষুন্ন কুলীন তাঁহারাও দত্তক কুলীনবংশে: কার্য্য করিয়া স্বীয় অক্ষুন্নতা রক্ষা করিতেছেন। মৌলিক ও কুলজ্ঞগণও (পাত্রী) তাঁহাদিগকে কুলীন বলিয়াই স্বীকার এবং এইরূপ কুল সম্বন্ধের দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া আসিতেছেন। ক্রমশঃ

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

(১) সদ্ভাব শতক প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সিদ্ধকাঠীর অধিকাংশ হিন্দু ও সোনারংবাসী রতিনাথের বংশধর রায় মহাশয়েরা রঘুনাথ রায়ের সন্তান। এতদ্ভিন্ন কুলীনবংশে আরও বহুতর আছেন।

রাজা রাজবল্লভের জীবনী লেখক চন্দ্রকুমার রায় মহাশয় সিদ্ধকাঠীবাসী রঘুনাথ রায় মহাশয়ের অপর বংশধর, অথচ রাজবংশীয়গণ তাঁহার পিতাকে কুলীন স্বীকার করিয়া কন্যাদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয়কে তজ্জন্য আমরা অনুযোগ করিতে পারি না, কারণ কুলীনসহ তাঁহাদের কোন কালেও পরিচয় না থাকায় সহজেই সমাজ সম্বন্ধীয় ব্যবহারে তাঁহার এইরূপ ভুল ধারণা হইতে পারে।

# প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে বঙ্গের উল্লেখ।

এক্ষণে যে ভূভাগকে বঙ্গ বা বাঙ্গালা দেশ বলিয়া থাকি, বরাবর সেই ভূভাগকে আমরা বঙ্গ বা বাঙ্গালা বলিতাম না। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের সীমারও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। কেমন করিয়া সীমার কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা আমরা এ প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব না। বঙ্গের বিভিন্ন সময়ের সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদিগকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যাদিতে কোথায় কোথায় বঙ্গের উল্লেখ আছে তাহাই দেখিতে হইবে। পরে অন্যান্য সহযোগী প্রমাণদ্বারা আমাদের প্রতিপাদ্যের মীমাংসা করিতে হইবে। সুতরাং এ প্রবন্ধে আমাদের কোন মন্তব্য না দিয়াই কোথায় কোথায় বঙ্গের উল্লেখ আছে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে বঙ্গের উল্লেখ—

সুপ্রাচীন ঋক্‌সংহিতায় (১) মগধের উল্লেখ দেখা যায়। তখন মগধের নাম ছিল 'কীকট'। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২) 'পুণ্ড্র' এবং অথর্ব্বসংহিতায় (৩) অঙ্গেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, বঙ্গ শব্দের প্রথম উল্লেখ আমরা ঐতরেয় আরণ্যকেই দেখিতে পাই।

ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় বায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি॥ (৪) ২।১।১।

(১) ৩।৫৩।১৪। (২) ৫।২২।১৪। (৩) ৫।২২।১৪।

(৪) শুনা যায়, অথর্ব্ব পরিশিষ্টেও নাকি বঙ্গশব্দের উল্লেখ আছে। এই দুইটি পংক্তি বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথম শ্রীপতি কবিরত্ন কর্ত্তৃক শ্রীশ্যামা কল্পলতিকা নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়। পরে

অতঃপর মনুসংহিতায় বঙ্গশব্দ উল্লিখিত হয়। যথা—

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

বাল্মীকি-রামায়ণে একবার মাত্র বঙ্গশব্দের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

সুহ্মান্ মাল্যান্ বিদেহাংশ্চ মলয়ান্ কাশীকোশলান্।
মাগধান্ দণ্ডকুলাংশ্চ বঙ্গানঙ্গাংস্তথৈব চ॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। ৪০ অঃ। ২৫ শ্লোক।

যে যে পুরাণে বঙ্গের উল্লেখ আছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

(ক) মহাভারতে কেবলমাত্র তিনবার বঙ্গের উল্লেখ আছে :—

(১) অঙ্গস্যাঙ্গোঽভবদ্দেশো বঙ্গস্য চ স্মৃতঃ।
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গস্য চ স স্মৃতঃ॥ আদি। ১০৪।৫১

(২) যঃ কাশীবঙ্গমগধান্ কলিঙ্গাংশ্চ যুধাঽজয়ত।
তেনবো ভীমসেনেন পাণ্ডবা অভ্যযুঞ্জত॥ উদ্যোগ। ৪৯ অ।২০

(৩) বিদেহা মাগধাঃ স্বক্ষা মলয়া বিজয়াস্তথা।
অঙ্গা বঙ্গাঃ কলিঙ্গাশ্চ যকৃল্লোমান এব চ। ভীষ্ম। ৯ অ। ৪৫

(খ) বিষ্ণুপুরাণে একবার মাত্র বঙ্গের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।
হেমাৎ সুতপাস্তস্মাদ্বলির্যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গসুহ্মপুণ্ড্রাখ্যম্ বালেয়ং ক্ষত্র অজনত।৪।১৮।১

(গ) মার্কণ্ডেয় পুরাণে বঙ্গের উল্লেখ কেবল একবার মাত্র।
কলিঙ্গবঙ্গজঠরাঃ কোশলা মূষিকাস্তথা।
চেদয়শ্চোর্দ্ধকর্ণাশ্চ মৎস্যাদ্যা বিন্ধ্যবাসিনঃ॥ ৫৮। ১৬

এই পংক্তি দুইটী "বিশ্বকোষেও" উদ্ধৃত হয়। 'শ্যামাকল্পলতিকা' ও 'বিশ্বকোষে' পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের একটী ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত ব্যাখ্যার মর্ম্মার্থ এই—"বঙ্গাঃ" 'মগধাঃ' ও 'চেরপাদাঃ' অর্থে বঙ্গদেশীয়, মগধবাসী ও চেরনামক জনপদবাসী বুঝায়। এই অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে বঙ্গ, মগধ ও চেরজনপদবাসিগণ এই তিন প্রজা দৌর্ব্বল্য, দুরাহার ও বহু অপত্যতায় কাক, চটক ও পারাবতাদির সমান।

(ঘ) ভাগবতপুরাণেও একাধিকবার বঙ্গের উল্লেখ নাই।

তেতোহেমোহথসুত পাবলিঃ সুতপসোঽভবৎ।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদ্যাঃ সুহ্মপুণ্ড্রাধ্রসংজ্ঞিতাঃ। ৯। ২৩। ৪।

(ঙ) হরিবংশে আটবার বঙ্গের উল্লেখ আছে। যথা—

হরিবংশ— কালেন মহতা রাজন্ স্বঞ্চ স্থান মুপাগমৎ।

তেষাং জনপদাঃ পঞ্চ অঙ্গা বঙ্গাঃ সসুহ্মকাঃ ॥৩১অ। ১৬৯২শ্লোক।

অঙ্গরাজশ্চ বলবান্ বঙ্গানামধিপস্তথা।

কৌশল্যঃ কাশিরাজশ্চ দশর্নাধিপতিস্তথা ॥৯১।৪৯৬৭।

অনুযাতশ্চ পৌণ্ড্রেণ বাসুদেবেন ধীমতা।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গানামীশ্বরশ্চ মহাবলঃ ॥১১৭।৬৬০৭

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গৈশ্চ সার্দ্ধং পৌণ্ড্রৈশ্চ বীর্য্যবান্।

নিযযৌ চেদিরাজস্তু ভ্রাতৃভিঃ স মহারথৈঃ ॥১১৭।৬৬১১

কলিঙ্গস্য তদানীকং নারাচৈর্বিভিন্নাশিতৈঃ।

নিসৃষ্টেন ক্রমেণাজৌ বঙ্গরাজস্য কুঞ্জরং ॥১১৭।৬৬৫০

জঘান সহিতান্ সর্ব্বান্ বঙ্গরাজঃ তথৈব চ।

এষ চৈকশতং হত্বা বণে রাজ্ঞাং মহাত্মনাম ॥১৬১।৯১৪৭

কৌশিকীং প্রতরিষ্যন্তি নরাঃ ক্ষুদ্ভয়পীড়িতাঃ।

অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ কাশ্মীরানথমেকলান্ ॥১৯৪।১১২০১

পত্তনং কৌশিকারাণাং দ্রাবিড়া রত্নাকরাঃ।

মগধাশ্চ মহাগ্রামা পৌণ্ড্রা বঙ্গাস্তথৈব চ ॥ ২৩৬।১২৮৩১

(চ) স্কন্দপুরাণ এইরূপে বঙ্গের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে।

বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥

(শক্তিসঙ্গম তন্ত্রেও এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়।)

অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির "গহাদিভ্যশ্চ" (৪।২।১৩৮) এই সূত্রের বৃত্তিতে

"গহ অন্তঃস্থ সম বিষম মধ্যমধমঙ্গান্
চরণে উত্তম অঙ্গ বঙ্গ মগধ পূর্ব্বপক্ষ............।"

বঙ্গশব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বঙ্গোল্লেখে জ্যোতিস্তত্ত্বধৃতদেবল বচন যথা—

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গৌড্রান্ গত্বা সংস্কারং অর্হতি।

বঙ্গনামোল্লেখে ব্রহ্মযামল বচন যথা—

কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য গৌড়ের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি বঙ্গের নাম গন্ধও করেন নাই। জ্যোতিস্তত্বেও গৌড়ের উল্লেখ আছে কিন্তু বঙ্গনাম নাই।

ললিতবিস্তরে বঙ্গলিপির উল্লেখ আছে, যথা—

ব্রাহ্মীং খরোষ্টীং পুষ্করসাধীং অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং...

বরাহ মিহিরের বৃহৎসংহিতায় আটবার বঙ্গদেশের নাম দেখিতে পাওয় যায়। যথা—

(১) মাঘে তু মাতৃপিতৃভক্ত বসিষ্ঠ গোত্রান্
স্বাধ্যায় ধর্ম্মনিরতান্ করিণস্তবঙ্গান্।
বঙ্গাঙ্গকাশিমনুমুজাংশ্চ তুনোতি রাহু
বৃষ্টিং চ কর্ষকজনাভিমতাং করোতি।

রাহুচর। ৫। ৭২।

(২) কলিঙ্গ বঙ্গান্ মগধান্ সুরাষ্ট্রান্
ম্লেচ্ছান্ সুবীরান্ দরদাশ্মকাংশ্চ।
স্ত্রীণাং চ গর্ভানসুরো নিহন্তি
সুভিক্ষবৃত্তাদ্র পদেহভ্যুপেতঃ।

ঐ। ৫। ৭৯।

(৩) ভরণীপূর্ব্বং মণ্ডলমৃক্ষচতুষ্কং সুভিক্ষকরমাদ্যং।
বঙ্গাঙ্গমহিষ বাহ্লিক কলিঙ্গ দেশেষু ভয়জননম্॥

শুক্রচার। ৯। ১০।

(৪) আপ্যেঙ্গ বঙ্গ-কোশল গিরিব্রজা মগধপুণ্ড্র মিথিলাশ্চ।
উপতাপং যান্তি জনা বসন্তি যে তাম্রলিপ্ত্যাং চ॥
শনৈশ্বরচার। ১০। ১৪।

(৫) আগ্নেয্যাং দিশি কোশল কলিঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গ জঠরাঙ্গাঃ।
শৌলিকবিদর্ভবৎ সান্ধ্রচোদিকাশ্চোর্ধ্বকণ্ঠাশ্চ।
নক্ষত্র কূর্ম্মাধ্যায়। ১৪। ৮

(৬) প্রাঙ্নর্মদার্দ্ধশোণোড্রবঙ্গসুহ্মাঃ কলিঙ্গবাহ্লীকাঃ।
শকযবন মগধশবর প্রাগ্‌জ্যোতিষ চীন কাম্বোজাঃ॥
গ্রহভক্তিযোগ। ১৬। ১

(৭) জীবে শুক্রাভিহতে কুলূতগান্ধারকৈকয়া মদ্রাঃ।
শাল্বা বৎসা বঙ্গা গাবঃ শস্যানি পীড্যন্তে॥
গ্রহযুদ্ধাধ্যায়। ১৭। ১৮।

(৮) দীপ্তৌজসঃ প্রচণ্ডাঃ পীড্যন্তে চাশ্মকাঙ্গবাহ্লীকাঃ।
তঙ্গণ কলিঙ্গ বঙ্গ দ্রাবিড়া শবরা অনেকবিধাঃ॥
ভূকম্পলক্ষণাধ্যায়। ৩২। ২৫।

রঘুবংশ মহাকাব্যে বঙ্গোল্লেখ যথা—

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রতোঽন্তরেষু চ॥
৪র্থ সর্গ। ৩৬ শ্লোক।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে বঙ্গোল্লেখ ছয়বার দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) পুরাবঙ্গে বিষয়ে আদিশূরনামা নরপতি রাসীৎ।
W. Pertsch এর সংস্করণ পৃঃ ১। পং ৬।

(২) তদানীং চ বঙ্গাদিবিষয়েষু প্রতাপাদিত্যপ্রধানা দ্বাদশ রাজানো নিষ্করং পৃথিবীমুপভুঞ্জতে স্ম। পৃ ১২ পং ৮-১০।

(৩) অঙ্গ বঙ্গ মগধ কাশি কাঞ্চী প্রভৃতি দেশবাসিনো বহবো ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিতাঃ। পৃঃ ২৫ পং ১-২।

( ৪ ) অঙ্গ বঙ্গ মগধ সৌরাষ্ট্র কাশী কাঞ্চী প্রভৃতি দেশবাসি পণ্ডিতান্
পৃঃ ৮১, পং ২-৩

( ৫ ) বর্দ্ধমান জয়জাত মহাদর্পশ্চ ইন্দ্রপ্রস্থপুবেশ্চরস্থ বঙ্গাদি
দেশাধিপত্যম্ বিঘটায়তুম্......পৃঃ ৪৬ ; পং ৭-৮।

( ৬ ) .........অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ কাশী কাঞ্চী প্রভৃতি বিষয় বাসিনে
.........৪৬ পৃঃ ১৫-১৬।

দেশ নির্ণয় নামক গ্রন্থে বঙ্গের সীমা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :—

"বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতি ॥১
রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মাপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ ॥ ২

দেশনির্ণয়। সংবৎ ১৮১৪ শাক ১৭৩৮। বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের সংস্কৃত পুঁথি নং ৭।

দিগ্বিজয় প্রকাশে—উপবঙ্গোল্লেখ যথা—

"ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চ যোজন পরিমিত হ্যপবঙ্গোহিভূমিপ ॥
উপবঙ্গে যশোরাদি দেশাঃ কানন সংযুতাঃ।
জ্ঞাতব্যা নৃপশার্দ্দূল বহুলাস্থ নদীষু চ ॥"

এতদ্ভিন্ন কহ্লনের রাজতরঙ্গিনীতে বঙ্গশব্দের তিনবার উল্লেখ পাওয়া যায় পালি মহাবংশে বঙ্গশব্দের উল্লেখ একবার মাত্র দৃষ্ট হয়।

অতঃপর, আমরা মুসলমানগণ যে যে গ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন তাহ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

১। ১২৫০—"তবকতে নাসিরি"তে বঙ্গের নামোল্লেখ যথা—Mahammad Bakhtiyar......returned to Behar. Great fear of him prevailed in the minds of the infidels of the territories of Lakhnauti, Behar, *Bang*, and Kamrup" [ Elliot, ii, 307 ]

২। ১৩00—ঐতিহাসিক রসিদুদ্দিন বাঙ্গালার নাম বঙ্গালা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,...then to Bijatar (but rather reading Banjata), which from old is subject to Delhi (Rashiddin in Elliot, 1, 72)

৩। ১৩৪৫—ইব্‌নে বতুতাও বাঙ্গালাকে বঙ্গালা বলিয়াছেন—"...... we were at sea 43 days and then arrived in the country of Bangala, which is a vast region abounding in vice. I have seen no country in the world where provisions are cheaper than in this; but it is muggy and those who come from Khorasan call it 'a hell full of good things'—Ibn Batuta, IV, 211 (But the Emperor Aurengzebe is alleged to have "Emphatically styled it the Paradise of Nations"—Note in Stavorinus, i. 291)

৪। ১৩৫0—দেওয়ানে হাফিজে স্পষ্ট বাঙ্গালা শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। হাফিজের বয়েত্‌টী এই

"শুকর্ শিকন্ শবন্দ হম তুতিয়ানে হিন্দ্
জিন্ কন্দে পরাসী কিহ্ ব বঙ্গাল মিরবদ্"

অর্থাৎ ভারতের তুতিপক্ষিগণ শর্করা স্মরণ করিয়া থাকে। ইহা হইতে পারস্তের মিশ্রি (অর্থাৎ হাফিজের কবিতার জন্ম) যাহা বাঙ্গালায় ভ্রমণ করিয়া থাকে।

৫। ১৩৯0—আইন-ই-আকবরিতে ৩৬ বার বাঙ্গালার কথা উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে আমরা বাঙ্গালার উৎপত্তিমূলক একটী ভ্রান্তমত নিয়ে নির্দেশ করিলাম—"Bungaleh originally was called *Bang*; it derived the additional *al* from that being the name given to the mounds of earth which the ancient Rajahs caused to be raised in the low lands at the foot of the hills"—Aini-Akbori, Gladwin. ii, 4 (Ed. 1800), Jaritt, ii, 120 [আকবরিতে অন্যান্য

উল্লেখ পৃঃ ৩১, ৬৮, ১২২, ১৪৯, ১৯০, ২৫৪, ২৭১, ২৭৯, ৩২৬, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৪, ৩৬৬, ৩৭৬, ৪১৭, ৪২৪, ৪২৭, ৪৩০, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৬১, ৪৮১, ৪৯৩, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০৪, ৫১২, ৫২০, জ্যারেটের সংস্করণ দ্রষ্টব্য ]

পরিশেষে ইউরোপীয় গ্রন্থে যেখানে যেখানে বঙ্গের উল্লেখ আছে তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইয়া প্রবন্ধের একাংশের আপাততঃ উপসংহার করিব।

গ্রীক ও লাটিন ভাষার ন্যায় কোন য়ুরোপীয় প্রাচীন ভাষার সাহিত্যাদিতে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় না। Ptolemy গৌড়ীঘোসের নাম করিয়াছেন, Deodonis গৌরারীজ, Arrian গৌরাসী, Deodorus গনড়ারিস, এবং Nonus গৌড়ীয়ান্‌ডেশ বলিতে গৌড় বুঝিয়াছেন। ইহাঁদের কেহ বা অন্য কোন লেখক বঙ্গের নাম করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ লাটিন কবি Virgil কেবল মাত্র বঙ্গদেশ দিয়া প্রবাহিত গঙ্গার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গের নামও করেন নাই।

Cen septem surgens sedatis amnibus altus per tacitum Ganges, ant pingui flumine Nilns cum refluit campis it iam se condidit alves. Aeneid-Bk ix-lines 30-32

ইংরেজি ব্যতীত অন্য ভাষার সুপ্রাচীন গ্রন্থে একবার মাত্র বেঙ্গালা শব্দের যে উল্লেখ পাইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Ve Cathigas cidade das melhores
De *Bengala* provincia ; que se preza
De abundante ; masolha, que esta, posta
Para o Austro de aqui virasla a costa"

—Lusiad. stan. 121.

ইহাতে গঙ্গার নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

"Ganges, no qual os sens habitadores
Morrem Canhodos, tendo por certeza,

Que inda que sejac grandes peccadores,
Eota aqua sancta os lava, eda pureza"

Lusidd. x. 121.

সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক মার্কোপোলো ( Marco Polo ) ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে "বেঙ্গালা ( Bengala ) নাম দিয়া বঙ্গদেশের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"*Bengala* is a province towards the south, which up to the year 1290......had not yet been conquered......" (Marco Polo, Bk. ii. Ch. 55.)

২। অতঃপর, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে আমরা পুনরায় য়ুরোপীয় সাহিত্যে বঙ্গদেশের নাম দেখিতে পাই। Roteiro de Vasco da Gama-র এইরূপ লিখিত আছে—"*Benagala*" in this Kingdom are many Moors, and for Christians, and the king is a Moor ...... in this land are many cotton cloths, and much silver; it is 40 days with a fair wind from Calicut" (2nd Edition, p. 110).

৩। তারপর, ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের উল্লেখ যথা—"A *Banzelo*, el sno Re e Moro, e li se fa el forzo de parmi de gotton......" Leonardo do Ca' Masser, 28.

৪। মার্কোপোলো, ভাস্কোডাগামা ও লেওনার্ডো বঙ্গের উল্লেখাদি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনও বাঙ্গালা দেশে পদার্পণ করেন নাই। Bolognaর Ludovico Di Varthema সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে আগমন করেন। প্রায় ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বঙ্গ পর্য্যটন করেন। ইনি 'City of Banghella'র উল্লেখ স্বীয় গ্রন্থে করিয়াছেন। ( Travel of Ludovico Di Vathema in 1503 to 1508, Intro. p. zxxx and p. 210 )

ইহাঁর গ্রন্থে বঙ্গের অন্যান্য উল্লেখ ১৮, ১৫১, ১৮৪, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২১০, ২১২, ২২৪ ও ২৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। Bangshella আর একটী নূতন বানান।

৫। পাটাভিনোর ( Patavino ) গ্রন্থ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে Bengalaর উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার এই Bengle, গৌড়, চাঁট গাঁ বা সাতগাঁ হইতে বিভিন্ন। "Govro vrbs Regia habitatis fuit et Bengala urbs quac regioni nomen dat, inter universae Indiac praeclarissimas connumeratur. Praeter has inxta maris ripam ad ostia Chaberis insignia emporia *Catigan* or *Satigan*, quae centum propemodum tencis ab invicem distant." ( Geog. Univ. tum vet tum Novac absolutissimum opus. p. 258 )

৬। ১৫১৬ বারবোসা ( Barbosa ) 'City of Bengala'র এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—"Having passed the river Ganges, along the coast twenty leagues to the north-east by east and twelve leagues to the east until reaching the river Paralem, is the kingdom of Bengala in which there are many towns, both in the interior and on the sea-coast"—Description of coast of East-Africa and Malabar—p. 78—see also Ramusio, vol. I. p. 315.

৭। পার্‌চাস্‌ ( Purchas ) বঙ্গের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া গেল—"The Kingdom of Bengala is very large, and hath of coast one hundred and twenty leagues and as much within land ... .. " ( Parchas His pilgrims, vol. v, p 508 ).

৮। স্যার টমাস্‌ রো কর্ত্তৃক বঙ্গোল্লেখ যথা—"Bengala, a most spacious and fruitful province, but more properly to be called a kingdom, which hath two very large provinces within it, Parb and Patan; the one lying on the East the other on the west side of the river Ganges"—A Voyage to East India p. 357.

৯। মাণ্ডেল্‌সো ( Mandelso ) বাঙ্গালায় কখনও আসেন নাই। তিনি কেবলমাত্র তাঁহার সময়ের বাঙ্গালার প্রধান প্রধান কয়েকটী নগরের নামের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা একটী মাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

"En tirant vers le septentrional on trouve le royaume de Bengala, qui donne le nom an golfe que les anciens appellent Sinus Gangeticus...On trouve plusieurs bellesvilles dans ce royaume, comme sont celles de Gouro, d'ougely, de Chatigan, de Bengala, de Tauda, de Daca, de patana, de Banares, el' Elabas, et de Ragmehela." ( Voyage-p. 295. )

১০। বারবোসার পরে Cæsar Fredericke ( ১৫৬৫ খ্রীঃ বঙ্গের কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি বঙ্গশব্দের আদৌ উল্লেখ করেন নাই ইনি সাতগাঁর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার ২০ বৎসর পরে Ralph Fitch সাতগাঁ ও চাটগাঁর বিবরণ লিখিয়াছেন কিন্তু তিনি বঙ্গের নামমাত্রও করেন নাই। Harnilton এর সময়ে ( ১৬৭৮-১৭২৩ খৃঃ ) বঙ্গ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। "( *Satigan ?* )...........driving a great trade, because all foreign goods of the product of Bengal are brought hither fer exportation"

১১। আণ্টারমনির ( Antermony ) John Bell সেণ্টপিটর্স্‌বর্গ্‌ ইইতে এসিয়ার নানাস্থান পর্য্যটন করেন ( ১৭১৬...১৭২০।২১ ) তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাঙ্গালার নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন—"We shall add, by way of supplement, the information which Tavernier received from the merchants in Bangal concerning the southern round through Tibet. The kingdom of Bls-tan···is a kingdom of great extent ; but Tavernier could never come to a perfect knowledge thereof". Pinkertoh's Travels, Vol. VII, p. 594.

Ovington কর্তৃক বঙ্গোল্লেখ যথা—"Arracan is bounded on the north-west by the kingdon of Bengala, some authors making Chatigam to be its First Frontier city; but Teixcira, and generally the Portuguese writers, reckon that as a city of Bengala; and only so, but place the city of Bengala itself. more south than Chatigam. Tho' I confess a late French Geographer has put Bengala into his catalogue of imaginary cities, and such as have no real Existence in the world." Ovington Voyage to Suratt, (1689), pp. 553-554.

১২। William Hedges তাঁহার ডায়ারিতে বঙ্গের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

"1683 July 2, "A particular letter from ye President of Suratt to myselfe was showed to ye Councell......Desiring me, if he should chance to arrive at Bengala, to seize on his person, and to send him to Suratt on ye first ship; the president being likely to come to trouble about him" Diary of William Hedges, Vol I. pp. 96-97 [ বঙ্গোল্লেখের অন্যান্য অংশ নিম্নলিখিত পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য—Vol I. p 32, Vol II. 73, 75, 77, 157, 238, 189, 267, 326, 323; Vol III. 6,8,9,22, 23, 167, 184, 188, 194-95. ]

ক্রমশঃ

শ্রী অমূল্য চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

# কাশ্মীরে বাঙ্গালীর স্মৃতি।

ভারতবর্ষীয়েরা স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়ন করার পক্ষপাতী ছিলেন না বা আবশ্যকতা বোধ করিতেন না। পূর্ব্বাপর তাঁহাদের এইরূপ অখ্যাতি ছিল, কিন্তু কহ্লন পণ্ডিত কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিনী" লিখিয়া দেশবাসীর সে অপবাদ দূর করিয়াছেন। "রাজতরঙ্গিনী" কাশ্মীরের ইতিহাস হইলেও ইহাতে ভারতের বিভিন্ন জনপদ ও তদধিবাসিগণের অল্প বিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়। আমাদের গৌড় বাঙ্গালার কথা বিস্তারিত কিছু না থাকিলেও যেটুকু আছে, তাহা হইতেই আমরা তৎকালীন বাঙ্গালীর শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস, রাজভক্তি, অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে অবাক্ হই ও গৌরব অনুভব করিতে পারি।

বাঙ্গালীর সে চিত্র আঁকিতে হইলে প্রসঙ্গাধীন এস্থলে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের কথা কিছু বলিতে হইবে। ললিতাদিত্যের পূর্ণ নাম "অবিমুক্ত পীঢ় ললিতাদিত্য"—ইনি খৃঃ ৬৯৫ হইতে ৭৩২ অব্দ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ৩৬ বৎসর কাল কাশ্মীরের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ক্ষমতায়, যোগ্যতায় ললিতাদিত্য তৎকালীন ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোন কালে, কোন দেশের ক্ষমতাশালী শাসনকর্ত্তাই শুধু নিজের দেশটুকু শাসন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। সময় ও সুযোগ পাইলেই নিকটের ও দূরের, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্যসমূহ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইবার জন্য সচেষ্ট হইতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ললিতাদিত্য অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। সুতরাং তিনিও ক্ষুদ্র কাশ্মীর রাজ্য লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। সুবিধানুসারে তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কনৌজ, কর্ণাট, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ললিতাদিত্যের শক্তি, সামর্থ্য শুধু দেশজয়েই পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি অনেকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া উহার প্রত্যেকটীতেই এক একটী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত স্বীয় ভগবদ্ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। স্থাপিত বিগ্রহের মধ্যে পরিহাসপুর মন্দিরস্থিত শ্রীপরিহাস কেশব নামক ৮৪ তোলা স্বর্ণের বিষ্ণু মূর্ত্তি এবং উক্ত মন্দিরের পার্শ্বে স্বতন্ত্র রৌপ্য মন্দিরে "রামস্বামী" নামক বিষ্ণু মূর্ত্তির প্রতিই তাঁহার গভীর ও ঐকান্তিক ভক্তি ছিল।

ললিতাদিত্য প্রথমতঃ কনৌজরাজ যশোবর্ম্মাকে জয় করিয়া তাঁহার সভা হইতে কবিবর বাক্‌পতি ও ভবভূতিকে কাশ্মীরে লইয়া যান। ইহার পর তিনি গৌড় জয় করেন। এসময় গৌড়ের সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত ছিলেন কহ্লন পণ্ডিত তাহা কিছু বলেন নাই। তবে যিনিই হউন না কেন, তিনি ললিতাদিত্যের সহিত সর্ব্বদাই সদ্ভাব রাখিয়া চলিতেন। বিজয়ী বীরের মনস্তুষ্টির জন্ম গৌড়রাজ সময় সময় কাশ্মীরে গিয়াও বাস করিতেন। কিন্তু কি গৃহে, কি রাজসভায় সর্ব্বস্থানেই তিনি আত্মসম্মান ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। ললিতাদিত্য তাঁহার এই আত্মস্বাধীনতায় বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। একদিন তিনি গৌড়রাজকে স্পষ্টই বলিলেন "তোমার ব্যবহারে আমি বড়ই বিরক্ত ও অপমান বোধ করিতেছি। এতদিন শুধু ভগবান্ শ্রী-পরিহাস কেশবের অনুগ্রহেই তোমার জীবন রহিয়াছে, কিন্তু তোমার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন না হইলে অচিরাৎ ইহার ফলভোগ করিতে হইবে।" ললিতাদিত্যের এ শাসন বাক্যেও গৌড়রাজ আত্মসম্মানের বহির্ভূত কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত হন নাই। ফলে বিশ্বাসঘাতক কাশ্মীররাজের নিয়োজিত গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিরীহ গৌড়রাজকে আত্মীয় স্বজন রহিত বিদেশে বিভূমে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল।

যথাসময়ে গৌড়ে এ সম্বাদ পৌঁছিলে গৌড়বাসিগণ রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সমবেত হইয়া কি উপায়ে নৃশংস কাশ্মীররাজের এই নীতিবিগর্হিত জঘন্য কার্য্যের প্রতিশোধ লওয়া যাইতে পারে তন্নির্দ্ধারণে মনোনিবেশ করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাঁহাদের পরামর্শ স্থির হইল। কতিপয় রাজভক্ত বাঙ্গালী বীর জীবন আশা তুচ্ছ করিয়া কাশ্মীররাজকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন বাঙ্গালা হইতে কাশ্মীর যাওয়া এক বিষম ব্যাপার ছিল। কিন্তু, দৃঢ়াধ্যবসায়ী বাঙ্গালী বীরগণ কোন কষ্ট কোন অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সরস্বতী দর্শনচ্ছলে তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে একে একে কাশ্মীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীপরিহাস কেশব ও রামস্বামী নামক বিষ্ণুমূর্ত্তিদ্বয় যে ললিতাদিত্যের পরমারাধ্য ছিলেন বাঙ্গালী বীরগণের নিকট তাহা অবিদিত ছিল না, তাই তাঁহারা পরিহাসপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীপরিহাস কেশবের মন্দির লুঠ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বাঙ্গালীবীরগণকে সামান্য তীর্থযাত্রী মনে করিয়া প্রথমে কেহই তাঁহাদের প্রতি বিশেষ কোন লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু, ক্রমে তাঁহাদের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় গোপনানুসন্ধানে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া কাশ্মীরবাসিগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। শ্রীপরিহাস কেশবের সেবাইত পুরোহিতগণও ভীত হইয়া মন্দিরের ভীম কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। বিদেশীয়গণ পার্শ্ববর্ত্তী রামস্বামীর রৌপ্যময় মন্দিরকেই শ্রীপরিহাস কেশবের মন্দির মনে করিয়া তাহা ধ্বংস ও বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ললিতাদিত্য তখন সসৈন্যে পরিহাসপুরে উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ পাইয়া কাশ্মীরী সৈন্য ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়িল। মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী বীরগণ আপনাদের দেশাধিপতির জন্য দূরদেশে সেই অবস্থায় অদম্যসাহসে অসংখ্য সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া একে একে জীবনোৎসর্গ করিলেন। ধন্য বাঙ্গালী, ধন্য তোমার রাজভক্তি! প্রাগ ঐতিহাসিক দিনে দেশের শাসনকর্ত্তার জন্য তোমরা যে সাহস ও যে অধ্যবসায় দেখাইয়াছ তাহা স্মরণ করিলে এখনও আমরা বিস্ময়-

মুগ্ধ হইয়া যাই। কহ্লন পণ্ডিতের সময় পর্য্যন্তও ( ১০৭০ শক = ১১৪৮ খৃঃ ) রামস্বামীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান থাকিয়া ভূমণ্ডল মধ্যে গৌড় বাঙ্গালী বীরবৃন্দের বিপুল যশোরাশি ঘোষণা করিয়াছিল। "রাজতরঙ্গিনীর" নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকই তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে :—

"অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরানাং সনাথং যশসাপুনঃ॥"

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

---

( মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী )

( ২ )

# পলাশী। *

-:•:--

( ১ )

এই সেই বাঙ্গলার প্রাচীন নগর,
নবাবের রাজধানী একদা যথায়,
জীর্ণ শীর্ণ দেহ এবে ধরণী উপর,
প্রোষিতভর্ত্তৃকা সম সুমলিন কায়,
ধীরে ধীরে বহে শুধু হেথা ভাগীরথী,
পূতনীরা, ভারতের মাতা পুণ্যবতী।

( ২ )

যবনের ভাগ্যসূর্য্য যথা অস্তমিত,
সমুদিত ইংরাজের সৌভাগ্যতপন,
এইখানে দেখ সেই পলাশী বিস্তৃত,
প্রান্তর পতিত আছে বিহীনজীবন,
পেয়েছে নবীন দেহ পলাশী এখন,
রণস্থল ভাগীরথী গর্ভেতে মগন!

( ৩ )

লক্ষ বৃক্ষে পরিপূর্ণ যে আম্র কানন,
"লক্ষবাগ" নামে ছিল বিখ্যাত ভুবনে,
যাহার উত্তরে ব্যূহ করিয়া রচন,
ক্লাইভ সজ্জিত ছিল সঙ্গিগণ সনে,
আজি তাহা দেখিতেছি মরুভূমি প্রায়,
চাহিলে বিদরে হিয়া কণ্টকিত কায়।

( ৪ )

নাহিক হেথায় আর পলাশ কানন,
সুন্দর পলাশ পুষ্প হাসেনা হেথায়,
শোভেনা প্রান্তরে আর আম্র কুঞ্জবন,
বৃক্ষ-পক্ব-হরিদ্রাভ-রসাল, ধরায়,
পতিত রহেনা আর তরে পান্থজন,
কৌতুক নিবৃত্তি হেতু আর কোন জনে,
আসেনা কামান বিদ্ধ বৃক্ষ দরশনে।

( ৫ )

জাতীয় গৌরব প্রিয় ইংরাজের দল †
লালসা বিদগ্ধ চিতে করিয়া কর্ত্তন,
শেষবৃক্ষ, ( বৃটীশের যাহে বাহুবল—
প্রকাশিত ভুলাইতে দর্শকের মন )
"সিন্দুক" করায়ে তাহে অতীব যতনে,
উপহার দিয়াছিল সম্রাজ্ঞী সদনে।

( ৬ )

গায়না কোকিল আর হেথা কুহুস্বরে,
মৃদুল হিল্লোলে আর বহেনা পবন,

* পলাশী—মুর্শিদাবাদের ৩০ মাইল দক্ষিণে রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ রেল লাইনের ধারে ষ্টেসনের অনতিদূরে ভাগীরথী তীরে অবস্থিত।

† মহেশপুর কুঠীর ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ প্রাচীন একমাত্র আম্রবৃক্ষটীকে কর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাতে সিন্দুক প্রস্তুত করাইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে বিলাতে উপহার পাঠাইয়া দেন।

প্রখর সঙ্গীত ধারা শ্রবণ বিবরে
ঢালিয়া করেনা ঝিল্লী ত্যক্ত জনগনে,
তাল বৃক্ষ হীন তীর, তবু জলাশয়,
"তালবোনা" যথা,এবে পলাশীরে কয়।

( ৭ )

প্রান্তরে শোভেনা আর সেই সরোবর
একদা যাহার তীরে যবনের সেনা
"ছাউনী" করিয়াছিল সহ আড়ম্বর
তৃষ্ণাতুরে বারিদানে আর সে তুষে না
কমল হাসেনা আর সেই সরোবরে
ভাবিলে কতই স্মৃতি জাগে যে অন্তরে।

( ৮ )

"বৃটীশ রাজ্যের ভিত্তি পলাশী সমর"
এই কথা নিশিদিন করিতে প্রচার,
নাতিদীর্ঘ স্তম্ভ এক শোভিছে প্রান্তর
মরুভূমে "ওয়েসিস্" যেমন প্রকার!
ভাগীরথী অবহেলি সে জয় নিশান,
ধীরে ধীরে চলিতেছে তুলি কলগান।

( ৯ )

দেখিবে আর একদৃশ্য রয়েছে তথায়,
পলাশীর যুদ্ধের স্মৃতি জাগাবার তরে;
চির নিদ্রাগত এক প্রভুভক্ত হায়!—
—যবন সেনানী, সেই পলাশী উদরে,
সিরাজের সিংহাসন রক্ষিবার তরে;-
হারায়েছে প্রাণ, যেই সাহসের ভরে

( ১০ )

কৃষাণ কৃষাণী তথা প্রতি-লক্ষ্মীবারে,
তণ্ডুল সহিত পুষ্প ফলমূল আর;
বলিদেয় এবে সেই সমাধি মন্দিরে!
ধন্য সেই পুণ্য আত্মা ভবে দেবাকার
যথার্থ ভক্তের পূজা এইরূপে হয়;
খুঁজিলে দৃষ্টান্ত হেন পাবে বিশ্বময়।

( ১১ )

যুদ্ধসজ্জা, রক্তপাত, নরহত্যা আর,
ভুলেছে সে সব কথা গঙ্গার অন্তর;
তাই বুঝি দূরে রাখি নিজ অঙ্গভার
ছুটিছেন গঙ্গা, ত্যজি পলাশী প্রান্তর
তাহাতে কি আসে যায় পলাশীর বল
ঘোষিবে যাহার নাম চির ধরাতল।

( ১২ )

যাবৎ উদিবে চন্দ্র আর দিবাকর,
যতদিন ইতিহাস রহিবে ধরায়;
পৃথিবীতে যতকাল বিচরিবে নর!
ততদিন লেখারবে অবনীর গায়,
ক্লাইভ সিরাজ আর মীর্জ্জাফর সহ;
বঙ্গের পলাশী নাম গাঁথা অহরহঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

# দেবগণের ভারত ভ্রমণ।

বঙ্গভঙ্গে ভগ্নহৃদয় বাঙ্গালীর জাতিগত এক অভিনব জীবনীশক্তির আবিষ্কার হইয়াছে। ইহার মূলে দৈবশক্তি বর্ত্তমান। কিরূপে এই মৃতকল্প জাতির দীর্ঘকালব্যাপী অবসাদ-তিমিরে, দেবশক্তির বিজলীত-লীলা সম্ভবে, তাহারই আলোচনার জন্য, এবং কি উপায়ে সেই দেবপ্রসাদ, বঙ্গের ও তৎসঙ্গে সমগ্র-ভারতের জাতিগত জীবনকে উদ্বুদ্ধ, সজীব ও সবল করিতে পারে, তাহারই উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন প্রয়াসে 'দেবগণের ভারত-ভ্রমণ' প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহার লেখনী হইতে অমর পুরুষ বিদ্যাসাগরের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী বাহির হইয়াছে, গ্রন্থকার সেই শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা এবং রাজসংস্করণ ৩৲। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। দুই খণ্ড বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের সকল সংবাদ এই পুস্তকে অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হইতেছে। পড়িবার জানিবার ও শিখিবার সকল কথাই দেবতারা উপদেশ দিতেছেন। এখন গ্রাহক হইয়া তিন খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা বা রাজসংস্করণের জন্য ১৷৷০ টাকা পাঠাইলেই ত্বরায় তিনখণ্ড পুস্তক পাইবেন। পূজার সময়ে "দেবগণের ভারত ভ্রমণ" সর্ব্বত্র পাঠ ও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক খণ্ড প্রত্যেক খণ্ডেই শেষ হইয়াছে। নিম্ন ঠিকানায় পুস্তক পাইবেন। ডাক খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

সমগ্র পুস্তক প্রকাশিত হইলে মূল্য ৩৲ টাকা ও রাজসংস্করণ ৪৲ টাকা হইবে।

মেকাফ প্রেস
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১৫ই ভাদ্র ১৩১৪।

প্রকাশক
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# সমালোচনা।

কুমুদানন্দ। ঐতিহাসিক উপন্যাস—শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ প্রণীত। প্রকাশক—বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিকাল লইব্রেরি, কলিকাতা। [ব]ঙ্গদেশে, ফিরিঙ্গির মতে উৎসাহহীন দুর্ব্বল, কাপুরুষ বাঙ্গালির বাসস্থান দক্ষিণ-বঙ্গে, বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে দক্ষিণ সাগরকূলে রায়নগর রাজ্য [বৈ]দেশিক বাণিজ্যে খ্যাতি ও উন্নতি লাভ করে। মোগলেরা এই ক্ষুদ্র রাজ্যটুকু [অ]ধিকার করিয়া রায়মঙ্গল বন্দর ও তাহার বাণিজ্য হস্তগত করিতে চায়। [আ]বার প্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গি নাবিক দস্যু গঞ্জেলো এই রাজ্যটি অধিকার করিয়া তাহার [অ]ধিকৃত শণ দ্বীপ রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী। দেশের মধ্যেও বিভীষণ [অ]নেক। এই সময়ে রায়নগরের অভিজাত সন্তানগণ, বালক ও তরুণ পুরুষেরা [মি]লিয়া বালকসেনা গঠিত করিল, দেশ রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়া বসিল। [রা]য়নগর শেষে বন্যায় ধ্বংস হইয়া গেলেও বালকসেনার চেষ্টা বিফল হইল না। [মো]গলেরা ফিরিল; গঞ্জেলো কোথায় ভাসিয়া গেল; বিভীষণেরা অন্তর্দ্ধান [ক]রিল। রঙ্গিলাবাদে নূতন রাজধানী বসিল। আমরা পাঠকদিগকে অনুরোধ করি এই বইখানি পড়িয়া দেখুন—কিরূপে শত সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া, [জী]বন দিয়া ঐ বালকসেনার নেতারা মাতৃপূজা করে। গ্রন্থের নায়ক বালক [কু]মুদানন্দ যবনসেবী রাজা মানসিংহের চক্ষু ফুটাইবার জন্য বলিয়াছিল—"মাতুঃ [পি]তুর্জন্মভূমেঃ সেবনং শক্তিসঞ্চয়ঃ। পরোপকরণং সত্যনিষ্ঠা চার্য্যস্য লক্ষণম্"॥ যে দিন যুক্তবঙ্গে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে, হিমালয় ও সমুদ্রের তীরবর্ত্তী জঙ্গলমধ্যে সকল বালক, সকল যুবাপুরুষ কুমুদের ঐ কথার মর্ম্মবোধ করিয়া প্রাণের সহিত গাইবে—"দ্বিশ সুতগণং, অরাতি দলনং, দ্বাবিংশতি কোটি সন্ততি শালিনি। রাজরাজেশ্বরি ভারতজননি।......" সেই কি সুদিন।

বিদ্যাভূষণ হিন্দুরাজার শাসনে জীবন্ত হিন্দুসমাজের যে মধুর জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গসাহিত্যে কুমুদানন্দের স্থান অক্ষয় হইবে।

।বীন্দ্র বাবু এই গ্রন্থাবলীর উপস্বত্ব বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন এই পুস্তক ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট, বোলপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের ম্যানেজারের নিকট, এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।